University of Rajshahi **Rajshahi-6205** **Bangladesh.**

RUCL Institutional Repository **http://rulrepository.ru.ac.bd**

Department of Folklore MPhil Thesis

2004-05

The Folk Poets of Rajshahi and Their Literary Works

Wahab, Md. Abdul

University of Rajshahi

http://rulrepository.ru.ac.bd/handle/123456789/1018

Copyright to the University of Rajshahi. All rights reserved. Downloaded from RUCL Institutional Repository.

রাজশাহীর লোককবি ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোঃ আবদুল ওহাব
ব্যাচ জুলাই–২০০৪
রোল নং–০৩, রেজি. নং–১২৯৯৫
ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
ও
প্রভাষক
বাংলা বিভাগ
মোজাহার হোসেন মহিলা ডিগ্রী কলেজ
বাঘা, রাজশাহী।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আবুল হাসান চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক
ফোকলোর বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

মে ২০০৬

ঘোষণা পত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "রাজশাহীর লোককবি ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণভাবে আমার নিজের রচনা। এই অভিসন্দর্ভটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য লেখা হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে কিংবা এর কোন অংশ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে অথবা সাময়িকীতে ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য প্রদান করা হয়নি।

মোঃ আবদুল ওহাব
২৭.০৫.২০০৬

(মোঃ আবদুল ওহাব)
এম. ফিল. গবেষক
ফোকলোর বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী।

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মোঃ আবদুল ওহাব "রাজশাহীর লোককবি ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম" শীর্ষক গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন। অভিসন্দর্ভটি গবেষকের দীর্ঘদিনের ক্ষেত্রসমীক্ষা দ্বারা সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে রচিত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এটি একাধিকবার আদ্যপান্ত পাঠ করে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করার সুপারিশ করছি।

২৭. ০৫. ২০০৬

(ড. আবুল হাসান চৌধুরী)
সহকারী অধ্যাপক
ফোকলোর বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক।

সুপারভাইজার,
এম. ফিল/পি, এইচ, ডি.
ফোকলোর বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, অকুণ্ঠ ও সার্বক্ষণিক পরিশ্রমে এই গবেষণাকর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে, তিনি ফোকলোর বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং অত্র গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ড. আবুল হাসান চৌধুরী। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেন এবং অত্যন্ত সহিষ্ণুতা ও সহৃদয়তার পরিচয় দেন।

গবেষণাকর্মে মূল্যবান পরামর্শ, উপদেশ ও নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী। অত্র বিভাগের যে সকল শিক্ষক আমার গবেষণার বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ ও সহযোগিতা এমন কি খোঁজ খবর নিতেন তাঁরা হলেন– ড. মোবার্‌রা সিদ্দিকা, ড. আকতার হোসেন, ড. মোস্তফা তারিকুল আহসান। এছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের যে সকল শিক্ষক আমার গবেষণা কর্মে সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন– প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল, প্রফেসর মোঃ আবুল ফজল, প্রফেসর ড. খন্দকার ফরহাদ হোসেন। এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরেজিস্ট্রার (প্রশাসন) আমার চাচা শ্বশুর মোঃ আবদুল জব্বার। আমি এঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

আমার গবেষণা কার্যকালে আমার কর্মস্থল মোজাহার হোসেন মহিলা ডিগ্রী কলেজ কর্তৃপক্ষ এক বছর শিক্ষাছুটি প্রদান করেছেন। এজন্য কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ মোঃ এনামুল হাসান, কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য আলহাজ মহিবুর রহমান, আলহাজ মোঃ আবদুস সামাদ ও মোঃ সাইফুল ইসলাম, এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমার সহকর্মীদের মধ্যে অনেকে বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে, বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সরকার ও রসায়ন বিভাগের প্রভাষক মোঃ আসলাম হোসেন অন্যতম। আমার গবেষণায় আরো সহযোগিতা করেছেন শাহদৌলা ডিগ্রী কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আলী মুহাঃ হাশেম, বাঘা অঞ্চলের কবি মোঃ জেছের আলী, সাংবাদিক আবুল কালাম মোহাম্মদ আজাদ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের দ্বিতীয় ব্যাচের কৃতী ছাত্র রওশন জাহিদ।

যাঁদের অপার সহযোগিতা এবং সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা ছাড়া আমার গবেষণার কাজ সম্পন্ন করা সত্যই দুঃসাধ্য হয়ে পড়তো, যাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই তাঁরা হলেন আমার পরম প্রিয় 'মা' মোসাঃ নমেছা খাতুন, বাবা আল্‌হাজ মোঃ নওজেশ আলী। শাশুড়ি আম্মা মোসাঃ সালেহা বেগম, শ্বশুর মোঃ মাহ্‌তাব উদ্দিন। তাঁদের অনুপ্রেরণা, আন্তরিক দোয়া শুভ কামনাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

সর্বোপরি আমার স্ত্রী মোসাঃ হাদিসা খাতুন (লাভলী) আমার গবেষণার কাজে প্রতিনিয়ত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। কলেজ শিক্ষকতার পাশাপাশি প্রুফ দেখার কাজে একনিষ্ঠভাবে সময় দিয়েছেন এবং স্নেহের কন্যাদ্বয় অনিকা (৫) ও অনন্যা-কে (১) দেখাশুনা করে আমাকে গবেষণা কাজে নিয়োজিত থাকার সময় করে দিয়েছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর অবদানকে খাটো করতে চাইনা।

অভিসন্দর্ভ রচনায় অনেক প্রাজ্ঞ পণ্ডিতের প্রবন্ধ-গ্রন্থ ব্যবহার করেছি। আমার গবেষণার অন্তর্ভুক্ত লোককবিরা তাঁদের জীবনালেখ্য, প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও সঙ্গীত সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন। সহযোগিতা করেছেন তাঁদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও শিষ্য ভক্তরা। তাঁদেরকে এ শুভক্ষণে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি।

গবেষণা সম্পৃক্ত অধ্যয়নের জন্য যে সব গ্রন্থাগারের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী, সে গুলোর মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ফোকলোর বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরী, বরেন্দ্র রিসার্স মিউজিয়াম লাইব্রেরী, বিভাগীয় পাবলিক লাইব্রেরী, রাজশাহী; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, ঢাকা।

সর্বশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই 'এ্যাকটিভ কম্পিউটার' সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা মোঃ মোখলেসুর রহমান ও সহকর্মী মোঃ লুৎফর রহমানকে। তাঁরা সযত্নে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি মুদ্রিত করেছেন। শত বাধা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই গবেষণা কাজে আমার আন্তরিকতার অভাব ছিল না। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, কতটুকু সফল হয়েছি জানি না। এ গবেষণায় ফোকলোর গবেষক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠক উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

মোঃ আব্দুল ওহাব

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা নং
প্রস্তাবনা	:		১—৬
প্রথম অধ্যায়	:	রাজশাহীর ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়	৭—২৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	রাজশাহীর প্রধান প্রধান লোককবির জীবনকথা	২৪—৮৮
তৃতীয় অধ্যায়	:	লোককবিদের সাহিত্যকর্মের নিদর্শন ও মূল্যায়ন	৮৯—১৬৫
উপসংহার	:		১৬৬—১৬৮
পরিশিষ্ট	:	ক. সংগৃহীত লোকসঙ্গীতগুলোর নির্বাচিত সংকলন	১৬৯—২৫৮
		খ. তথ্যদাতাদের নামতালিকা	২৫৯—২৬১
		গ. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	২৬২—২৬৩
		ঘ. সহায়ক প্রবন্ধ ও পত্রিকা	২৬৪

গবেষণা প্রস্তাবনা
রাজশাহীর লোককবি ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম

ভূমিকা

জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে মানবমনের সৃষ্টিশীল ভাবনা-কল্পনাই সাহিত্যের নানা রূপে (Form) প্রকাশিত। সাহিত্য জীবনের কথা বলে। জীবন চলার পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে। সাহিত্যকে মোটাদাগে দুটি ভাগে ভাগ করলে দেখা যায়, একটি উচ্চ ভাবের সাহিত্য বা অভিজাত সাহিত্য, অন্যটি সাধারণ জনসমাজের মধ্য থেকে সৃষ্ট লোকসাহিত্য। এ সাহিত্যে লোকসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন-কল্পনার কথা থাকে, থাকে তাদের ইহজাগতিক ও অধ্যাত্ম জীবনের কথা। অভিজাত সাহিত্যের আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য তেমন একটা চোখে পড়ে না, তবে লোকসাহিত্যের একটা আলাদা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য থাকে। সেদিক থেকে রাজশাহী অঞ্চলের লোকসাহিত্যও বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে খানিকটা স্বাতন্ত্র্য দাবি করে। লোকসাহিত্য মৌখিক ধারার সাহিত্য, যা অতীত ঐতিহ্য এবং বর্তমান অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে রচিত হয়। একটি বিশিষ্ট ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে একটি সংহত সমাজ মানস থেকে লোকসাহিত্যের জন্ম হয়। যে সমাজের মানুষের ভাষা আছে, ভাব আছে আবেগ-কল্পনা আছে, সৃষ্টি ও প্রকাশের ক্ষমতা আছে, সেই সমাজের মানুষ লোক সাহিত্যের অধিকারী হয়। অক্ষরজ্ঞান ও শিক্ষা না থাকায় তারা তাদের সৃষ্টিকে লিপিবদ্ধ করতে পারে না। কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করে বিশাল জনগোষ্ঠী এই বিচিত্র শ্রেণীর ও বিপুল আয়তনের সাহিত্য ভাণ্ডারকে লালন ও বহন করে।

এ লোকসাহিত্যের রয়েছে কতিপয় শাখা যেমন– ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, কথাকাহিনী, লোকসঙ্গীত ইত্যাদি। যদিও বর্তমানে লোকসঙ্গীতকে ফোকলোরের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবু বহুকাল যাবৎ লোকসঙ্গীতকে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেই আলোচনা করা হচ্ছে। তা ছাড়া লোকসঙ্গীতেরও রয়েছে একটি সাহিত্যমূল্য। প্রস্তাবিত গবেষণায় মূলত রাজশাহী অঞ্চলের লোককবিদের রচিত সঙ্গীতকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কেননা যে ১৪ জন কবিকে গবেষণা কর্মে স্থান দেওয়া হয়েছে,

তাঁরা প্রধানত সঙ্গীত রচয়িতা। তাঁদের কেউ কেউ অবশ্য সামান্য কিছু কবিতা এবং গদ্য রচনা করেছেন, এগুলো সম্পর্কেও স্বল্প পরিসরে হলেও খানিকটা আলোচনা করা হবে।

শিরোনামের প্রত্যয় বিন্যাস

ক. রাজশাহী : পদ্মা, মহানন্দা, বড়াল, শিব ও বারনই বিধৌত পলিলালিত এবং পুণ্যাত্মা সাধক হযরত শাহ্মখদুম (রঃ) ও হযরত শাহ্দৌলা (রঃ) এর পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত রাজশাহী জেলা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। প্রস্তাবিত শিরোনামে রাজশাহী বলতে রাজশাহী জেলাকে বোঝানো হয়েছে। রাজশাহী জেলার বাঘা, চারঘাট, তানোর, গোদাগাড়ি, পুঠিয়া, দুর্গাপুর, পবা, মোহনপুর ও বাগামারা এ নয়টি থানা ও রাজশাহী সদরকে গবেষণার এলাকা হিসেবে ধরা হয়েছে।

খ. লোককবি : 'লোক' শব্দটি ইংরেজি 'Folk' এর প্রতিশব্দ। 'লোক' অর্থে মানুষজনকে বুঝায়। মানুষজন বলতে এখানে বুঝতে হবে একাত্মক সম্প্রদায় কোন শ্রেণীর মানুষ, এক সংহত আত্মজ আদিবাসী গোষ্ঠী। এই জন গোষ্ঠীর বা লোকসমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মূলত বংশ পরম্পরায় এক অবিচ্ছন্ন সাংস্কৃতিক ধারায় প্রবাহিত।[১]

পূর্বে শুধু অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত কিংবা অক্ষরজ্ঞান বিবর্জিত মানুষের রচনাকে লোকসাহিত্য বলা হতো কিন্তু বর্তমানে যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তাচেতনায় সে ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। শিক্ষিত জনের রচিত নিবিড়ভাবে জনসম্পৃক্ত সাহিত্যও সম্প্রতি লোকসাহিত্যরূপে গণ্য। আন্তর্জাতিক ফোকলোরবিদ অ্যালান ডান্ডেস তাঁর '*Essays in folkloristics*'– গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত '*Who are the Folk?*' শীর্ষক রচানায় ফোক অর্থাৎ ফোকগ্রুপের এমন একটি বিস্তৃত, ঐতিহাসিকতাসম্পন্ন প্রভাবশালী সংজ্ঞা দেন, যাতে ফোকলোর-চর্চায় এক আধুনিক ধারা সৃষ্টি হয়। আর ফোকলোরের পুরনো বসতি গ্রাম,বা কৃষি সমাজ থেকে শহর, বন্দর, বাজার, বিশ্ববিদ্যালয় সহ সর্বত্র বিস্তারিত হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে অ্যালান ডান্ডেস বলেন–*Folk can refer to any group of people, whatsoever who share at least one common factor. It does not matter what the linking factor is -it could be a common occupation, language, or religion - but what is*

important is that a group formed for whatever reason will have some tradition which it calls it own.[২]

এ সম্পর্কে ড. দুলাল চৌধুরী বলেন– যাদের কোন বিষয়ে সাদৃশ্যমূলক কোন সামাজিক বা সাংস্কৃতিক উপাদান আছে তারাই ‘লোক’ পদবাচ্য। অতএব যে কোন ব্যক্তিই লোকসংঘের বা সমাজের সদস্য হতে পারেন যদি সেই সংঘের বা সমাজের প্রাসঙ্গিকতা থাকে।[৩]

উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে বর্তমান গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ১৪জন কবিকে, লোককবি বলতে বাধা নেই। কারণ এঁদের কেউ কেউ স্বল্প শিক্ষিত হলেও এঁদের গুরু শিষ্য ও শ্রোতা মিলে একটি গোষ্ঠী বা গোত্র আছে। এই সম্প্রদায়ের সবার ধর্মীয় ঐতিহ্য ও অধ্যাত্ম চেতনায় মিল রয়েছে। এঁদের রচিত সঙ্গীতগুলো ভক্তদের মুখে মুখে প্রবহমান। বলা যায়, এরা সকলে মিলেই একটি লোকগোষ্ঠী এবং এ লোকগোষ্ঠীর ভেতর থেকেই জন্ম হয় লোককবিদের ।

গ. সাহিত্যকর্ম : লোককবিদের সাহিত্যকর্ম বলতে বর্তমান গবেষণায় প্রধানত তাঁদের রচিত সঙ্গীত ও কবিতাকে বুঝানো হবে। তাঁদের সঙ্গীতের বিষয়বস্তুর তুলনামূলক আলোচনা করা হবে। এবং সঙ্গীতে ব্যবহৃত ভাব, ভাষা, অলংকার ও বাণী-ভঙ্গির মূল্যায়ন করা হবে।

রাজশাহী জেলার প্রত্যেকটি থানার প্রতিটি ইউনিয়নের প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে সরেজমিনে জরিপ করে যে সমস্ত লোককবির সন্ধান পাওয়া গেছে; তাঁদের সাহিত্যকর্মে যে লৌকিক আবেদন আছে তা উপেক্ষণীয় নয়। অত্র জেলার লোককবিদের প্রতিনিধি স্বরূপ নিম্নোক্ত ১৪ জন কবিকে নিয়ে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করার প্রয়াস পেয়েছি।

১. মোঃ মকসেদ আলী : গোদাগাড়ি

২. মোঃ আবদুল খালেক : পুঠিয়া

৩. মোঃ ময়েজ উদ্দীন সা	:	বাঘা
৪. মোঃ কলিম উদ্দীন মিঞা	:	বাঘা
৫. হযরত খাজা মহসিন আলী আল চিশতি	:	বাঘা
৬. হযরত খাজা খোরশেদ আলী চিশতি	:	বাঘা
৭. মোঃ আবদুল আলিম ফকির	:	তানোর
৮. হযরত খাজা শাহ খলিলুর রহমান চিশতি	:	রাজশাহী সদর
৯. মোঃ আজগর আলী ভাণ্ডারী	:	রাজশাহী সদর
১০.শাহসুফি সৈয়দ আমজাদ হোসেন হায়দারী	:	চারঘাট
১১. আবুল ক্বাছিম কেশরী	:	মোহনপুর
১২. মোঃ আবদুর রহিম সরদার	:	বাগমারা
১৩. মোঃ শমসের আলী	:	পবা
১৪. গোলাম জিয়ারত আলী	:	দুর্গাপুর

উল্লেখ্য যে, একমাত্র বাঘা অঞ্চলের লোককবি ময়েজ সা কে নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোকলোর বিভাগে একটি স্বতন্ত্র গবেষণা চলছে। রাজশাহী অঞ্চলের উপরিউক্ত লোক কবিরা এ পর্যন্ত অপরিচয়ের অন্তরালে অবস্থান করছেন। এসব লোককবিদের সৃষ্টিকর্ম ও জীবনকথা নিয়ে বৃহদাকারে গবেষণা পরিচালিত হতে পারে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক. রাজশাহীর লোককবি ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম সংগ্রহপূর্বক তার বিচার বিশ্লেষণ করে এতদঞ্চলের লোকসংস্কৃতি ও লোকমানসের স্বরূপ উদঘাটন করা, যা আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অতীব জরুরী।

খ. লোককবি, শিল্পীদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা, মতামত এবং ণয়াদের জীবন যাত্রার হাল অবস্থা বর্তমান কালের ফোকলোর গবেষণায় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। প্রস্তাবিত গবেষণায়

রাজশাহী অঞ্চলের লোককবিদের জীবন যাত্রার মান, সামাজিক অবস্থান এবং আর্থিক সংকট-সমস্যার ব্যাপারটিও অনুসন্ধান করা হবে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলার লোকসাহিত্য সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত হলেও রাজশাহী অঞ্চলের লোকবিদের স্বকীয় ভাবনা-চিন্তা, তাঁদের জীবন যাত্রার পরিবেশ-পরিস্থিতিসহ জীবন ও সাহিত্যকর্ম ভিত্তিক ব্যাপক কোন গবেষণা এ পর্যন্ত হয়নি। বাঘা অঞ্চলের বিশিষ্ট লোককবি ময়েজ সা সহ দু'চারজন লোককবিকে নিয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সামান্য লেখালেখি হলেও কোন একাডেমিক গবেষণা হয়নি। এতদঞ্চলের লোককবিদের নিয়ে বৃহত্তর পটভূমিতে ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক গবেষণা হলে ফোকলোরের ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষকদের কাজে আসবে বলেই মনে করি।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় প্রধানত ক্ষেত্রসমীক্ষা পদ্ধতির আওতায় অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির একাধিক কৌশল কাজে লাগানো হয়েছে। লোককবিদের সঙ্গীত সংগ্রহ ও পরিচয় লাভের জন্য ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রয়োজন হয়েছে।

অধ্যায় বিভাজন

প্রস্তাবনা :

প্রথম অধ্যায় : রাজশাহীর ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : রাজশাহীর প্রধান প্রধান লোককবির জীবনকথা।

তৃতীয় অধ্যায় : লোককবিদের সাহিত্যকর্মের নিদর্শন ও মূল্যায়ন ।

উপসংহার :

পরিশিষ্ট : ক. সংগৃহীত লোকসঙ্গীত গুলোর নির্বাচিত সংকলন।

খ. তথ্যদাতাদের নাম তালিকা

গ. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

ঘ. সহায়ক প্রবন্ধ ও পত্রিকা

প্রথম অধ্যায়
রাজশাহীর ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়

প্রাচীন রবেন্দ্রভূমির অন্তর্ভুক্ত রাজশাহী জেলা তার স্বকীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ একটি বিশিষ্ট জনপদ। এ জেলা লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানে ভরপুর। রাজশাহীর জনগোষ্ঠীর অশিক্ষিত কিংবা অক্ষরজ্ঞান বিবর্জিত একটি বিপুল অংশের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-কল্পনা, প্রেম-ভালবাসা, বিশ্বাস-সংস্কার এবং জীবনাচারের ব্যাপক পরিচয় মেলে এতদঞ্চলের লোকসাহিত্যে। লোকসাহিত্যে উঠে আসে বহমান জীবনের স্বরূপ। প্রকৃতি নির্ভর মৃত্তিকাস্পর্শী গ্রামীণ সহজ সরল মানুষের মুখে মুখে রচিত এবং প্রচারিত এই লোকসহিত্য শ্রুতি ও স্মৃতির উপর নির্ভর করে বহমান। এ লোকসাহিত্য সৃষ্টি ও প্রসারে লোককবি ও বৃহত্তর লোকসমাজের রয়েছে বড় রকমের ভূমিকা। সংগত কারণেই এ জেলার লোককবিদের সাহিত্যকর্ম নিয়ে গবেষণা করতে গেলে এর ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রদান উদ্দিষ্ট বিষয়ে প্রবেশের পটভূমি রচনার সার্থেই প্রয়োজন বলে মনে করি।

ভৌগোলিক পরিচয়

অবস্থান : রাজশাহী জেলা ২৩-৮′-৩০″ উত্তর অক্ষাংশ ও ২৬-৩৮′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮-০২″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ও ৮৯-৫৭′ দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।[৪]

সীমানা : রাজশাহী জেলার উত্তরে নওগাঁ ও নবাবগঞ্জ জেলা, দক্ষিণে কুষ্টিয়া, ভারতের পশ্চিম বঙ্গ ও পদ্মানদী, পূর্বে নাটোর এবং পশ্চিমে নবাবগঞ্জ জেলা।

আয়তন ও লোকসংখ্যা : বাঘা, চারঘাট, তানোর, গোদাগাড়ি, পুঠিয়া, দুর্গাপুর, বাগমারা, মোহনপুর, পবা ও রাজশাহী সদরসহ এই ১০টি থানা নিয়ে রাজশাহী জেলা গঠিত। এ জেলার আয়তন ২৪০৭ বর্গ কি.মি., লোকসংখ্যা ১৮৮৭০১৫ জন এবং প্রতিবর্গ কি.মি. লোকসংখ্যা ৭৮৪ জন।[৫]

খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রামপুর এবং বোয়ালিয়া দু'টি গ্রামের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে রাজশাহী শহর। রামপুর বোয়ালিয়া গ্রাম দু'টি প্রথমে থানা এবং পরে জেলা শহর

রাজশাহী নামে পরিচিত হয়। রাজশাহী জেলা শহর হবার পূর্বে রাণীভবানীর স্মৃতি বিজড়িত নাটোরই ছিল এতদঞ্চলের প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র।

প্রাচীন চর্যাপদের সর্বপ্রধান লেখক কাহ্নপা ওরফে কানুপা ও তদীয় গুরু জালন্ধরী ওরফে হাড়িপা প্রাচীন সোমপুরী বাসিন্দা ছিলেন। এই সোমপুর বিহার রাজশাহী অঞ্চলের নওগাঁয় অবস্থিত পাহাড়পুর নামে চিহ্নিত হয়েছে।[৬]

ডব্ল্যু. ডব্ল্যু. হান্টারের ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বিবরণী থেকে জানা যায়, উনিশ শতকের প্রথম দিকে নাটোরের আশেপাশে নদী-নালাগুলো ভরাট হয়ে যায়। শহরে পানি নিষ্কাষণের অসুবিধা দেখা দেয়। জলাবদ্ধতার কারণে জলাশয়গুলো মশার জন্মস্থানে পরিণত হয়। শহরে ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। নাটোর জেলার অন্যতম আকর্ষণীয় ব্যবসা কেন্দ্র হলেও শহরের আশপাশের নদীগুলোর নাব্যতা হ্রাস পাওয়ার ফলে, বাইরে থেকে আসা ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়িক সংযোগ রক্ষায় অসমর্থ হন। পরিবেশগত এই সব অসুবিধার দরুণ ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে নাটোর থেকে প্রশাসনিক কেন্দ্র পদ্মাতীরের বাসোপযোগী মনোরম পরিবেশের স্বাস্থ্যকর স্থান রামপুর বোয়ালিয়ায় (পরবর্তীর রাজশাহীতে) স্থানান্তর করা হয়।[৭]

রাজশাহীর নামকরণ

নবাব মুর্শিদকুলী খান বাংলার নবাবী (১৭০৪-১৭২৫ খ্রি.) লাভের পর রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে সুবায়ে বাংলাকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন। এর মধ্যে চাকলা রাজশাহী পদ্মার উভয়তীরে বিস্তৃত ছিল।[৮]

রাজশাহী চাকলা হতে রাজশাহী জেলা নামকরণের পিছনে একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে রাজা রামজীবন হতে এর উৎপত্তি, আবার মতান্তরে কেউ বলেছেন নাটোরের রাণীভবানী হতে এ নামের প্রবর্তন। আবার কালীপ্রসন্ন বাবু 'রাজশাহীর ইতিহাসে' রাজা মানসিংহ কর্তৃক এ নাম প্রবর্তনের কথা বলেন, আবার কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে, গৌড়ের হিন্দুরাজা গনেশ মুসলিম সুলতান হতে রাজ্য দখল করলে রাজা নামে রাজ, আর শাহী হতে শাহী, এই নিয়ে রাজশাহী না'মের উৎপত্তি।[৯] নবাব মুর্শিদকুলী খানের পূর্বে 'রাজশাহী' নাম আর কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

অধ্যাপক ব্লাকম্যান অনুমান করেছেন যে, ভাতুরিয়ার হিন্দুরাজা কংস বা গনেশ গৌড়ের মুসলমান সুলতানকে উৎখাত করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আরো বলেছেন "হিন্দু রাজ" "ফারসি শাহী" যেমন-মাহমুদ শাহী, বারবাক শাহী, তেমনি হিন্দুর 'রাজ' মুসলমানের শাহী রাজশাহী। অর্থাৎ হিন্দু রাজা হয়ে মুসলমানের সিংহাসনে শাহ্ হয়েছিলেন। সুতরাং রাজশাহী নামকরণ এভাবে করা হয়েছে।[১০] রাজশাহী গেজেটিয়ারের লেখক মি. ওমেলী অধ্যাপক ব্লাকম্যানের এই সিদ্ধান্তকেই সত্যবলে উল্লেখ করেছেন। [১১]

জেলা সৃষ্টির ইতিহাস

জেলা ও মহকুমা শব্দ দুইটি আরবী। কিন্ত জেলা এবং মহকুমা বলতে ইংরেজ আমলে যে ধরনের প্রশাসনিক ও রাজস্ব বিভাগকে বোঝান হত, মুঘল আমলে তা ছিল না। ইংল্যান্ডের ডিসট্রিক্ট্ এর অনুকরণে লর্ড হেসটিংস প্রথম বাংলা প্রদেশকে কতগুলো জেলায় বিভক্ত করেন।[১২]

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের নিকট থেকে সমগ্র বাংলার দিওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের সনদ পাওয়ার পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সৈয়দ রেজা খানকে নায়েব নাজিম ও দিওয়ান নিযুক্ত করে মোটামুটিভাবে নবাবি আমলের মতই রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তৎপর হয়। কিন্তু তাতে অনেক বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি রেজাখানকে বরখাস্ত করে এবং নিজেদের সুবিধামত রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়। এ সময়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদের প্রথম দশক থেকেই তারা বাংলাকে বেশ কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রত্যেক জেলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কলেক্টর নামক একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত করার প্রথা প্রচলন করে। কিছু কাল পরে কালেক্টরকে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং তখন তাদের পদবি হয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর।[১৩] সমগ্র বাংলার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত রাজশাহী বিভাগ সর্বমোট আটটি জেলা নিয়ে গঠিত হয়েছিল এবং সে জেলাগুলো ছিল ১. দার্জিলিং ২. জলপাইগুড়ি ৩. মালদহ ৪. দিনাজপুর ৫. রংপুর ৬. বগুড়া ৭. পাবনা ও ৮. রাজশাহী।

প্রাকৃতিক বিবরণ

রাজশাহী জেলা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মৌসুমি এলাকায় অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি এ অঞ্চলের নিকট দক্ষিণ দিয়ে চলে গেছে। এ অঞ্চলের জলবায়ু প্রধানত উষ্ণ ও মোটামুটি আর্দ্র।[১৪]

আর্দ্রতা: রাজশাহী জেলায় ১৯৭১ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত ৯ বছরের হিসাবে দেখা যায় যে, এখানে সর্বোচ্চ ১০০% থেকে সর্বনিম্ন ৩১% পর্যন্ত এবং গড় আর্দ্রতা ছিল ৭১% থেকে ৭৯% পর্যন্ত।

বৃষ্টিপাত: এ অঞ্চলের বিভিন্ন জেলার বৃষ্টিপাতের বার্ষিক বিভিন্ন গড় দেখা যায়। রাজশাহী জেলায় বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৭০৫ মিলি মিটার।[১৫]

তাপমাত্রা: রাজশাহী অঞ্চলের তাপমাত্রা গড়ে সর্বোচ্চ ৩৫ ডিগ্রী সর্বনিম্ন ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের কম হয় না। আবার শীতকালে অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘমাসে তাপমাত্রা নিচে নেমে যায়, এবং গড়ে তা থাকে ১২ থেকে ১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস।

নদনদী: রাজশাহীর উল্লেখযোগ্য নদী হলো পদ্মা, মহানন্দা, বড়াল, শিব ও বারনই।

ঐতিহাসিক পরিচয়

প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে একসময় সমগ্র বাংলাদেশ ছিলো সমুদ্রের তলভূমি। সমুদ্রতলদেশ থেকে সবার আগে জেগে ওঠে হিমালয় পর্বত এবং তার পাদদেশ। তন্মধ্যে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল বা রাজশাহী অন্যতম।[১৬]

খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের শেষে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গুপ্ত আমলে রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। পুণ্ড্রবর্ধনই হয় প্রদেশগুলোর রাজধানী। ৭৫০ থেকে ১১৬০ শতক পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্ধনে পাল রাজবংশ রাজত্ব করেন।[১৭]

১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী অকস্মাৎ আক্রমণ চালিয়ে সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করেন। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের পুত্র নাসিরুদ্দিন নুসরৎশাহ (১৫১৯-৩২) গৌড়ের সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি তাঁর পিতার ন্যায়

অত্যন্ত ধার্মিক ও দানশীল নৃপতি ছিলেন। এ ভূখণ্ডেই রয়েছে বাগদাদ থেকে আগত বিখ্যাত তাপস হযরত আবদুল হামিদ দানিশমন্দ (র.) ও হযরত শাহ্ দৌলা (র.)-র সমাধি।[১৮] এছাড়া বিভিন্ন যুগে যে সব স্থাপত্যশিল্প নিদর্শন রাজশাহী ভূখণ্ডে নির্মিত হয়েছে তা আজও রাজশাহী বাসী তথা সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের মনকে ঐতিহ্যগর্বে অনুপ্রাণিত করছে।

১৫৭৪ সালে থেকে ১৭২৭ সাল পর্যন্ত বঙ্গভূমিতে প্রায় ২৯ জন মোঘল গভর্নর রাজত্ব করেন। তন্মধ্যে মানসিংহ, ইসলাম খাঁ যুবরাজ মোহম্মদ সুজা, মীর জুমলা, নবাব শায়েস্তা খান ও নবাব মুর্শিদ কুলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। মুর্শিদ কুলী খাঁর ৪জন উত্তরসূরী সুজাউদ্দিন মোহাম্মদহাদী, শরফরাজ খান, আলীবর্দী খাঁ ও নবাব সিরাজউদ্দৌলা স্বাধীনভাবেই বাংলার শাসনকার্য পরিচলানা করেন।[১৯] এই দুশো বছরের প্রশাসনে রাজশাহী অনেকটা সুখ সমৃদ্ধির মুখ দেখতে পায়।

১৭৫৬ সালে নবাব আলীবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র নবাব সিরাজ উদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বকাল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হয়। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন বাংলার স্বাধীনতার শেষ সূর্য হয় অস্তমিত, মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফের সক্রিয় ষড়যন্ত্রে ও জগৎ শেঠের নীলনক্সা প্রণয়নে সিরাজকে হত্যা করা হয়। ১৭৯৩ সাল হতে ইংরেজরা এ দেশে একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করে।[২০]

পলাশীর পরাজয় মুসলমানগণ মেনে নিতে পারেনি বলেই ফকির বিপ্লব, দুদু মিয়ার প্রজা বিপ্লব, ফারায়েজী আন্দোলন, শরীয়তুল্লার আন্দোলন, ফকীর মজনুশাহ্ ও তিতুমীরের আন্দোলন এ সব সময়ের ধারাবাহিকতায় প্রবাহিত হয়। শেষে আসে ওহাবী আন্দোলন, যার পটভূমি ছিল গোদাগাড়ি হতে পদ্মার তীর ধরে পাবনা পেরিয়ে ঢাকা ও রংপুরের সর্বত্র। বালাকোটের যুদ্ধে ওহাবী নেতা সৈয়দ আহমেদ ব্রেলভী নিহত হন। রাজশাহীতেও এর ক্ষেত্র রচনা হয়। হেতেম খাঁ ছোট মসজিদের পাশে বেলায়েত আলী বাদ্রী নিজে আস্তানা গাড়েন, যার শাখা বিস্তারিত হয় দুয়ারী সোপুরা ও পূর্বে জামিরা পর্যন্ত পদ্মার উত্তর তীর নিয়ে।[২১]

রাজশাহীতে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়লে উত্তর বঙ্গের প্রজা আন্দোলনের অগ্রদূত নেতা বগুড়ার মরহুম মৌঃ রজীব উদ্দিন তরফদারের নেতৃত্বে নাটোরে কৃষক

Rajshahi University Library
Documentation Section
Document No D-2601

প্রজা আন্দোলন রাজশাহীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক ও প্রজানেতা আবুল হোসেন সরকার সমগ্র বাংলায় এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী রাজশাহীতে আগমন করেন এবং শহরের দরগাপ্রাঙ্গণে এক সভায় শহরের গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে মুসলিম লীগের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। এই সংগঠনে মৌঃ আবদুল হামিদ সভাপতি ও মৌঃ মাদার বক্স সাহেব সম্পাদক নির্বাচিত হন।[২২]

ঢাকার মত রাজশাহীতেও ভাষার জন্য আন্দোলন হয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবিতে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের হরতালের দিন রাজশাহীর ছাত্রসমাজ ও সচেতন মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। এই ভাষার জন্য রাজশাহীর রাজপথে সর্ব প্রথম মাথা ফেটে রক্ত ঝরেছিল ছাত্রনেতা গোলাম রহমানের। রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন একরামুল হক, গোলাম রহমান, আবুল কাশেম চৌধুরী, গোলাম তাওয়াব (প্রাক্তন বিমান বাহিনী প্রধান), কাসিমুদ্দিন আহমদ, নূরুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান শেলী, আতাউর রহমান, আনসার আলী, শামসুল হক, মোহাদ্দুরুল হক, আবদুস সাত্তার, বেগম জাহানারা মান্নান, মাদার বক্স, মজিবর রহমান, মোক্তার জিয়ারত হোসেন প্রমুখ।[২৩]

ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই এদেশে আসে স্বাধীনতা সংগ্রাম। ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ রাতে সেনাবাহিনী সামরিক ছাউনি থেকে বেরিয়ে রাজশাহী শহরে টহল দিতে থাকে। রাজশাহীর পুলিশ ২৫শে মার্চ রাত থেকেই মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত ছিল। ২৬শে মার্চ পুলিশ ছাত্র জনতা মিলে রাস্তার বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড দিতে শুরু করে। সেদিন সন্ধ্যায় কয়েকটি ভ্যান ভর্তি পাকসেনা পুলিশ লাইনের কাছ থেকে কয়েক রাউন্ডগুলি ছোঁড়ে। গুলির আওয়াজে পুলিশ লাইন থেকে পুলিশ বাহিনীও পাল্টা গুলি ছুঁড়লে উভয় পক্ষের গোলাগুলিতে বেশকিছু নিরীহ ব্যক্তি নিহত হয়।[২৪]

৪ঠা এপ্রিল পাক বিমানবাহিনীর দু'খানা জেট বিমান এসে নওদা পাড়ার দিকে বি. ডি. আর জোয়ান, পুলিশ, মুক্তি বাহিনী ও জনসাধারণের উপর গোলা বর্ষণ করে। এই ভাবে রাজশাহীতে চলতে থাকে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারীধর্ষণ এবং পাইকারী হারে ধরপাকড় ও জিজ্ঞাসাবাদ।[২৫]

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রাজশাহী সহ সমগ্র বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়। কোটি কোটি লোক গৃহহারা হয়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে, অনেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নেয়। হাজার হাজার নারী ধর্ষিতা হয় এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম হয়।

সাংস্কৃতিক পরিচয়

বাংলা 'সংস্কৃতি' শব্দে একটি জাতি বা মানব গোষ্ঠীর ভাবসাধনা ও জীবন চর্চার সমগ্রতা সূচিত হয়। এর মধ্যে ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা, সমাজবোধ ও জীবন দর্শনের একত্রীভূত নির্যাস নিহিত আছে, এতে একটি জাতি বা মানব গোষ্ঠীর মহত্তম ঐহিত্য ও ক্ষুদ্রতম আত্মবিনোদন প্রয়াস পাশাপাশি অবস্থিত। এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, একমাত্র মানুষেরই সংস্কৃতি আছে, অন্য কোন জীবের সংস্কৃতি বলতে কিছু নেই। এ কথার অর্থ মানুষ হিসেবে মানুষের প্রকৃত পরিচয় তাঁর সংস্কৃতি। মানুষের এই সংস্কৃতির সংজ্ঞায় বলা যায় 'মানুষের জীবন সংগ্রামের বা প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তারের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি'।[২৬]

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন চর্যাপদ। চর্যাপদ রচয়িতাদের মধ্যে কাহ্নপা, শবরীপা, লুইপা, সরহপা প্রমুখ রাজশাহী অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন বলে প্রয়াত অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব মন্তব্য করেছেন।[২৭]

রাজশাহী অঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী, বসবাসকারী কিংবা কর্মরত আচার্য হিসেবে বেশ কিছু পদকর্তার পরিচয় পাওয়া যায়। চর্যাপদের কবিগণের মধ্যে সর্বাধিক পদরচয়িতার গৌরবের অধিকারী হচ্ছেন কাহ্নপা। তাঁর তেরটি পদ চর্যাপদ গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে। কাহ্নপার বাড়ি উড়িষ্যায়। তিনি বাস করতেন পাহাড়পুর বা সোমপুর বৌদ্ধ বিহারে। তিনি রাজশাহীর মাটিতে অনেক সময় অতিবাহিত করেছেন। দোহা ও চর্যাগীতি লিখেছেন তিনি। তাঁর রচিত একটি গ্রন্থ *'শ্রী হেবজ্রপঞ্জিকা যোগ রত্নমালা'*।[২৮]

প্রাচীন বাংলার লেখক বিরূপা ত্রিপুরায় জন্ম গ্রহণ করেন। ভিক্ষুরূপে কিছুকাল রাজশাহীর সোমপুর বৌদ্ধবিহারে ছিলেন। সরহপা পূর্বদিশা বা পূর্বদেশের বাজ্ঞী নামক অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করেন। সৈয়দ আলী আহসানের মতে রাজশাহী অঞ্চলের মধ্যে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে সরহপার জন্ম। তাঁর পূর্ব নাম রাহুলভদ্র। তিনি সরোজ বা সরোজহ এবং পদ্মবজ্র নামেও পরিচিত।[২৯]

অষ্টম-নবম শতকের কবি সরহ সংস্কৃত ভাষাতেও কাব্যচর্চা করেছেন। পালি ও অপভ্রংশ ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি নালন্দায় ছাত্র ছিলেন এবং অধ্যাপনাও করেছেন সেখানে। অপভ্রংশ ভাষায় সরহের একুশটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। চর্যাকার শবরীপা, বীনাপা, ধামপা, উত্তর বঙ্গবাসী ছিলেন। অন্যান্য পদকর্তাগণের বেশির ভাগই রাজশাহীতে বসবাস করেছেন এবং ভিক্ষু সংঘের অধীনে ছিলেন। সিদ্ধাচার্য বজ্রপা ছিলেন রাজশাহী অঞ্চলের ক্ষত্রিয় সন্তান। অনঙ্গপা গৌড়ের শূদ্র। কণখলাপা এবং উধলীপা দেবীকোর্টের অধিবাসী, নাগবোধির বাড়ি ছিল বরেন্দ্রভূমির শিবসের গ্রামে। *যমারিসিদ্ধ চক্রসাধন* নামে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।[৩০] নাগবোধি অষ্টম-নবম শতকের লেখক। এ সব সাহিত্য নিদর্শন আমাদের সাহিত্য সাধনার পথ প্রদর্শক হয়েছে।

দ্বাদশ শতকের সেন আমলে ৫০টি অধ্যায়ে মোট ১৭৩৮টি শ্লোকের একটি সংকলনের সন্ধান পাওয়া গেছে। উক্ত সংকলনের কবি তালিকায় আছেনঃ কালিদাস (পঞ্চম শতাব্দী), অমরু, রাজশেখর (অষ্টম শতাব্দী), অপরাজিত রক্ষিত, কুমুদাকর মতি, জিতারিনন্দী, বুদ্ধাকর গুপ্ত, রত্নকীর্তি, শ্রীশপ বর্মা, সংঘশ্রী, মধুশীল, বীর্যমিত্র, শ্রীধর্মাকর, রতিপাল, বৈদ্যধন্য, বন্দ্য তথাগত, বিনয়দেব, ভ্রমর দেব, শ্রীহর্ষদেব, শ্রীরাজ্য পাল, ধরণীধর, লক্ষীধর, সুবর্ণরেখ, জয়িক, বিত্তোক, বৈদ্যোক, ললিতোক, সিদ্ধোক, সোহ্লোক, হিঙ্গোক, মনোবিনোদ, বসুকল্প, অভিনন্দ, যোগেশ্বর, শুভংকর, যোগেক, সোন্নক, ছিত্তপ, বাগোক, ডিম্বোধ, শ্রীধরনন্দী, এবং মহিলা কবি ভাবাক (ভাবদেবী), ও নারায়ণ-লক্ষী। এ সমস্ত সাহিত্য সাধকের অধিকাংশই ছিলো রাজশাহীর বাসিন্দা।[৩১]

সমগ্র মধ্যযুগ জুড়েই দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনমূলক কাব্যরচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সেই ধারায় ব্যতিক্রম আসে রোমান্টিক প্রণয় আখ্যানমূলক কাব্য রচনার মাধ্যমে। মধ্যযুগে দুশ বছর ব্যাপী যাঁরা গৌড় দরবারের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে

রাজশাহীতে বসবাসকারী ছিলেন: শাহ মুহম্মদ সগীর, বিদ্যাপতি, মালাধর বসু, চণ্ডীদাস, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, শেখ কবীর ও শ্রীধর।[৩২]

ষোড়শ শতকের শেষভাগে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী যে প্রাণ প্রাচুর্যের সৃষ্টি করেছিল, নরোত্তম দাস সে ক্ষেত্রে শক্তিশালী সাধক ও শিল্পী। তাঁর পিতৃনিবাস ছিল রাজশাহী জেলার পদ্মাতীরবর্তী গোপালপুর, জন্মস্থান গোদাগাড়ি থানার কুমারপুর, সাধনপীঠ ছিল খেতুর গ্রাম। তখন থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই গ্রামে 'খেতুর মেলা' নামে বিখ্যাত মেলা বসে। নরোত্তমের জন্ম ১৫৩১ খ্রিঃ ও মৃত্যু ১৬১১ খ্রিঃ। পিতার নাম কৃষ্ণনান্দ, মাতার নাম নারায়ণী। তিনি 'ভক্ত নারোত্তম', 'নারোত্তম দাস', 'নরোত্তম ঠাকুর' ও 'নারোত্তম দাস ঠাকুর' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বৃন্দাবনে লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং জীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *প্রেম ভক্তিচন্দ্রিকা, সাধন ভক্তি চন্দ্রিকা, সাধ্য প্রেম চন্দ্রিকা, রস ভক্তি চন্দ্রিকা, চমৎকার চন্দ্রিকা, দেহ কড়চা, প্রেম ভক্তি চিন্তামনি, ভজন নির্দেশ, প্রেম বিলাস*। অধিকাংশ পুথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত আছে।[৩৩]

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের বিজয় কাব্য শাখার মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম কবি জৈনুদ্দিন। তিনি ছিলেন গৌড়ের সুলতান ইউসুফ শাহর (১৪৭৪–৮১খ্রি:) সভাকবি। তাঁর কাব্যের নাম '*রসুল বিজয়*'। কবি জৈনুদ্দিনের পরে কয়েকশ বছর ধরে 'রসুল বিজয়' কাব্য রচনার একটি ধারা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।[৩৪] রাজশাহী অঞ্চলের কবিদের মধ্যে গোলাম রসুল, বুরহানুল্লাহ, দোস্ত মোহাম্মদ প্রমুখ রসুল বিজয় কাব্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন।

রাজশাহী অঞ্চলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হলেন আবদুস শুকুর ওরফে শুকুর মামুদ তার পিতার নাম শেখ আনার। অধ্যাপক আবু তালিব বলেছেন : বর্তমান রাজশাহী শহর থেকে মাত্র ৫/৬ মাইল দূরে সিন্দুর কুসুমী গ্রামে শুকুর মামুদের বাস্তুভিটার নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামপুর বোয়ালিয়ার অদূরে সিন্দুর কুসুমীতে কবির জন্ম। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস ও মৃগুল শহরের কাহিনী তাঁর উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ।[৩৫]

মধ্যযুগে আরও বেশ কয়েকজন কবি রাজশাহী অঞ্চলে সাহিত্য সাধনায় রত ছিলেন, তাঁরা হলেন মুহম্মদ কবির, শাকের মামুদ, মুহম্মদ কালা, মোহাম্মদ ইউসুফ খাঁ, অদ্ভুত আচার্য, শ্রীনাথ

পণ্ডিত, কৃষ্ণরাম দাস, জগৎজীবন ঘোষাল, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র, দুর্লভ মল্লিক, আবদুস সোবহান, হেয়াত মামুদ, যদুনন্দন, তাহির মামুদ, বুরহানুল্লাহ প্রমুখ। মুসলিম কবিদের মধ্যে '*ইমাম সাগর*' গ্রন্থ লিখে পরিচিতি লাভ করেন কবি আবদুস সোবহান।[৩৬]

অন্ত মধ্যযুগের রাজশাহী অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ কবি হেয়াত মামুদের রচনা '*চিত্ত উত্থান বা সর্বভেদ*' '*হিতজ্ঞান বাণী*' '*আম্বিয়া বাণী*', *নসিহত-ই-কামাল*, '*কেয়ামত নামা*' ইত্যাদি। উপমহাদেশের বিখ্যাত ফোকলোরবিদ প্রফেসর মযহারুল ইসলাম এই প্রতিভাবান কবির সাহিত্যকর্ম নিয়ে উচ্চতর গবেষণা করেছেন। এ অঞ্চলের অন্যতম কবি ছিলেন তাহির মামুদ তাঁর গ্রন্থ *সত্যপীরের পাঁচালি*।[৩৭]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই ধনধান্যে সমৃদ্ধ রাজশাহী অঞ্চল সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায়, মরমি সাধনায় আবেগ সংবেদ্য হতে পেরেছে।[৩৮] ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলা গদ্যচর্চার যে পথরেখা নির্মাণ করে, সেই আদর্শে রাজশাহীর এক অজ্ঞাত নামা লেখক রচনা করেন হজরত শাহ্ মখদুমের জীবনী তোয়ারিখ ১৮৩৮ খ্রিঃ।[৩৯] এই গ্রন্থের একমাত্র পাণ্ডুলিপি রাজশাহী শহরের দরগা পাড়ার এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে সংগ্রহ করেছেন অধ্যাপক আবু তালিব। বাংলা গদ্যের নির্মাণ কালের এই অবদান রাজশাহীর জন্য একটি গৌরবময় ঘটনা। এই গ্রন্থের গদ্যশৈলী বিদ্যাসাগরীয় ধরনের।[৪০]

উনিশ শতকে রাজশাহী জেলায় অনুবৃত্তিমূলক কিছু কাব্য রচিত হয়েছিল। তানোর থানার লবলবী গ্রামের অধিবাসী এনায়েত কাজী। তিনি পয়ার ছন্দে পুঁথি লিখতেন। তাঁর উল্লেখ যোগ্য পুঁথি '*কলকাতার বয়ান*' ও '*সকের মেলা*'।[৪১] বহুগ্রন্থ প্রণেতা দুর্গাপুর থানার আলিয়াবাদ (লটীপুকুর) গ্রামের অধিবাসী মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী (১৮৫৮-১৯৩০খ্রি.)। তাঁর '*দুগ্ধাসরোবর*' বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। তিনি ইমাম গাজ্জালীর '*কিমিয়ায়ে সাদাৎ*' এর বঙ্গানুবাদ করেছিলেন '*সৌভাগ্য স্পর্শমণি*' নামে। '*ইসলাম তত্ত্ব*' তাঁর অন্যতম গ্রন্থ।[৪২]

হাজী কেয়ামতুল্লাহ্ খোন্দকার (১৮৭০-১৯৬০) তাহেরপুরের অধিবাসী। ইসলামী গজল, পুঁথি ও ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি ৫০ খানা মতান্তরে ৫৪ খানা গ্রন্থ রচনা করেন। একটি গণ্ডগ্রামে বসে দীর্ঘকাল এমন নীরবে সাহিত্য সাধনার উদাহরণ বিরল। ফজর আলী রাজশাহী শহরের মালোপাড়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। কর্মজীবনে ফজর আলী ছিলেন পুলিশ বিভাগের দারোগা।

তবে তাঁর মধ্যে ছিল স্বাভাবিক কাব্য প্রেরণা। তাঁর '*জমজম*' গীতি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে। '*হামদাম*' নামক তাঁর একটি কাব্য গ্রন্থ অপ্রকাশিত রয়েছে। কবি ফজর আলী ৮৫ বছর বয়সে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৯৫ সালের দিকে।[৪৩] তৎকালীন রাজশাহী জেলার উল্লেখযোগ্য লেখক বাসনী টোলা গ্রামের সমির মণ্ডল। তিনি '*গোলে বকাউলী*' জাতীয় উপখ্যান কাব্য রচনা করেছিলেন। কবির মৃত্যু হয় ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময়ে।[৪৪] শেখ জুমন উদ্দীন নাটোরের তেবাড়িয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি আদালতের একজন পিয়ন কিন্তু তাঁর কাব্য প্রতিভা ছিল। তাঁর *মহামানব (কাব্য), মুক্তির পথ, জহুরা, কর্মবীর, গৃহদর্পণ, এসকে মত্তলা, অপূর্ব তাজমহল* ইত্যাদি তাঁর স্মরণীয় সংকলন। উনিশ শতকের শেষ দিকে তাঁর জন্ম।[৪৫]

রাজশাহী নিবাসী মোহাম্মদ ইসহাক বি. এল. ইমাম গাজ্জালীর কিমিয়ায়ে সাদাতের সংক্ষিপ্তসার '*জ্ঞান সিন্ধু*' রচনা করেছেন। 'ইব্রাহীম হোসেন তর্কবাগীশ' কোলাবদল গাছির অধিবাসী। '*উত্তর বঙ্গের আউলিয়া প্রসঙ্গ*' নামে একটি তথ্যপূর্ণ সংকলন রচনা করেছেন তিনি।[৪৬] মীর আজিজুর রহমান রাজশাহীর অধিবাসী ছিলেন। তাঁর '*মাস্তানা*' (১৯৪০) সুফি চেতনার প্রতিবিম্ব। পারস্যের সুফি কবিদের রুবাইয়াতের অনুস্মৃতি ঘটেছে এ কাব্যের ভাব ও অলংকরণে। ১৯৪২ সালে কবি মঈনউদ্দীন চিশতির '*দিউয়ান*' এর বঙ্গানুবাদ করেন। মীরের আত্মজীবনী অপ্রকাশিত রয়েছে। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৪৭]

রাজশাহী লোকসংস্কৃতি উপাদানে সমৃদ্ধ জেলা। রাজশাহীর জনবসতির ধরণ ও বৈশিষ্ট্য এবং লোকসমাজের আচার, বিশ্বাস, সংস্কার, ঐতিহ্য এবং নিরন্তর পরিবর্তনশীল ও মনস্তাত্ত্বিক গঠনের বৃহৎ পরিমণ্ডলের মধ্যেই গড়ে উঠেছে এখানকার বিচিত্র বহুমাত্রিক লোকসংস্কৃতি। এখানকার মানুষের ভাব আছে, ভাষা আছে, আবেগ কল্পনা আছে, আছে সৃষ্টি ও প্রকাশের ক্ষমতা। এখানে রয়েছে লোকসংস্কৃতির মূল্যবান সম্পদ যেমন ছড়া, প্রবাদ, লোকসঙ্গীত, আলকাপ, গম্ভীরা, এবং নারী জীবনের সুখ-দুঃখ নিয়ে রচিত মেয়েলি গীত। আরো রয়েছে লোকশিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন নক্শী কাঁথা, তামা-কাঁসা-পিতল শিল্প, রেশম শিল্প, আল্পনা, নক্শী শিকা, মৃৎশিল্পসহ গ্রামীণ স্থাপত্যকলার অপূর্ব নিদর্শন মাটির দ্বিতল ভবন।

রাজশাহীর লোকসংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বিষয় মেয়েলি গীত। মেয়েলিগীত লোকসঙ্গীতের একটি উল্লেখযোগ্য ধারা। মেয়েলি গীত তার সৃষ্টিগুণের স্বকীয়তায় লোক সঙ্গীতের অন্যান্য ধারা থেকে স্বাতন্ত্র্যের গৌরবে সমুজ্জ্বল। কথার সারল্য আর সুরের মাধুর্য এর অন্যতম দিক। পল্লী রমণীর নিরাবরণ ও নিরাভরণ মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যের ন্যায় মেয়েলি গীতের স্নিগ্ধ মধুর রূপ পরিলক্ষিত হয় তার অনাড়ম্বর পরিবেশনায়।[৪৮]

রাজশাহী অঞ্চলের বিয়েতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আচারিক অনুষ্ঠানের নাম 'গায়ে হলুদ ও মেহেদি তোলা। রাজশাহীর বাঘা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত এ বিষয়ের একটি গীত–

হলুদ তোমার কোনখানে জনমও হে ॥
আমার জনম আদারে পাগাড়ে হে ॥
হলুদ তুমি কোন কোন কাজে লাগো হে ॥
আমি লাগি নতুন কন্যার গায়ে হে ॥
মেদি তোমার কোনখানে জনমও হে ॥
আমার জনম সাহেবের বাগানে হে ॥
মেদি তুমি কোন কোন কাজে লাগো হে ॥
আমি লাগি নতুন কন্যার হাতে হে ॥[৪৯]

এ অঞ্চলের বিয়েতে 'ক্ষীর খাওয়ানোর পালা' নামক একটি অনুষ্ঠান পালনের রীতি পরিলক্ষিত হয়। রাজশাহীর চারঘাট অঞ্চল থেকে সংগৃহীত এ বিষয়ের একটি গীত :

মায়েতে রান্ধিল ক্ষীর, মায়েতে বাড়িল ক্ষীর
বাপজান আইসা, ডাইলা দিল দুধরে, আনন্দের বাসি
ছিকার উপর তুলিয়া থও, সরপোস দিয়া ডাকিয়া থও
ছেলা আরশে হইয়াছে, আলিশরে, আনন্দের বাঁশি।
ভাবিতে রান্ধিল ক্ষীর, ভাবিতে বাড়িল ক্ষীর
ভাইজান আইসা, ডাইলা দিল দুধরে, আনন্দের বাসি
ছিকার উপর তুলিয়া থও, সরপোস দিয়া ডাকিয়া থও
ছেলা আরশে হইয়াছে, আলিশরে, আনন্দের বাঁশি।[৫০]

এ ছাড়াও বিয়ে বাড়িতে হলুদ কোটা, পানি ভরণ, দুধেরধার গীত, বাসর জাগার গীত, ও বিভিন্ন মেয়েলী গীত পরিবেশিত হয়।

রাজশাহী জেলার বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে রয়েছে পহেলা বৈশাখ, রথ যাত্রা, পৌষ পার্বণ, কালি পূজা, বুদ্ধপূর্ণিমা, মাঘীপূর্ণিমা, শিবরাত্রি, ঈদ উৎসব, শবেবরাত, শবে কদর, মহর্‌রম,

ইংরেজি নববর্ষ, কৃষিমেলা, পৌষ মেলা, পীর ফকির বা ধর্ম গুরুর ওরশ ও মেলা। যেমন রাজশাহী জেলার বাঘা থানায় হযরত আবদুল হামিদ দানিশ মন্দ (রহঃ) ও হযরহ শাহ্ দৌলা (রহঃ) এর দরগাহ শরীফে প্রতি বছর ঈদুল ফিতরের দিনকে কেন্দ্র করে সাত দিন ব্যাপী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলা উৎসব পাঁচশ বছরেরও আগে থেকে শুরু হয়েছে।

এটি অনস্বীকার্য যে শতবর্ষ পূর্বে বিভিন্ন মেলার যে আদিম সংস্কারজাত রূপ ছিল আজকালের মেলায় তার রূপ বদলে গেছে। মেলাগুলো আজ অধিকাংশই মানবতামুখী এবং ধর্মীয় ভাবের পরিবর্তে এ গুলোর ব্যবসায়িক দিকটিই বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মেলায় উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখা যায় যাত্রা, সার্কাস, পুতুল নাচ, মটর সাইকেল খেলা, বানর খেলা, লটারী খেলা, নৌকা বাইচ ইত্যাদি। মেলা উপলক্ষে ছেলে-মেয়ে ও জামাই মেয়েকে নতুন জামা কাপড় দেওয়া এবং মেলা দেখার জন্য টাকা দেওয়ার রেওয়াজ আছে। মেলায় বসে সারি সারি বহু দোকান পাট। তার মধ্যে ফার্ণিচারের বিশাল দোকান, স্টীলের তৈরি ট্রাংক ড্রাম, বাক্স, আলমারী। আশপাশে ছড়ানো ছিটানো থাকে খেলনার দোকান, কসমেটিক্সের দোকান, ফলের দোকান, মাটির তৈরি হাঁড়ি পাতিল, পুতুল, মাটির তৈরি ব্যাংক, ফলমূল, পিঠা বানানোর ফর্মা, দা-বটি, ছুরি, কড়াই, নকশা করা তাল পাখা প্রভৃতি আকর্ষণীয় জিনিস মেলার ঐতিহ্য বহন করে। এগুলো রাজশাহীর উল্লেখযোগ্য লোকশিল্প।

সাধারণ বাঙালি সমাজের মত এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যেও আছে নানা বিশ্বাস সংস্কার। অনেকে অসুখে বিসুখে, রোগে-শোকে, আপদে-বিপদে, মনোবাসনা পূরণের ক্ষেত্রে মাজারে মানত করে। কোন মেয়েকে ভূতে ধরলে তারা ভূতের ওঝা এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। কাউকে সাপে কামড়ালে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে ডেকে আনে সাপের বিষ নামানোর ওঝাকে। গাছে কাঁঠাল না ধরলে, গাছের ডালে শামুক বেঁধে রাখে, এদের বিশ্বাস যে কাঁঠাল গাছটি শামুকের স্পর্শে ফলবতী হবে। আবার পেঁচার ডাক অমঙ্গল সূচক মনে করা হয়। মাথার উপর দিয়ে কাক কা-কা-রবে ডেকে গেলে বা বাড়ির আঙ্গিনায় বসে অনবরত ডাকতে থাকলে প্রিয়জনের মৃত্যু সংবাদ বা অমঙ্গল কিছুর আশংকা করা হয়। জোড়া কলা খেলে যমজ সন্তান হয়। জোড়া শালিক দেখলে যাত্রা শুভ। মেয়েদের স্বামীর নাম মুখে উচ্চারণ করা অশুভ। এমন কি কোন মহিলার স্বামীর নামের সঙ্গে কোন বস্তুর নামের মিল থাকলেও সে মহিলা বস্তুটিকে অন্য নামে অভিহিত করে। যেমন স্বামীর নাম চিনি মণ্ডল হলে চিনিকে সাদা গুড় বলে। এছাড়াও আরো নানা প্রকার লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাস রয়েছে।

ভূত-প্রেতের ভয়ে আঁতুড় ঘরের দরজা জানালার ফাঁক এবং বেড়ার ছিদ্র সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হয়। আবার সুতিকার ঘরের এক পার্শে মরা গরুর মাথা. মুড়া ঝাঁটা, বাড়ুন, ছেঁড়া জুতা ইত্যাদি বেঁধে রাখা হয়। প্রসূতি বাইরে আসার সময় লোহার কিছু হাতে রাখে এবং বাইরে থেকে ঘরে প্রবেশ করার পর প্রসূতিকে মুড়া বাড়ুন দিয়ে ঝেড়ে দেওয়া হয়।

রাজশাহী অঞ্চল লোকসঙ্গীতে ঋদ্ধ। লোকসঙ্গীত বরাবরই সঙ্গীতের অন্যান্য ধারা থেকে স্বাতন্ত্র্যের গৌরবে সমুজ্জ্বল। তত্ত্ব আর সুরের মাধুর্য এর অন্যতম দিক। রাজশাহী অঞ্চলে সরেজমিনে জরিপ করে যে সমস্ত লোককবির সন্ধান পাওয়া গেছে তাঁদের অনেকেই দেহতত্ত্বের সাধক। যেমন– গোদাগাড়ি থানার লোককবি মোঃ মকসেদ আলী, পুঠিয়া থানার আবদুল খালেক, বাঘা থানার হযরত খাজা মহসিন আলী আল চিশতি, রাজশাহীর খলিলুর রহমান চিশতি, এরা সবাই পীর বা গুরু। এদের রয়েছে শিষ্য, প্রশিষ্য, ভক্ত-মুরিদ। তাঁরা এই গুরু শিষ্য মিলে একটি মতাদর্শে একটি গোত্র বা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে সাধনা করে। এই খানকায় মাসিক ও বাৎসরিক ওরশ অনুষ্ঠিত হয়। এই ওরশে এ সমস্ত লোককবিদের সঙ্গীত খুব শ্রদ্ধার সাথে গীত হয়। যেমন মোঃ আবদুল খালেকের একটি দেহতত্ত্ব সঙ্গীত–

শীরয়তের গাছে ফলে, মারিফতের ফল।
মুর্শিদ ধরে খবর করে জেনে নাও, ভেদ এ সকল ॥
আদম নগর-আহমদপুর
জ্বলছে বাতি নুর আলা নুর
গাছের গোড়া বায়তুল মামুর,
মুহম্মদ গাছের বাকল ॥
বারো মাসে ফুটে ফুল
আশেক ভ্রমর বসে আকুল
চিনো গিয়া সেই-কুলের মূল
প্রেম রসে ফল টলমল ॥[৫১]

রাজশাহী অঞ্চলের লোকসঙ্গীত শুধুমাত্র মানব হৃদয়ের হাসিকান্নার দ্যুতিই বহন করে না বরং এদেশের সমাজের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের চিত্রে সমাজ মানসের ধর্মীয় ও লৌকিক বিশ্বাস সংস্কার রীতি-নীতি, খাদ্যাভ্যাস ও বস্ত্র পরিধানের সংবাদ, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং আধ্যাত্মিক ও দেহ সাধনার অনেক তত্ত্ব ও তথ্য আমাদের কাছে উদঘাটিত করে।

পরিশেষে বলা যায় বিভিন্ন সময় রাজশাহীর মাটিতে নরোত্তম দাস, শুকুর মামুদ, তাহের মামুদ ও হেয়াত মামুদ সহ বিভিন্ন বৈষ্ণব সাধক, বাউল ও সুফি তত্ত্বের সাধকের আবির্ভাব ঘটেছে। এ সব সাধক তাঁদের জ্ঞান চর্চার পাদপীঠ থেকে যুগ যুগ ধরে রাজশাহীতে লোকসঙ্গীত সাধনার পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করে আসছে। তাঁদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব-প্রেরণা এবং সর্বোপরি লোক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় লোককবিরা তাঁদের আন্তর-প্রেরণায় স্বতোস্ফূর্তভাবে রচনা করে চলেছেন মরমি ধারার অধ্যাত্ম সাধনসঙ্গীত। এ ছাড়া, বাস্তব জীবনালেখ্য নির্ভর সাহিত্য-সঙ্গীতও তারা চর্চা করছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে এসব লোককবির জীবনকথাই তুলে ধরা হবে।

তথ্যসূত্র

১ ড. দুলাল চৌধুরী, *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ* (কলকাতা : আকাদেমি অব ফোকলোর, ২০০৪), পৃ. ২২।

২ উদ্ধৃতঃ শামসুজ্জামান খান, 'এ্যালান ডান্ডেস: ফোকলোর ও নৃতত্ত্ববিদ্যার এক অসামান্য প্রতিভার প্রতিকৃতি', আবুল হাসনাত (সম্পা.), *কালি ও কলম*, ঢাকা, জুলাই ২০০৫, পৃ. ১১।

৩ ড. দুলাল চৌধুরী, *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, পৃ. ২৬।

৪ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, "বরেন্দ্র অঞ্চল বা রাজশাহী বিভাগের ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক পরিচিতি", ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী ও অন্যান্য (সম্পা.), *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস* (রাজশাহী : বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৮), পৃ. ৩।

৫ GOB, *Bangladesh Population Census 1991* (Rajshahi : Bangladesh Bureau of Statistics, 1993), p. 1.

৬ মুহম্মদ আবু তালিব, "রাজশাহী জেলার ভাষা প্রসঙ্গ", শামসুদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *রাজশাহী পরিচিতি* (রাজশাহী : বরেন্দ্র একাডেমী, ১৯৮০), পৃ. ৬৫।

৭ W. W. Hunter, *Statistical Account of Bengal*, Vol. 2 (Delhi : D.K. Publishing House, 1974), pp. 54-55.

৮ অধ্যক্ষ মুহম্মদ এলতাস উদ্দিন, "রাজশাহী জেলার প্রাকৃতিক পরিচয় ও ইতিহাস", শামসুদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *রাজশাহী পরিচিতি* (রাজশাহী : বরেন্দ্র একাডেমী, ১৯৮০), পৃ. ৩০।

৯ মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, "ইংরেজ শাসনামলে রাজশাহী", ড. তসিকুল ইসলাম (সম্পা.), *রাজশাহী এসোসিয়েশন সাহিত্য পত্রিকা* (রাজশাহী : রাজশাহী এসোসিয়েশন, ১৯৮৭), পৃ. ৩৫।

১০ কাজী মোহাম্মদ মিছের, *রাজশাহীর ইতিহাস* (রাজশাহী : প্রকাশিকা সৈয়দা হোসনে আর বেগম, ১৯৬৫), পৃ. ৯।

১১ মুহম্মদ আবদুস সামাদ, *সুবর্ণ দিনের বিবর্ণ স্মৃতি* (রাজশাহী : উত্তরা সাহিত্য মজলিশ, ১৯৮৭), পৃ. ৩২।

১২ এবনে গোলাম সামাদ, *রাজশাহীর ইতিবৃত্ত* (রাজশাহী: প্রীতি প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ২।

১৩ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, "বরেন্দ্র অঞ্চল বা রাজশাহী বিভাগের ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক পরিচয়", পূর্বোক্ত, পৃ. ৪।

১৪ তদেব, পৃ. ৫।

১৫ তদেব, পৃ. ৬।

[১৬] মতিয়ার রহমান সরকার, *বাংলাদেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার* (নাটোর, ১৯৮৫), পৃ. ১১৩।

[১৭] ড. সাইসুদ্দীন চৌধুরী, "প্রাচীন বরেন্দ্র ভূমির পরিচয়", ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী ও অন্যান্য (সম্পা.), *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস* (রাজশাহী : বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৮), পৃ. ৫৩০।

[১৮] অধ্যক্ষ মুহম্মদ এলতাস উদ্দিন, "রাজশাহী জেলার প্রাকৃতিক পরিচয় ও ইতিহাস", পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬-৩৯।

[১৯] তদেব, পৃ. ৪১।

[২০] মুহম্মদ আবদুস সামাদ, "ইংরেজ আমলে রাজশাহী", পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫।

[২১] তদেব, পৃ. ৩৭।

[২২] অধ্যক্ষ মুহম্মদ এলতাস উদ্দিন, "রাজশাহী জেলার প্রাকৃতিক পরিচয় ও ইতিহাস", পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩।

[২৩] ড. তসিকুল ইসলাম, "বরেন্দ্র অঞ্চলে ভাষা আন্দোলন", ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী ও অন্যান্য (সম্পা.), *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮২-৫৯৩।

[২৪] রফিকুল ইসলাম, "বরেন্দ্র ভূমিতে মুক্তিযুদ্ধ", ড. সইফুদ্দীন চৌধুরী ও অন্যান্য (সম্পা.), *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪০।

[২৫] অধ্যক্ষ মুহম্মদ এলতাস উদ্দিন, "রাজশাহী জেলার প্রাকৃতিক পরিচয় ও ইতিহাস", পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।

[২৬] ড. মুহম্মদ আবদুল খালেক, "বরেন্দ্র ভূমির লোকসংস্কৃতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ", *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩০-১১৩১।

[২৭] মুহম্মদ আবু তালিব, উত্তর বঙ্গের সাহিত্য সাধনা, রাজশাহী ১৯৭৫, পৃ. ৬।

[২৮] আনিসুজ্জামান সম্পাদিত শহীদুল্লাহ রচনাবলী, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৯৫) পৃ. ৩০।

[২৯] সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, আদিপর্ব, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৬১।

[৩০] নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০) পৃ. ৬০১।

[৩১] সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড)* (কলকাতা : প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১৯৯১) পৃ. ১৯।

[৩২] মুস্তফা নূরউল ইসলাম, "বরেন্দ্র অঞ্চলের সাহিত্য: মধ্যযুগ", ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত পৃ. ৯০৫।

[৩৩] ড. মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, "রাজশাহীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক", শামসুদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য সম্পাদিত–*রাজশাহী পরিচিতি* (রাজশাহী: বরেন্দ্র একাডেমী, ১৯৮০) পৃ. ১৩৪।

[৩৪] ড. মাযহারুল ইসলাম তরু, *বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকসংগীত*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০২), পৃ. ৩৩।

[৩৫] মুহম্মদ আবুতালিব, *উত্তর বঙ্গে সাহিত্য সাধনা* (রাজশাহী: গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত জুলাই ১৯৭৫) পৃ. ৪৮৩।

[৩৬] মুস্তফা নূরউল ইসলাম, *বরেন্দ্র অঞ্চলের সাহিত্য: মধ্যযুগ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০৮-৯০৯।

[৩৭] ড. মাযহারুল ইসলাম তরু, *বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকসংগীত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

[৩৮] ড. মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, "বরেন্দ্র অঞ্চলের সাহিত্য: আধুনিক যুগ", *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১১।

[৩৯] মুহম্মদ আবু তালিব, *শাহ্ মখদুমের জীবনী তোয়ারিখ, সাহিত্যিকী*, ৩-খ, ১৩৭২ শরৎ।

[৪০] ড. মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, *বরেন্দ্র অঞ্চলের সাহিত্য: আধুনিক যুগ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১২।

[৪১] ড. মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, *রাজশাহীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮।

[৪২] ড. কাজী আবদুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, ১ম খন্ড, ১ম সংস্করণ ১৯৬১, পৃ. ২৬৫-৬৬।

[৪৩] ড. মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, *রাজশাহীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪।

[৪৪] ড. মাযহারুল ইসলাম তরু, *বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকসংগীত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।

[৪৫] ড. মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, *বরেন্দ্র অঞ্চলের সাহিত্য: আধুনিক যুগ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১৩।

[৪৬] তদেব, পৃ. ৯১৪।

[৪৭] ড. মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, *রাজশাহীর সাহিত্য ও সহিত্যিক*, পূর্বোক্ত পৃ. ১৫২-৫৩।

[৪৮] মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী, *বাংলাদেশের লোকসংগীত পরিচিতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৭৩) পৃ. ২৮১।

[৪৯] নিজস্ব সংগ্রহ: মোসাঃ হাদিসা খাতুন লাভলী, স্বামী মোঃ আবদুল ওহাব, গ্রাম– চকছাতারী, পোঃ ও থানা– বাঘা, জেলা– রাজশাহী, বয়স– ৩০, পেশা– শিক্ষকতা, সংগ্রহকাল–১৫.০৩.২০০৫।

[৫০] নিজস্ব সংগ্রহ: মোসাঃ শইদা খাতুন, পিতা– মোঃ ইনসান আলী প্রামানিক, গ্রাম– মোক্তারপুর , পোঃ মোক্তারপুর, থানা– চারঘাট, জেলা– রাজশাহী, বয়স– ৪০, সংগ্রহকাল ২০.০৩.২০০৫।

[৫১] নিজস্ব সংগ্রহ: হযরত এতিবুর রহমান, গ্রাম– খুঁটি পাড়া, পোঃ– বানেশ্বর, থানা– পুঠিয়া, বয়স–১২৭, সংগ্রহকাল–২২.০৩.২০০৫।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রধান প্রধান লোককবির জীবনকথা

১. মোঃ মকসেদ আলী

সৎ কবি মাত্রেই মৌলিক প্রতিভাস্পর্শী। আত্মিক অনুপ্রেরণা, স্বকীয় অনুশীলন এবং কৃত্রিমতাহীন নিরন্তর চর্চা তাঁদের অন্যতম পাথেয় ও প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিছু কিছু রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন প্রতিভার অনুকরণ বা অনুসরণ তাঁদের আপাত প্রেরণার উৎস হলেও একান্ত নিজস্ব বলয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে তা একেবারেই অকার্যকর। স্বকীয়তাহীন প্রতিভা কখনই মৌলিকত্বের দাবিদার হতে পারে না। 'কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল' হয়ে থাকতে হলে যে কোন কবি সাহিত্যিক বা মনীষীর চারিত্রিক বিশেষত্বে, কর্মে এবং সাধানায় মৌলিকত্ব অনিবার্য। লোককবি মকসেদ আলীর বেলায়ও কথাটা মিথ্যা নয়। মকসেদ আলীর মৌলিক প্রতিভাই তাঁকে লোকসাহিত্য আসরে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সৌভাগ্য সৃষ্টি করেছে।

লোককবি মকসেদ আলী ১৯৩৩ সনের ১৬ই এপ্রিল শুক্রবার ভোর রাতে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি উপজেলার দেওপাড়া ইউনিয়নের ঈশ্বরীপুর গ্রামে নানার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম তছিমুদ্দিন সরকার ও মায়ের নাম আওববান নেছা। তাঁর জন্মভূমি গোদাগাড়ি থানা সদর থেকে ২৫ কি.মি. পূর্ব দিকে এবং রাজশাহী কোর্ট থেকে ১৪কি.মি. পশ্চিমে। ঈশ্বরীপুর গ্রামের ৩ কি.মি. দক্ষিণ দিক দিয়ে পদ্মা নদী প্রবাহিত।

তাঁর পিতার বাস্তুভিটা গোদাগাড়ি উপজেলার গোগ্রাম ইউনিয়নের বলিয়া ডাইং গ্রামে। কবি শৈশবে নানা বাড়িতে মা ও মামা-মামির স্নেহে বড় হয়েছেন। সে সময় বাড়ির আশে পাশে স্কুল ছিলনা। তবে ঈশ্বরীপুর গ্রামের শাহ মোহাম্মদ সরকারের বৈঠক ঘরে পড়াশুনার ব্যবস্থা ছিল। সেখানে শুধু বাংলা ও অংক শেখানো হতো। আরবি ও ইংরেজি পড়ানোর রেওয়াজ তখনও চালু হয়নি। সেই বৈঠক ঘরে মকসেদ আলী শিক্ষক আফাজের নিকট দুই বছরে শিশু শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এরপর তিনি প্রেমতলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। বার্ষিক পরীক্ষার পূর্বে কবি হঠাৎ পালিয়ে বাড়ি চলে আসেন। পরবর্তী বছরের শুরুতে স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাঁর

পিতার নিকট খবর পাঠালেন যে,আপনার ছেলে লেখা পড়ায় ভাল ছিল, পরীক্ষা না দিয়ে হঠাৎ বাড়ি চলে গেল। আপনি এসে আবার ভর্তি করিয়ে দিয়ে যান। তাঁর পিতা তাঁকে আবার তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করে দিলেন। সেখানে তিনি প্রেমতলী গ্রামের মকবুল সরকারের বাড়িতে জায়গির থাকতেন। ছয় মাস থাকার পর আবার তিনি পালিয়ে বাড়ি চলে আসেন। এবার বাড়িতে থাকলেন তিন বছর। পরের বছর দামকুড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। এক বছর বাড়ি থেকে ক্লাস করেন। পরে গোসাই গ্রামে বাদল মণ্ডলের বাড়িতে জায়গির থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। সপ্তম শ্রেণীতে পড়াকালীন থাকেন ইমামগঞ্জ গ্রামের ইমাম আলীর বাড়িতে। এরপর তিনি চলে যান ফুলবাড়ি গ্রামের আজাহার সরকারের বাড়ি। সেখানে থেকেই এই দামকুড়া স্কুলে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। অভাব-অনটনের কারণে অকালে তাঁর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়।

কবির পিতা তছিমুদ্দিন সরকার মোট চারটি বিয়ে করেন। কবির বাবা বারবার বিয়ে করায় তাঁর মা দুঃখে ক্ষোভে সন্তানদের নিয়ে বাবার বাড়ি ঈশ্বরীপুর চলে আসেন। কবির নিজ মায়ের সন্ত ান ৩ জন, যথাক্রমে মকসেদ আলী (জন্ম-১৯৩৩), জহুরা খাতুন (জন্ম-১৯৩৪), খোরশেদ আলী (জন্ম-১৯৩৬)।

লোককবি মকসেদ আলী স্কুলে অধ্যয়নকালে স্কুলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান গেয়েছেন। ১০/১২ মাইল রাস্তা হেঁটে গানের আসরে যোগ দিয়েছেন। সে সময় ইদলপুর গ্রামে একটি আলকাপ গানের দল ছিল। সে দলের গানের আসরে তিনি যোগ দিতেন। কবি আলকাপ গায়কদের গান লিখে দিতেন এবং তাতে সুর দিতেন।

১৯৫৭ সনে কবির পিতা মা-বাবার বাড়ি থেকে সন্তানদের নিয়ে স্বামীর বাস্তুভিটা 'বলিয়া ডাইং' গ্রামে এসে বাড়ি করেন। এই বাড়ির পাশে ভাল একটি জমি বিক্রয়ের খবর পেয়ে কবি তাঁর মাকে মামার বাড়ির এলাকার জমি বিক্রয় করে পাশের জমিটা ক্রয়ের প্রস্তাব দেন। মা রাজি না হওয়ায় কবি রাগ করে বাড়ি ছাড়লেন এবং মাকে বলে আসলেন 'আমি যদি তোমার উপযুক্ত ছেলে হতে পারি তবে মুখ দেখাতে আসবো'।

এখান থেকে লোককবি মোকসেদ আলীর বিচিত্র জীবনকথার শুরু। প্রথমে তিনি দামকুড়া বাজারের বিভিন্ন দোকান ও হোটেলে কাজ খুঁজলেন। কিন্তু কেউ তাকে বিশ্বাস করলো না।

কোথায়ও তাঁর কাজ মিললো না। ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে দামকুড়া হাটে রাস্তার পাশে বসে চুল কাটা শুরু করেন। বাড়িতে ছোট ছেলে মেয়েদের চুল কেটে দিতেন। তাঁর নিজস্ব ক্ষুর কাঁচি সাথে নিয়ে এসেছিলেন। সেই ক্ষুর কাঁচি হলো তাঁর দুঃসময়ের বন্ধু।

প্রথম দিকে তিনি বিভিন্ন হাটে চুল কাটেন, পরে দামকুড়া বাজারের মসজিদের উত্তর পাশে জনৈক আজাহারের ঘর ভাড়া নিয়ে স্থায়ী সেলুন দেন। ১৯৫৮ সনে চুল কাটা ছিল ১ মাথা ২ আনা। তাঁর দিনে দুই টাকা আড়াই টাকা উপার্জন হতো। তখন চালের দাম ছিল ৪ আনা সের। সেখানে ৬ মাস চুল কাটার পর বিষয়টি বাড়ির এলাকায় জানাজানি হলে সেখান থেকে তিনি চলে আসেন ন'হাটা বাজারে। একটি হোটেলে রাত্রি যাপন করেন আর বিভিন্ন হাটে চুল কাটেন। ন'হাটা যাত্রা দলের পরিচালক মান্নান সরকারের সাথে কবির সখ্য গড়ে ওঠে। বাজার এলাকায় 'উদয় নালা' নাটকের রিহার্সাল হচ্ছিল। ঘটনাক্রমে পরিচালকের সাথে মনোমালিন্য হলে নাটকের নায়ক আর অভিনয় করলেন না। মান্নান সরকার মকসেদ আলীকে নায়কের অভিনয়ে বিহার্সাল করার জন্য ডাকলেন। কবি ভাল রিহার্সাল করলেন। রাতে ঘরে বসে এবং হাটে যাবার সময় নাটকের পাঠ মুখস্থ করেন। যে দিন নাটকটি মঞ্চস্থ হল, তিনি এত সুন্দর অভিনয় করলেন যে, তাঁর অভিনয়ে সবাই মুগ্ধ হল। ঢাকা থেকে আগত একজন মহাজন তাঁকে কিছু টাকা ও মেডেল পুরস্কার দিলেন। করির মন আনন্দে ভরে উঠলো।

কবির পিতা রাজশাহী ভূমি অফিসে চাকুরি করতেন। এবং কাদিরগঞ্জে একটি ভাড়াটিয়া বাসায় থাকতেন । কবির চাচাতো ভাই শফিউল্লাহ লোকমুখে শুনে কবিকে তাঁর পিতার নিকট নিয়ে আসেন। এই বাসায় থেকে কবি সঙ্গীত চর্চায় মেতে ওঠেন। তিনি রাজার হাতা এলাকায় মনু মাস্টার, ঘোড়ামারার লক্ষীকান্ত দে, রাজশাহীর বাদল লাহিড়ী ও তাঁর ছোট ভাই গোপাল লাহিড়ীর নিকট গান শেখেন। তিনি সেতার, তবলা ও হারমনিয়াম বাজানোও শেখেন।

১৯৬৬ সনের ১৮ই নভেম্বর কাদিরগঞ্জের খোশবর সেখের মেয়ে নূরবানুর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর তিন সন্তান, যথাক্রমে মাখতুমীন আল্ আজাদ শিল্প (জন্ম ১৯৬৮) আশফাকীন আল আজাদ বুলবুল (জন্ম ১৯৭৩), রুশ্নিয়ারা রুশি (জন্ম ১৯৮২)।[১]

১৯৭৭ সনে মকসেদ আলী রাজশাহীর খাজা হয়রত আব্দুল গণি শাহ এর নিকট বয়াত হন। গুরুর দেয়া ছবক অনুযায়ী দেহসাধনা করতে থাকেন। এবং সাধনালব্ধ বিষয় নিয়ে সঙ্গীত রচনা করেন। তাঁর গানের সংখ্যা প্রায় পাঁচশ। ১৯৮৫ সনের ২২শে নভেম্বর তাঁর মুর্শিদ খাজা হযরত আব্দুল গণি শাহ দেহ ত্যাগ করেন। ১৯৯২ সনের ২২শে নভেম্বর দিবাগত রাতে কবির গুরু মা, গুরুভাই ও ভক্তবৃন্দের মতানুসারে হাজিরান মজলিশে মোঃ মকসেদ আলীকে খলিফার পদে নিযুক্ত করেন। সেই থেকে তিনি গুরু পাঠের দায়িত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি, বাঘা, চারঘাট, পুঠিয়া, দুর্গাপুর, মোহনপুর ও পবা থানায় তাঁর অগণিত ভক্ত ও মুরিদ রয়েছেন। এ ভক্তদের বাড়িতে, উঠানে বসে তিনি অনেক সঙ্গীত রচনা করেছেন, সে গুলো তাঁদের কাছেই রয়ে গেছে। ভক্তরা সে গানগুলো শ্রদ্ধার সাথে মুখে মুখে গেয়ে বেড়ান। এঁদের গুরুশিষ্য ও শ্রোতা মিলে একটি গোষ্ঠী বা গোত্র আছে।

কবি একজন তত্ত্বজ্ঞ সাধক। তত্ত্বকথা শ্রবণ, তত্ত্বসার গ্রহণ এবং তত্ত্ববিষয়ক চিন্তাই তাঁর মূল লক্ষ্য। তিনি সাধনার দ্বারা বুঝতে পেরেছেন—নশ্বর এই দেহভান্ডে পরম পুরুষের অস্তিত্ব বর্তমান। সীমাবদ্ধ জীবদেহে অসীমের লীলা বড় বিস্ময়কর। কবি আত্মানুসন্ধান করে এক সত্তা আবিষ্কার করেছেন। কবি বলেন —

মানুষে সাঁই গাঁথা
মিথ্যা নয় সত্য কথা
জানগা তুই মানুষ ধরে
　　হিসাব নিকাশি ॥
মুরশিদ মওলা ওরাও মানুষ
বুঝে দেখ ওরে বেহুস
ধরবি যেদিন মুরশিদের হাত
　　সেদিন বুঝবি ॥[২]

এ সত্তা সম্পর্কে বাউল সম্রাট লালন শাহ্‌সহ পাঞ্জুশাহ্‌ ও খোদাবক্‌শ শাহ্‌ যা বলেছেন তার সাথে মকসেদ আলীর তত্ত্বদর্শনের সাযুজ্য আছে। যেমন—

ক. মানুষে মানুষ কামনা
সিদ্ধ কর বর্তমানে
ও সে খেলছে খেলা বিনোদ কালা
এই মানুষের তন ভুবনে।[৩]

খ. আজব কারখানা বোঝা সাধ্য কার ॥
সাঁই করেন লীলা ভবের পর ॥
এই মানুষে রঙ্গ রসে বিরাজ করেন সাঁই আমার ॥[৪]

গ. এই মানুষে আছে মানুষ
মানুষ ধরলে জানা যায়
ভাবের মানুষ দেখতে বেহুঁশ,
মানুষ ছাড়া কিছুই নাই ॥[৫]

পরিশেষে বলা যায়, মকসেদ আলীর সঙ্গীতে রয়েছে গভীর তত্ত্ব। বাউল সাধনার মর্ম কথাতেই তত্ত্ব সঙ্গীতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। তাঁর ভক্তগণ এ কারণেই ঐ সঙ্গীতকে তাদের আত্মার গান বলে গ্রহণ করেছেন। কাব্য ও সঙ্গীত রচনা করে কবি তাঁর মনের গভীর অনুভূতি প্রকাশ করেছেন।

২. মোঃ আবদুল খালেক

মরমি কবি লালন শাহকে ভাবসঙ্গীতের পথিকৃৎ বলা হয়। লালন পরবর্তীকালে দুদ্দুশাহ, জহরদ্দীশাহ, যাদুবিন্দু, পাঞ্জু শাহ প্রমুখ এ গানের উল্লেখযোগ্য গীতিকার। এঁদের উত্তরসাধক রূপে উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ মরমি কবি হিসাবে লোককবি আবদুল খালেক ওরফে খালেক পীরের আবির্ভাব।

লোককবি আবদুল খালেক ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ১২ চৈত্র মোতাবেক ১৯৪১ সনের ২৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার বাদ ফজর রাজশাহী জেলার পুঠিয়া থানার ৪নং ভালুকগাছি ইউনিয়নের চকদুর্লভপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম মোঃ আয়েজ উদ্দীন সরদার এবং মাতার নাম মোসাঃ সবেজান বিবি। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও বিনম্র স্বভাবের। কবির বাড়ির পাশ দিয়ে 'সন্ধ্যা নদী' বা 'সুন্দর নদী' প্রবাহিত ছিল। নদীটি এখন মৃতপ্রায়। কিংবদন্তী আছে এই নদী দিয়ে চাঁদ সওদাগর ও ধোনাই সদাগরের বানিজ্যিক নৌবহর যাতায়াত করত। কবির নিজ গ্রাম চকদুর্লভপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম শাহবাজপুরে চাঁদ সওদাগড়ের বাড়ি ছিল বলে জনশ্রুতি আছে। পুঠিয়া থানাসদর থেকে কবির বাড়ি ৪ কিঃমিঃ উত্তর-পশ্চিমে।

আবদুল খালেক পালোপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তিনি ৪র্থ শ্রেণী পড়েন মাইপাড়া সরকারী আদর্শ বিদ্যালয়ে। বানেশ্বর হাইস্কুলের শিক্ষক আবদুর রহমান সাহেবের পরামর্শে ১৯৫৬ সনে মাশকাটা দীঘি উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। তিনি কাঁটাকাখালীতে জনৈক সলেমান সাহেবের বাসায় জায়গির থাকতেন। এ সময় থেকেই তার কবিতা লেখা শুরু। একবার ভূগোল পরীক্ষার খাতায় কয়েকটি কবিতা লিখে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক মহলে সমালোচিত হয়েছিলেন। সে সময় থেকে সহপাঠিরা তাঁকে 'কবি ভাই' বলে ডাকতো। তাঁর কবিতা পড়ে স্কুলের হেড মাস্টার শ্রী সুরেশ বাবু, সহকারী শিক্ষক জিল্লুর রহমান,ও অত্র এলাকার তোফাজ্জল হোসেন মৃধা, ছানাউল্লাহ, আইন উদ্দীন সহ

অনেকেই সন্তুষ্ট হন এবং কবিতা লেখার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। ১৯৫৭ সনে এ স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ৭ম শ্রেণী পাশ করেন। কিন্তু সংসারে আর্থিক দৈন্যের কারণে অকালে তাঁর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৬০ সনের প্রথম দিকে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ফারুকী সাহেবের ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত চারঘাট থানার ইউসুফপুর ইসলামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এর তিন মাস পর বিভিন্ন কারণে মাদ্রাসাটি বন্ধ হয়ে যায়। কবি তখন শিক্ষার সুযোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হন। এ সময় তাঁর মধ্যে ভাবান্তর পরিলক্ষিত হয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁর মনে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসার উদয় হয়। কৈশোর ও যৌবনের এই সন্ধিক্ষণে তাঁর হৃদয়ে অজানাকে জানার এবং অচেনাকে চেনার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে। প্রকৃতি থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রবল বাসনা তাঁকে পেয়ে বসে। তিনি দেশের খ্যাতনামা বিভিন্ন আউলিয়ার মাজারে ঘুরে বেড়ান।

তাঁর এই অস্থিরচিত্ত জীবন স্থির করবার জন্য তাঁর পিতা তাঁকে বিরালদহ নিবাসী মোঃ আজিজুল হক থান্দারের জ্যেষ্ঠা কন্যা মোসাঃ মরিয়মের সাথে বিবাহ দেন। পিতার সংসারে ১১/১২ জন পোষ্য। উপার্জন নেই বললেই চলে। সংসারে চরম অভাব দেখা দেয়। দরিদ্রতার মধ্য দিয়ে তাঁর নতুন সংসার শুরু হয়। অর্ধাহার অনাহারে তাঁদের দিন চলতে থাকে। এমনকি ইজ্জত ঢাকার বস্ত্রাভাব দেখা দেয়। নিরুপায় হয়ে লোককবি আবদুল খালেক দিনমজুরীর কাজ শুরু করেন। সেই সঙ্গে চলতো দুঃখময় জীবনের প্রচন্ড ঝাঁকুনিতে বেরিয়ে আসা কবিতা, গানের চর্চা। পরে আধ্যাত্মিক সাধনা ও রচনায় মেতে ওঠেন তিনি। এই সময় তাঁর ঘরে সন্তান আসে। কবির প্রথম স্ত্রী মরিয়মের ৪ সন্তান যথাক্রমে আঙ্গুরা (জন্ম ১৯৬৫), খাদিজা (জন্ম ১৯৭৫), মুরশিদুল ইসলাম (জন্ম ১৯৮৩), মারুফা (জন্ম ১৯৮৫)। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী গুলনাহারের কোন সন্তান নেই।

এ সময় দিবানিশি কে যেন কোথা থেকে তাঁকে দূর্জ্ঞেয় আকর্ষণে টানতে থাকে, হাতছানি দিয়ে ডাকে। ওগো ভ্রান্ত পথিক তুমি এদিকে এসো। এইতো তোমার মুক্তির পথ। কবির সংসার জীবনের সাধ এবং স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তিনি সারা বাংলা ও ভারতের প্রসিদ্ধ আউলিয়া দরবেশ, সাধু সন্ন্যাসীর মাজার, আস্তানা ও তীর্থ স্থানে ঘুরে বেড়ান। তিনি স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে হযরত মাওলানা মোঃ এতিবর রহমান আল চিশতি নিজামির নিকট বয়াত হন। এ সময় তিনি সৃষ্টি রহস্যের অথই পারাবারে হাবুডুবু খেতে থাকেন। নিজের ভেতরে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। তিনি ভাবেন - 'কে আমি? কোথায় ছিলাম? এখানে কেন আসলাম? আবার কোথায় যাব? আমার পরিণতি কি দাঁড়াবে?'এ রকম জীবন জিজ্ঞাসায় তিনি এক সময় পাগল হয়ে যান। তাঁর আত্মীয় স্বজন ও গ্রামবাসী তাঁকে দড়ি ও লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে রাখত। ছুট পেলে জংগলে ও গোরস্থানে যেয়ে দিনের পর দিন রাতের পর রাত না খেয়ে ধ্যান করতেন। কোন এক সময় ইজ্জত ঢাকার মত বস্ত্র পরিধানে রেখে রাতে দিনে কুকুর বিড়ালের সঙ্গে ড্রেনের আবর্জনা কুড়িয়ে খেতেন। এভাবে চড়াই-উৎরাই এর মধ্য দিয়ে প্রায় নয়টি বছর কেটে যায়। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর সাথে সব সময় খাতা কলম থাকত। এ সময় তিনি অজস্র আধ্যাত্মিক গান লেখেন ঐশী প্রেমে পাগল হয়ে। তিনি তার মুরশিদের উপদেশ মত অনাহার, অনিদ্রা, নিরবতা ও নির্জন বাসের মাধ্যমে সাধনা করেন। তার মুরশিদ পুঠিয়া থানার বানেশ্বর ইউনিয়নের খুঁটিপাড়া গ্রামের হযরত মাওলানা মোহাম্মদ এতিবর রহমান আল চিশ্‌তি নিজামী তাঁকে দীর্ঘদিন নিজের সোহবতে রাখেন এবং যাবতীয় আধ্যাত্মিক বিদ্যা বা ইলমে তাসাউফের শিক্ষা প্রদান করেন। ১৩৭৩ সনে মুরশিদ তাঁকে কষ্টি পাথরে যাচাই করে খেলাফত প্রদান করেন। খেলাফত লাভের পর তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মানুষ্ঠান, জিকির আজগার, ওয়াজ নসিহত এবং দ্বীনের বয়াত করতে থাকনে। এরই ফাঁকে ফাঁকে চলতে থাকে সঙ্গীত সাধনা।

তাঁর মরমি কাব্য 'তৌহিদ সাগর' প্রকাশ হওয়ার পর বানেশ্বর এলাকার কতিপয় লোক কবিকে ধর্মদ্রোহী ও বানেশ্বর হাইস্কুলের মৌলবী শিক্ষক মোঃ হাবিবুল্লাহ

কবিকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেন। ১৩৮৩ সনের ১৮ই শ্রাবণ বুধবার বানেশ্বর হাট থেকে আবদুল খালেক ও তাঁর গুরু হযরত এতিবর রহমানকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে বানেশ্বর ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যান আবদুস সোবহানের গুদাম ঘরে আটকে রেখে বাজার ও আশপাশের এলাকায় মাইকিং করে ধর্মদ্রোহী কাফের আবদুল খালেকের বিচারের জন্য জনগণকে আহবান করা হয়। বিচারে তাঁর প্রকাশিত 'তৌহিদ সাগরে' পবিত্র কোরান বিরোধী বক্তব্য আছে বলে অভিযোগ আনে। জনগণের সামনে তাঁর মাথার কালো পাগড়ি কেরসিনের তেলের টিনে চুবিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। অকথ্য ভাষায় তাঁদেরকে গালাগালি করে এবং রাজশাহী কোর্টে তাঁর প্রকাশিত 'তৌহিদ সাগর' এর বিরুদ্ধে মামলা করে। মামলার রায়ে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে নির্দোষ খালাস প্রদান করেন।

চকদুর্লভপুর গ্রামে 'শাহীনূর দরবার শরীফ' নামে তাঁর খানকা আছে। প্রতি বছর শাওয়াল চাঁদের ১৩ তারিখে বাৎসরিক ওরশ হয়। সরকারী স্টেটে ৯ শতক জমির উপর এই খানকা প্রতিষ্ঠিত। কবিতা, সঙ্গীত রচনা করে সমাজের মানুষকে বুঝানোর জন্যে কবি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁর 'তৌহিদ সাগর' গ্রন্থটি চৈত্র ১৩৮২ বঙ্গাব্দে রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয়। এতে ২০৭টি মরমি সঙ্গীত স্থান পেয়েছে। তাঁর অন্যান্য কাব্য গ্রন্থ হলোঃ অকুল সাগর (১৯৮৬) অথৈ সাগর (১৩৭৮), অমৃত সাগর (১৩৭৮), বিরহ সাগর (১৩৮৬), ভাব সাগর (২০০৪), প্রশান্ত মহাসাগর (২০০০)। তাঁর উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ হলোঃ ইসলাম ঈমান ইহ্সান (১৯৯৯) প্রকাশিত, নিগূঢ় তত্ত্ব (১৩৭৮), নুর দর্শন (১৩৭৮), নবী দর্শন (১৩৭৮), ইক্‌রা বা জ্ঞান রহস্য (১৩৭৮), ফানা-বাকা (১৩৭৮), নাছিরা (১৩৮৫), এক লক্ষ (১৩৮৬), ও সুলতানান নাছিরা (১৩৭৮)। 'কলংকের বাঁশী' নামে তাঁর আত্মজীবনী মূলক একটি গ্রন্থ সংকলিত রয়েছে। কবির সঙ্গীতের সংখ্যা প্রায় এক হাজার।[৬]

সত্য লাভের জন্য কবি দেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নানাবিধ মাধ্যমের বিকাশ ঘটনানোর সাধনা করেছেন। এ দিক দিয়ে তিনি প্রাচ্য দেশীয় তত্ত্ব জ্ঞানীদের

সমগোত্রীয়। বিশেষত মরমি কবি লালন শাহের সাথে তাঁর চিন্তাধারায় অপূর্ব সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। কবি পরমাত্মাকে ধরার জন্য এস্‌মে জাতের চাবি ব্যবহারের কথা বলেছেন তার সঙ্গীতেঃ

নয় দরজা বন্ধ করে আপন ঘরে নিহার কর।
এস্‌মে জাতের চাবি দিয়া তালা মার পরস্পর ॥
আলিফ-হে - মিম- দালের ঘরে
আদম-ছফি বিরাজ করে
দেখ্ তাহার দক্ষিণ ধারে
বইতেছে পানির নহর ॥[৭]

কবির এই গানের সাথে লালন শাহের গানের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

কামের ঘরে কপাট মেরে।
উজান মুখে চালাও রস ॥
দমের ঘর বন্ধ রেখে।
যম রাজারে কর বশ ॥[৮]

কবির মতে প্রভুকে চিনতে হলে আগে নিজেকে চিনতে হবে। মানবকে চিনতে হবে। মানব দেহরে মধ্যেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু রয়েছে। মুরশিদের বীজমন্ত্র গ্রহণ করে অটলের সাধনার মাধ্যমে প্রভুকে পাওয়া যাবে।

মুরশিদ বীজমন্ত্র যার কানে রয়,
রতি রণে জিতে, সাধক হওয়া সহজ হয় ॥
বিশ্বব্রহ্মারে উপর
মানব দেহ আজব শহর
সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ির খবর
আগে করতে হয় ॥
চৌদ্দ নাড়ি প্রধান তাহার
উৎপত্তি হয় মূলাধর
ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না যার
আদ্য মূল গোড়া হয় ॥
ইড়া পিঙ্গলা দুই নাশাতে
সুষুম্না বয় মাঝখানেতে
ছয় ঋতু চব্বিশ ঘন্টাতে
সদা পরিবর্তন ॥[৯]

কবির গানের সাথে রাজশাহীর পবা থানার কবি শমসের আলীর গানের সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

পাগল শমসের কান্দে মনে
এতিবর কয় পাক জবানে।
ইড়া পিঙ্গলা চিনে
কর পিরিতি সুষুম্নার দেশে ॥[১০]

মরমি ভাবমাধুর্যে পরিপূর্ণ আবদুল খালেকের গানগুলো রাজশাহী অঞ্চলের শ্রোতাদের মুগ্ধ করে আসছে। সব সময় অন্তর্নিহিত তত্ত্ব না বুঝলেও সুরের ইন্দ্রজালে শ্রোতারা তন্ময় হয়ে যায়। একটি উদাসী মাটির সুর তাদেরকে পৌঁছে দেয় অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে। সর্বোপরি সুরের মাধুর্য ও তত্ত্ব কথায় আবদুল খালেকের গান অনির্বচনীয় রসলোকের সন্ধান দেয়।

৩. মোঃ ময়েজ উদ্দীন সা

অক্ষরজ্ঞানহীন এক অসাধারণ প্রতিভাবান লোককবি ময়েজ উদ্দীন সা ওরফে ময়েজ সা (১২৯০-১৩৫৫) জন্মেছিলেন রাজশাহী জেলার বাঘা থানার পদ্মাতীরবর্তী আম-জাম, কাঁঠাল কলায় ঘেরা ছায়া সুশীতল পাকুড়িয়া ইউনিয়নের কামাল দিয়াড় সিংগিরচক গ্রামে। গ্রাম্য দিনমজুর কাষ্ঠঘানি চালক ময়েজের গানে গ্রামীণ সাধারণ মানুষের দুঃখ বেদনা, বঞ্চনা, নির্যাতন, অশান্তির বাস্তবচিত্র অংকিত হয়েছে। সুখের চিত্র ময়েজের গানে নেই। দারিদ্র্য, দুঃখ, ভূমিকম্প, বন্যার বিবরণ তাঁর গানে বাস্তব মূর্তিতে ধরা দিয়েছে। সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মের নামে ভণ্ডামী, জমিদারী অত্যাচার এবং স্বদেশী আন্দোলনের প্রসঙ্গও তাঁর গানে স্থান পেয়েছে।[১১]

দ্যাখ বাঙ্গালীর কি দুর্দশা,
তোদের সোনার বাংলা খড়ের বাসা
তোদের পয়সা অন্যদেশে
শ্বেত পাথরের রাস্তা বাঁধা
তাদের শরীর স্বাস্থ্য থাকবে বলে
তার উপর রবাট কষা ॥[১২]

বাংলার বিভিন্ন রাজশক্তির পদচারণা যেমন রাষ্ট্রকে আন্দোলিত করেছে, তেমনি সমাজকেও। ব্রিটিশ শাসিত প্রায় দু'শো বছর (১৭৫৭-১৯৪৭) বাংলা ছিলো রাজনৈতিক আন্দোলন মুখর। যদিও (১৯৪৭-১৯৭১) পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনে ছিল ২৪ বছর। একটি দেশকে জাগাতে হলে আগেই জাগাতে হয় সমাজকে, এই সমাজ জাগরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন আমাদের দেশের সাহিত্য জগতের রাজনীতি ও সমাজ সচেতন কতিপয় ব্যক্তি। ময়েজ সা তাঁদের অন্যতম।

লোককবি ময়েজ উদ্দীন সা জন্মেছিলেন এক দরিদ্র সা পরিবারে। কাষ্ঠঘানি চালক তেল উৎপাদনকারীদের বলা হতো সা, সাজি বা কলু। তারা বংশানুক্রমে ছিলেন তেলি সা। ময়েজের পিতার নাম ছিল ফরিদ সা। ফরিদ ছিলেন তেলি সা। কবির মা-র নাম ছিল মুক্তি বিবি। পদ্মার ভাঙনে পরিবারটি বাঘায় এসে বসতি স্থাপন করে ১৩৪০ বঙ্গাব্দে। কিছুদিন পর ফরিদ সা পারিবারিক কারণে বাঘা থেকে বাস উঠিয়ে নিয়ে যান লালপুর থানার বুধপাড়া গ্রামে। সেখানে শ্বশুর বাড়িতে তিনি বসবাস করতে থাকেন। সেখানেই ফরিদ সা এবং তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

শিশুকালে পিতামাতার মৃত্যু হলে ময়েজ সা, ভাগ্যক্রমে কামাল দিয়াড় গ্রামে ফিরে আসেন এবং চাচা আমির সার আশ্রয়ে লালিত পালিত হতে থাকেন। ধুনাই সা নামে কবির এক চাচা বাস করতেন কুষ্টিয়ার ফিলিপনগর গ্রামে। বালক ময়েজ সেখানে চলে যান এবং কয়েক বছর ফিলিপনগরে বসবাস করেন। ৬ বছর বয়সে কবি চলে যান নাটোরের লালপুর থানার মাঝ পাড়ার গৌরীপুর গ্রামে তাঁর নানা সম্পর্কের এক আত্মীয়ের কাছে এবং বার বছর বয়স পর্যন্ত সেখানে লালিত পালিত হন সন্তান স্নেহে।[১৩]

অতঃপর ময়েজ ফিরে আসেন কামালদিয়াড় এবং নিজ গ্রামের নিরাপণ সা-র কন্যা পাঁচীকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর অস্থিরচিত্ত কবি স্ত্রীকে নিয়ে চলে যান লালপুরের গৌরীপুর গামের নানা বাড়িতে। সেখানে কিছুদন বসবাস করবার পর পুনরায় ফিরে আসেন কামালদিয়াড় গ্রামে পিতার বাস্তু ভিটায়। পারিবারিক ষড়যন্ত্রের কারণে কবি পিতার বিষয় সম্পত্তি হারিয়ে দুঃখ দৈন্যের মধ্যে দিনাতিপাত করতে থাকেন। জীবন ধারণের অন্য কোন উপায় না থাকায় ময়েজ দিনমজুরি করতে আরম্ভ করেন। অসাধারণ মেধা এবং দেহশক্তির অধিকারী কবি দৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করেন কিন্তু লেখাপড়া শেখা সম্ভব হয়নি।[১৪]

দুঃখ দৈন্যময় জীবনেও ময়েজ গান বাজনার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তাঁর একজন শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ছমির উদ্দীন সরকার তাঁকে স্বীয় গ্রাম কালিদাসখালিতে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। এ সময় কবি দিন মজুরী ছেড়ে পিতৃ পুরুষের ঘানি ব্যবসা শুরু করেন। জীবনের এই মোড় পরিবর্তনের কালে ময়েজ গান রচনায় মেতে ওঠেন। সুকণ্ঠ কবি গান রচনা করতেন এবং গাইতেন। স্থানীয় শিল্পরসিক ব্যক্তিরা কবিকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। আর্থিক কষ্টের দিনে ছমির উদ্দীন সরকার এবং কালিচরণ সাহা কবির প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন। এঁরা কবিকে নানাভাবে পৃষ্ঠ-পোষকতা করেছিলেন। বন্ধু কালিচরণের মা কবিকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। দুই পরিবারের সঙ্গে ময়েজের আমৃত্যু গভীর সম্প্রীতি বজায় ছিল।[১৫] ময়েজ সার পিতা ফরিদ সার দুই সন্তান ছিল। প্রথম সন্তানের নাম মফেজউদ্দীন সা (১২৮৬-১২৯৫, কৈশোরে মৃত্যুবরণ করেন) এবং দ্বিতীয় সন্তান ময়েজউদ্দীন সা (১২৯০-১৩৫৫)।

ফরিদ সা-র দ্বিতীয় সন্তান ময়েজ সা-র তিন ছেলে দুই মেয়ে। প্রথম মজির উদ্দীন সা (জন্ম-১৩২৫), দ্বিতীয় মহিরউদ্দীন সা (জন্ম ১৩৩০ মৃত্যু ১৩৯৭), তৃতীয় ফুলজান বিবি (জন্ম ১৩৩৪), চতুর্থ গুলজান (মৃত্যু ১৩৩৬, কৈশোরে মৃত্যুবরণ করেন), পঞ্চম মসলেমউদ্দীন সা (মৃতু ১৩৩৮, কৈশোরে মৃত্যু বরণ করেন)।

ময়েজ সা-র বড় সন্তান মজিরউদ্দীন সার আট সন্তান। চারটি ছেলে ও চারটি মেয়ে। প্রথম শাহাদৎ হোসেন (জন্ম ১৩৫৮), দ্বিতীয় রিজিয়া খাতুন (জন্ম ১৩৬২), তৃতীয় আবু বক্কর সিদ্দিক সা (জন্ম ১৩৬৬), চতুর্থ রাজিয়া খাতুন (জন্ম ১৩৭০), পঞ্চম পাপিয়া সুলতানা (জন্ম ১৩৭৪), ষষ্ঠ ওসমান গণি (জন্ম ১৩৭৬), সপ্তম তসলিমা খাতুন (জন্ম ১৩৭৯), অষ্টম জিল্লুর রহমান সা (জন্ম ১৩৮৪)।[১৬]

ময়েজ সা-র জন্ম মৃত্যুর সাল সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না, তেমনি কোন গানটি তিনি প্রথম রচনা করেছিলেন তারও হিসেব আমাদের হাতে নেই। অনুমান করা যায় ময়েজের জন্ম হয়েছিল ১২৯০/৯১ বঙ্গাব্দে। ১৩০২ মোতাবেক ১৮৯৭ বাংলায় এক মারাত্মক ভূমিকম্প হয়। সে দিন ছিল মুহর্‌রমের দিন। সে দিন ময়েজ বাঘায় মুহর্‌রমের মেলা দেখতে এসেছিলেন। ঐ ভূকম্পনে বাঘা শাহী মসজিদের ক্ষতি হয় (যা মেরামত করা হয় ১৯৭৬ সালে) এবং দরগা এলাকার অনেক ঘরবাড়ি ধবংস হয়ে যায়। এ সব ব্যাপার মানুষের মুখে মুখে শোনা যায়। ভূমিকম্পের সময় ময়েজের বয়স ছিল ১০/১২ বছর। কবির মৃত্যুর বছর ১৯৪৮ বা ১৯৪৯ হবে। চাঞ্চল্যকর ইয়াজোল হত্যা মামলায় ময়েজ সাকে জড়ানো হয়েছিল। ইয়াজোলের লাশ মজির উদ্দীন মিয়া দেখতে গিয়েছিলেন আঁধারকোটা গ্রামে। তখন তিনি পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। এই হত্যা মামলার (১৩৫৪-৫৫ রাজশাহী কোর্ট) আসামী ময়েজ যে 'জেলের গান' রচনা করেছিলেন তা তাঁর শেষ বয়সের রচনা। এবং কিছুকাল আগে তিনি রচনা করেছিলেন 'কন্ট্রোলের গান' এবং 'পাকিস্তানের গান। এ দুটি গানের বিষয়বস্তু ১৯৪৭/৪৮ সালের ঘটনাকেন্দ্রিক। এসব অনুমাননির্ভর তথ্য থেকে মনে হয় কবি ময়েজ সা কমপক্ষে ৬৫/৬৬ বছর বয়স পেয়েছিলেন- জন্ম আনুমানিক ১৮৮৩ মৃত্যু ১৯৪৯ খ্রি.।[১৭]

আপনকালের যে সব সামাজিক রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও সমস্যা কবিকে আলোড়িত করতো সে প্রসঙ্গে তিনি গান রচনা করতেন। জীবনের অসঙ্গতি, মিথ্যা, অসাধুতা, ভণ্ডামি তাঁকে পীড়িত করতো। এ সব ব্যাপার তাঁর গানে প্রতিফলিত হয়েছে। কবির 'তিলক কাটা কয়েক ব্যাটা হলো মহান্ত' গানটি ব্যাঙ্গাত্মক গান। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের সময় তিনি 'পাকিস্তানের গান' রচনা করেছিলেন। সমকালের দুর্ভিক্ষাবস্থা এবং রেশনিং প্রথা নিয়ে কবি যেসব গান রচনা করেন তা সমাজ সচেতন কবির যোগ্য কীর্তি।

ইয়াজোল হত্যা মামলায় অকারণে সন্দেহবশে কবিকে আসামী করা হয়েছিল। পরে তিনি নির্দোষ মুক্তি লাভ করেন। বিচারের আগে কয়েদ খানায় থাকবার সময় খাওয়া-দাওয়া পোশাক আশাকে যে কষ্ট ছিল তা নিয়ে ময়েজ একটি উপভোগ্য গান রচনা করেছিলেন। তাঁর সে গানটি সম্ভবত কারাধ্যক্ষ সাহেব শুনেছিলেন এবং তাতে প্রীত হয়ে ময়েজের উপর কোন জুলুম না হয় সে রূপ আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু বিচার এবং খালাসের ব্যাপার কোর্টের এখতিয়ারভুক্ত তাতে কারাধ্যক্ষের কিছু করণীয় থাকে না। যা হোক কারামুক্তির পর কবি খুব বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। ময়েজের গানগুলো কেউ সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখেনি, তবে সঙ্গীত পিপাসু ময়েজ ভক্তদের মুখ থেকে তা সংগ্রহ করা হয়। লিখে না রাখার কারণে ময়েজের মৃত্যুর পর গানগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। জেলখানার গানটি আংশিক সংগ্রহ করা হয়েছে। ময়েজ বলেন :

ভাইরে জেলখানাতে দুঃখে আছি কে বলে
পায়খানায় যাই জল ভরে খাই এক লুটাতে সব চলে
ভাইরে জেলখানাতে দুঃখে আছি কে বলে।
আর দুটি প্যান্ট, দুটি শার্ট, দুখানা কম্বল
একটা থালা একটা লুটা করেছে সম্বল।
এক খুরা ভাত, এক খুরা ডাল
তাতে ক্ষুধার হয়না ইতি
আবার ডাল কিংবা ভাত চাইলে পুলিশ ডাণ্ডা ধ্যালে
ভাইরে জেলখানাতে দুঃখে আছি কে বলে।[১৮]

ময়েজ সা পদ্মার ভাঙনে সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। বাল্যকালে মাতৃপিতৃহীন হয়ে তিনি চাচার কাছে মানুষ হন। লেখা পড়ার সুযোগ তার জীবনে ঘটে না। বড় হয়ে দিনমজুরি করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন। অশিক্ষিত ময়েজ বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীত সংস্কৃতি-অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং কথার মিল দিয়ে গান রচনা করে তাঁর গ্রাম এলাকায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ময়েজের উত্তরাধিকারী এবং ভক্তদের মুখ এবং খাতা থেকে সংগৃহীত কিছু গান আমরা পেয়েছি। অশিক্ষিত গ্রাম্য দিনমজুর, কাষ্ঠঘানি চালক ময়েজের ভাষা অনাড়ম্বর আপাত শিল্প বৈভবহীন, বাস্তবধর্মী, কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর গানে অশ্লীল শব্দ এবং অরুচিকর চিত্র সংযোজিত। তবে অধিকাংশ গানেই গ্রাম্য জীবনের সাধারণ মানুষের দুঃখবেদনা, বঞ্চনা, নির্যাতন, অশান্তির বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত। সুখের চিত্র ময়েজের গানে নেই। দারিদ্র্য দুঃখী মানুষের বিবরণ, প্রশাসনের নির্যাতন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের বর্ণনা নদী-ভাঙ্গন, ভূমিকম্প, বন্যার বিবরণ তার গানে বাস্তব মূর্তিতে ধরা দিয়েছে। জমিদারী অত্যাচার এবং স্বরাজ আন্দোলনের প্রসঙ্গ তাঁর বক্তব্যে ধরা পড়েছে। যাদের জন্য তিনি গান লিখেছেন এ গানের ভাষাও তাদের।[১৯]

লোককবি ময়েজ সা নিরক্ষর হলেও তিনি ছিলেন বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী। লেখাপড়া না জানলেও গান রচনায় ছিলেন দক্ষ। বর্তমান গবেষক কর্তৃক ময়েজ সার চল্লিশটি গান সংগৃহীত হয়েছে। এ গুলো ময়েজ সার পুত্র, কন্যা, নাতি ও এলাকার বিভিন্ন সঙ্গীতপ্রিয় মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত। গানগুলোর একটি তালিকা এখানে দেয়া হলো :

১. আল্লাহর নাম সার করে যে পড়ে বয় (১৩২৪)
২. অবেবসিকের গান (১৩২৬)
৩. ভণ্ডফকিরের গান (১৩২৭)
৪. লালমনের নিকা (১৩২৮)
৫. জমিদার ইংরেজদের গান (১৩২৯)
৬. বাঘার গান (১৩৩১)
৭. আমের গান (১৩৩৩)
৮. ডাক্তারের গান (১৩৩৫)
৯. পাইটের গান (১৩৩৮)
১০. নদী ভাঙার গান (১৩৪০)
১১. পদ্মাপারের গানের দল (১৩৪০)
১২. তারা বাবুর বাড়ির গান (১৩৪০)
১৩. বানের গান (১৩৪১)
১৪. ইসলাম ধর্ম (১৩৪২)
১৫. বাংলার গান (১৩৪৩)
১৬. নিজের ব্যবসা (১৩৪৪)
১৭. পৈতার গান (১৩৪৫)
১৮. চরের জলির জমি বেসমার (১৩৪৬)
১৯. তিলকের গান (১৩৪৭)
২০. পণ করে সব লাগলো কাজে (১৩৪৮)
২১. কর্মের যুগ এসছে (১৩৪৮)
২২. এসেছো ন্যাংটা যেতে হবে ন্যাংটা (১৩৪৮)
২৩. জল্ জল্ জল্ কাম নয়ন কল্ (১৩৪৯)
২৪. জাগোরে মন ভারতবাসী (১৩৪৯)
২৫. রাম রহিম নাম জোদা কর ভাই(১৩৪৯)
২৬. আল্লা আর আমি ভিন্ন কে আছে আমার (১৩৫০)
২৭. শুধু মুখের কথায় রতন মিলে না (১৩৫০)
২৮. বিধি কি করলে কলির কালে (১৩৫০)
২৯. বলরে তোর মনের মানুষ কোন জনা (১৩৫১)
৩০. গুরু যারে ভাল বাসেনি ভাই (১৩৫১)
৩১. মজা মারলো ঢাকার ব্যাপারী (১৩৫১)
৩২. তুমি মনে মনে ঠিক না জেনে মন (১৩৫১)
৩৩. জেতু বিশ্বাস করে প্রকাশ (১৩৫২)
৩৪. ঐ আমি দেখি ঘরে ঘরে (১৩৫২)
৩৫. আগে বসরে মন গুরুর কাছে (১৩৫৩)
৩৬. সন্ন্যাসীর সঙ্গলয়ে গো (১৩৫৫)
৩৭. সহজে কি মলার সে ধন পাবি (১৩৫৪)
৩৮. পাকিস্তানের গান (১৩৫৫)
৩৯. কন্ট্রোলের গান (১৩৫৫)
৪০. জেলখানার গান (১৩৫৫)[২০]

সামাজিক সমস্যা বা গ্রাম জীবনের ঘটনানির্ভর গানে আছে ইতিহাসের তথ্য, মানব চরিত্রের জটিলতা, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ এবং হাস্যরস। 'কন্ট্রোলের গান'-এ কন্ট্রোল বা রেশনিং প্রথা ইতিহাসের সত্য। এক দিকে সাতচল্লিশের দেশ ভাগ অন্যদিকে দুর্ভিক্ষে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে এসেছিল বিশৃঙ্খলা এবং নিদারুন দৈন্য। চাল, ডাল, চিনি, তেল, লবণ সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে চলতো কালোবাজারি। কন্ট্রোল ব্যবস্থা সেদিন মানুষের যন্ত্রণার কারণ হয়েছিল। ময়েজের গানে তার পরিচয় আছে। তিনি বলেছেন যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চিরকাল দোকানে পাওয়া যেত কন্ট্রোল ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর তা বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল। চোরাকারবারিরা এ সব নিয়ে যে খেলায় মাতলো তাতে গরীবের জীবন হলো বিপর্যস্ত। ধান, চাল, কাপড়, কেরোসিন ইত্যাদি নিয়ে যে কাণ্ড ঘটতো সে সব কথা ময়েজ নির্ভীকভাবে বর্ণনা করেছেন। ফুড কমিটির সেক্রেটারি, ডিলার, পেট্রোল অফিসার ইত্যাদির কর্মকাণ্ড আর আচরণ ময়েজ সাহসের সাথে উচ্চারণ করেছেনঃ

ক. সেক্রেটারির কাছে যায় বিধবারা সব কাপড় চায়
বলে ঝাট কামায়ে কাপড় কি বানাবো?
সদ্য যদি কাপড় চাও, কাছে একরাত থাইকা যাও
কাল সকালে কাপড় দিবো ভালো।
.........কন্ট্রোলের আইন কেন হলো॥

খ. দেশের ধন মহাজন ভাবছে তারা সর্বক্ষণ
আমাদের ঐ ব্যবসা মারা গেল—
লাইসেন কিনিলে মাল রাস্তায় করে চৌদ্দহাল
ঘুষ দিতে লাভের অংশ গেলো।

গ. অধীন ময়েজ উদ্দিন বলে ম্যাসটেটদের বাস্ত পেলে
পাবলিক তোদের হতো ভাইরে ভালো
পুরানো যা ত্যানা ছিল পরে এতদিন গেলো
এখন দেখছি বেইজ্জত হলো . . . .।[২১]

ময়েজ সা তাঁর বেশীর ভাগ সঙ্গীতেই বিষয়বস্তু হিসাবে নির্বাচন করেছেন স্বদেশ কিংবা সমাজের পটভূমি। তিনি তাঁর সঙ্গীতে আমাদের সমাজের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরেছেন। যেহেতু সঙ্গীত আমাদের জীবনের কথা বলে তাই তিনি সমাজের এ সব অসংগতি তুলে ধরার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন সঙ্গীতকে। এ ছাড়াও তাঁর সঙ্গীতে অত্যাচারী শাসক এবং ভারতের স্বাধীনতার কথাও প্রসঙ্গক্রমে নিয়ে এসেছেন এবং তাতে সঙ্গীত রচয়িতার স্বদেশ প্রেমেরই পরিচয় পাই।

সংবেদনশীল লেখক মানেই সমাজ সচেতন শিল্পী, সত্য প্রকাশে অকুতোভয় সৈনিক। লোককবি ময়েজ সা বিভাগ পূর্ববর্তী বাংলাদেশের এক প্রধান সঙ্গীত স্রষ্টা। যদিও তার সঙ্গীত চর্চার প্রয়াস শুরু হয়েছিল সেই চল্লিশের দশকে। সমাজ ও স্বদেশ নিয়ে তার ভাবনার যে ক্রম বিবর্তন তা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়েই বেশী প্রতিফলিত হয়েছে।

লোককবি ময়েজ সা ছিলেন সৎ ও সফল ব্যক্তিত্ব, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির গৌরবময় ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। তিনি ছিলেন প্রগতিশীল ও মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন মহৎ ও হৃদয়বান মানুষ। তাঁর নিজ ধর্মের প্রতি ছিল অগাধ বিশ্বাস। তিনি ধার্মিক ছিলেন কিন্তু ধর্মান্ধ ছিলেন না। কর্তব্যে নিষ্ঠাবান, সদালাপী এবং অন্যায়ের প্রতি আপোসহীন এক বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

মহান লোককবি ময়েজ উদ্দীন সা-র মৃত্যুর পর দেশের বহু গুণী ও খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ তাঁর পরিবারে ও কর্মস্থলে শোকবার্তা প্রেরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে হলেও এ এক দুর্লভ সম্মান। তাঁর মৃত্যুতে দেশ ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হলো। তবে তাঁর সাধনার ধন যে সঙ্গীতমালা তা আগামী প্রজন্মকে সমাজ সচেতন করতে অনুপ্রেরণা যোগাবে এবং প্রতিনিয়ত নতুন পথের সন্ধান দেবে।

৪. মোঃ কলিম উদ্দীন মিঞা

লোককবি মোঃ কলিম উদ্দীন মিঞা রাজশাহী জেলার বাঘা থানাধীন ২নং গড়গড়ি ইউনিয়নের গড়গড়ি গ্রামে ১৯৫০ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ ওয়াজ উদ্দীন, মাতার নাম আরেফা বেগম। তিনি দাদপুর গড়গড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন কালিদাসখালী উচ্চ বিদ্যালয়ে। এবং ১৯৬৯ সনে বাঘা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২য় বিভাগে এস. এস. সি. পাশ করেন। এবং আব্দুলপুর মহাবিদ্যালয় থেকে ১৯৭১ সনে এইচ.এস.সি. পাশ করেন।

কবির বয়স যখন ১০ বছর, তখন পদ্মার কড়াল গ্রাসে কবির বাস্তুভিটাসহ কয়েকটি গ্রাম নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। গ্রামগুলো হলো গড়গড়ি, কামাল দিয়ার, দিয়ারকাদির পুর, কলিগ্রাম, শিবরাম পুর, কালিদাসখালী, আবদুলপুর ও দাদপুর। সহায় সম্পত্তি হারিয়ে কবির পরিবার রিক্ত হস্তে গড়গড়ি ইউনিয়নের খায়েরহাট গ্রামে আবাস গড়েন। একদিন বড় গৃহস্থ পরিবার ছিলো তাঁদের। সে সময় তারা না পারে কামলা দিতে, না পারে খাবার যোগাতে। অনাহারে অর্ধাহারে মানবেতর জীবন কাটে তাঁদের। স্কুল ছাত্রাবস্থায় তিনি লেখা পড়ার পাশাপাশি ব্যবসা করেছেন। মৌসুম অনুসারে কপি, টমেটো বীজ রোপন করে চারা তৈরী করে, সে চারা হাটে বিক্রি করতেন। আবার গাছ থেকে কাঁঠাল কিনতেন, সে কাঁঠাল পাকিয়ে বাজারে বিক্রি করতেন। শুকনা হলুদ কিনে আড়ানীর হাটে নিয়ে বিক্রি করতেন। কবির বাবা, ভাই খেজুরের গাছ লাগায়ে, গুড় তৈরী করে বাজারে বিক্রি করতেন। অভাবের কারণে তারা খুব সস্তা দামের খাবার গ্রহণ করতেন, যেমন গমের ভাত, খেসারীর ছাতু, যবের ছাতু, পাটের শাক ও কচুর শাক।

তিনি ৫ম শ্রেণীতে পড়ার সময় থেকে গান, কবিতা ও ছড়া লেখা শুরু করেন। স্কুলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ ও গান গেয়ে প্রথম হয়ে পুরস্কৃত হয়েছেন। গড়গড়ি স্কুল মাঠে ও কালিদাসখালী স্কুল মঞ্চে নাটক করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন।

১৯৭২ সনে খায়ের হাট গ্রামের পাঁচু প্রামাণিকের একমাত্র কন্যা মোসাঃ সখিনা বেগমের সাথে কবির বিয়ে হয়। সংসারে অভাবের তাড়নায় তাঁর উচ্চ শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। বাধ্য

হয়ে ১৯৭৩ সনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। প্রথমে জোতরাঘব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৭ বছর চাকুরী করেন। ১৯৮৯ সনে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে প্রমোশন পেয়ে যান খানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, সেখানে ১ বছর, চাঁদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ বছর, নিজ এলাকার দাদপুর গড়গড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ বছর চাকুরী করেন। এবং ১৯৯৯ সনে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি হলে মনিগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি অত্র প্রতিষ্ঠানে কর্তব্যরত আছেন।

১৯৭৭ সনে অজানা আর্কষণে তিনি ঘুরে বেড়ান বিভিন্ন আউলিয়ার মাজার ও খানকায়। কামেল পীরের সন্ধান করেন দুই বাংলা ব্যাপী। ১৯৭৮ সনে তিনি কুতুবুল আলম গাউসে রাব্বানী গাউসুল আজম হযরত মৌলানা মুহম্মদ সোলায়মান হোসাইন সাহেবের নিকট বয়াত গ্রহণ করেন। পীর কেবলা কুমিল্লা জেলার পৌমগাঁয়ের সুফি সাধক হযরত মৌলানা মুহম্মদ কুতুবে আলম গাউসে রাব্বানী গাউসুল আজম সৈয়দ হাবিবুল্লাহ নূরীর জামাতা। তিনি পীরের নিকট থেকে শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারিফত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন এবং উক্ত জ্ঞানের নির্যাসে মারফতি, মুর্শিদি ও ভক্তিমূলক গান রচনা করেন। যেমন –

ভবে মানব জনম সোনার জনম
এ জনম আর হবে না,
তুমি আত্মাতে পরমাত্মার মন
করবে যোগ সাধনা ॥
তুমি যতই হও মন টাইটেল ধারী
ভবে আলেম ফাজেল হাফেজ ক্বারী
তবু হবে না হায় মোকাম জারী
কামেল পীর শরণ বিনা॥[২২]

তাঁর সাধনালব্ধ বিষয় সম্পর্কে বললেন, 'সাধন তত্ত্ব' লেখনী দ্বারা সাধারণ জনকে বেশী কিছু বোঝানো সম্ভব নয়। খাতা কলম ছাড়াই সিনায় সিনায় এই গুরু তত্ত্ব মনের মনিকোঠায় সঞ্চিত হতে থাকে। যা ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নয়। এই সম্পদ লাভ করতে হলে গুরুর কৃপা লাভ একান্ত প্রয়োজন। সাধক কবির মতে, মানব দেহকে কেন্দ্র করেই তাঁদের মূল সাধনা। তাঁরা অনুমানে বিশ্বাসী নয়, বর্তমানে বিশ্বাসী। মানব দেহকে আশ্রয় করে তাঁদের সব সাধনা। কারণ এই বিশ্ব ব্রাহ্মাণ্ডে যা আছে সবই আছে এই দেহের মধ্যে। কাজেই দেহের সাধনা সর্বশ্রেষ্ট সাধনা।

দেহের সাধনা করতে পারলেই পরম মানুষকে পাওয়া যাবে। এই আধ্যাত্মিক সাধনায় মানুষ যখন কামিয়াবী হয়ে যায়, তখন সে আর সাধারণ মানুষ থাকেনা। পরম মানুষের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ে যায়। তখন সে এ বিশ্ব ভ্রমাণ্ডে যা কিছু ঘটে সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে যায়। এর পর যা কিছু ঘটে তা বলা নিষিদ্ধ, বলার বিষয়ও নয়, শুধু অনুধাবনযোগ্য।

লোককবি মোঃ কলিম উদ্দীন মিঞা সেই সমস্ত ওলি আউলিয়াদের নিয়ে গান লিখেছেন, যাঁদের পদধূলিতে বাঘার মাটি ধন্য হয়েছে। যাঁদের সমাধির কারণে বাঘা ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। যেমন :

তোরা দেখে যারে পদ্মা তীরে
বাঘাতে এসে একবার
শাহ্ অব্বাস, শের আলী, হামিদ
শাহ দৌলার মাজার ॥
হেথা আছেরে ভাই-শাহী মসজিদ
অপূর্ব তার কারুকাজ,
নিপুণ হাতে গড়া সেতো
নানা রংয়ের নানা সাজ
ও তার পুবদিকে প্রকাণ্ড দীঘি
চৌদিকে শোভা ভাণ্ডার ॥
বাঘায় বিয়াল্লিশ মৌজার ভূমিদান
করেছিলেন শাহ্জাহান
গৌড় বাদশা নূসরত শাহর
মসজিদ আর দীঘি নির্মাণ
সবিতো ভাই আউলিয়াদের
গুণ প্রকাশের হয় কারবার ॥[২৩]

কবির পিতা ওয়াজ উদ্দীনের ৭ সন্তান যথাক্রমেঃ সামিয়ন খাতুন, বাহার উদ্দীন, মোঃ কলিম উদ্দীন মিঞা, সূর্যমনি খাতুন, কোহিনূর খাতুন, আবদুল আলিম ও রাজিয়া খাতুন। লোককবি কলিম উদ্দীনের ৪ সন্তান, যথাক্রমে কুতুবুল আলম, ফোহাদুল ইসলাম, পাপিয়া পারভীন ও শরীফুল আলম।[২৪]

তিনি পল্লীগীতি, ভাওয়াইয়া, মারফতী, মুর্শিদী, ও ভক্তিমূলক গান লিখেছেন। তাঁর গানের সংখ্যা প্রায় চারশ। কবির প্রায় ৩০০ গানের সমন্বয়ে ‘গীতি বিচিত্রা সামগ্রী’ নামে গীতি কাব্য গ্রন্থ

প্রকাশের পথে আছে। তিনি বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী কেন্দ্রের একজন গীতিকার। তাঁর সঙ্গীত রাজশাহী অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাঁর সঙ্গীতের উল্লেখযোগ্য গায়কেরা হলেন- মনিগ্রামের শাহ্‌সুফি ডাঃ নূরুজ্জামান ভাণ্ডারী, হযরত খাজা মহসিন আলী আল্‌ চিশতি, বাঘার আবদুর রশিদ, বাউল মফিজ উদ্দীন পাগলা, মুশিদপুরের প্রভাষ চন্দ্র দাস, শ্যামল কুমার দাস, খায়েরহাটের সিদ্দিকুর রহমান, খানপুরের মাতেয়ারা নাইস, চকরাজাপুরের লক্ষ্মী পাগলী, রহমান বয়াতী, হেলাল পুরের হারেজান পাগলী ও মুশিদপুরের শইদা বেগম। তিনি আজীবন আধ্যাত্মিক সাধনা ও সঙ্গীত রচনা চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

৫. হযরত খাজা মহসিন আলী আল চিশতি

লোককবি হযরত খাজা মহসিন আলী চিশতি রাজশাহী জেলার বাঘা থানার মনিগ্রাম পোস্ট অফিসের অন্তর্গত বলিহার গ্রামে ১৯৫৮ সনে ১০ই জানুয়ারী তারিখে ভোর রাতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ইসমাইল প্রামাণিক ও মাতার নাম খাতুন নেছা। তিনি মনিগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। মনিগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৭ম শ্রেণী পাশ করার পর দরিদ্রতার কারণে অকালে তাঁর লেখা পড়া বন্ধ হয়ে যায়।

ছোট বেলা থেকে কবি গান প্রিয় ছিলেন। পালাগান, যাত্রাগান শোনার জন্য ১০/১৫ মাইল দূরে পায়ে হেঁটে যেতেন। সারা রাত গান শুনে পরদিন বাড়ি ফিরে বাবা মায়ের বকুনী খেয়েছেন অনেক দিন। নিজ গ্রামে গানের মজমা বসিয়ে গান গেয়ে গ্রামবাসীদের মুগ্ধ করতেন।

কবির মায়ের মাথা ব্যাথার অসুখ ছিলো। চিকিৎসার জন্য কবিকে সাথে নিয়ে বাঘা থানার বলারামপুর নিবাসী মৌলভী রহমতুল্লার ছেলে হাফেজ আবদুল মোনায়েম এর নিকট যেতেন। হাফেজ মোনায়েম, পাগলাবেশে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু তাঁর চিকিৎসা ছিল অত্যন্ত ফলপ্রসূ। হাফেজ মোনায়েম পাগলার অদ্ভুত কর্মকাণ্ড এখনো মানুষের মুখে মুখে আলোচিত হয়। একবার বাঘা বাজারের এক দোকান থেকে হাত ভর্তি করে আলকাতরা তুলে মাথায় নিলেন। অন্য দোকানে যেয়ে হাত ভর্তি করে সোডা মাথায় নিয়ে নদীতে চলে গেলেন। নদীর জলে গোলস করে বাড়ি ফিরলেন। আবার দেখা গেছে গরুর গাড়ি নিয়ে গাড়োয়ান যাচ্ছেন। তিনি গাড়ির সামনে যেয়ে বলতেন, থামো! ক্ষুধার্ত গরু দিয়ে গাড়ি বইতে নেই, এই বলে গাড়ি থেকে গরু খুলে নিয়ে ঘাস খাওয়াবার জন্য নিয়ে যেতেন মাঠে। খাওয়ানো শেষ করে গরু পৌঁছে দিতেন গাড়োয়ানের কাছে। এ রকম বহু পাগলামী করেছেন তিনি। অনেকের ধারণা তিনি আধ্যাত্মিক লোক ছিলেন।

পাগল সে সময় কবিকে এক দেড় ঘণ্টা বুকে চেপে ধরে রাখতেন। সেখান থেকে বাড়ি গিয়ে কবির মন বসতো না। অজানা শূন্যতায় কবির মন হাহাকার করে উঠতো। এই আধ্যাত্মিক সাধক হাফেজ মোনায়েম পাগলার নিকট তাসাউফের ছবক প্রথম গ্রহণ করেন। লালনের ভাব সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে তাঁর গান গাওয়া শুরু হয়। তিনি কবিকে ভাব সঙ্গীত রচনার ‘জজবা’ (ঐশী

আবেগ) তৈরী করে দেন। কবি দীর্ঘ নয় বছর মোনায়েম পাগলার ছোহবত লাভ করে আধ্যাত্মিক সঙ্গীত রচনা করেন।

অচিন পাখি ধরবি যদি, দমের সাধন কর,
দেহের মাঝে আট কুঠরা, দেখো মহল থরেথর ॥
১. হাওয়াতে যে উঠে বসে চুপ করে রয় কালাবেশে
কালাকে সাধলে বাঁচবি শেষে, বুঝো কেবা আপন কেবা পর ॥
২. মণিপুর হয় মদন জ্বালা, হয়রে মুর্শিদ, রূপের খেলা
খেল্লে দেখবি নূরের আলা, যমে তোরে করবে পর ॥
৩. বুঝে দেখো ভাবের ঘরে এই দমেতে যে উঠে পড়ে,
আলেফ হে আর মিম দালেতে রূপের গুণ দেখায় তার ॥
৪. যে ডুবেছে এই রূপের শানে, অন্যকথা আর কি মানে,
মহসিন কয় এই ভুবনে, দমের ধারা বুঝা ভার ॥[২৫]

এ সব বাণী বিশ্লেষণ করলে মহসিন চিশতিকে বাংলাদেশের দেহতত্ত্ববিদ, আত্মতত্ত্ব সাধক ও খাঁটি দার্শনিক বলেই জানা যায়। সাধক মহসিন চিশতি এভাবে আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব বা 'নিজেকে জানা'-র উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এবং অচিন পাখিকে ধরার জন্য দমের সাধনার কথা ব্যক্ত করেছেন।

কবি গায়ক হিসাবেও তিনি বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন। বাউল সম্রাট লালন শাহ্, দুদ্দু শাহ, পাঞ্জু শাহ, পাগলা কানাই, হাছন রাজা ও নিজের লেখা ভাব সঙ্গীত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গেয়ে বেড়িয়েছেন। যাদের সাথে তিনি গান গেয়েছেন তাঁরা হলেন– পুঠিয়া থানার গোবিন্দ পাগলা, ফরিদ উদ্দিন ওরফে মংলা ফকির, নাটোর জেলার দীঘার তছির উদ্দিন আহমেদ, লালপুর থানার ওয়ালিয়া গ্রামের আবদুর রাজ্জাক, বাঘা থানার মনিগ্রামের ডাঃ নূরুজ্জামান ভাণ্ডারী।

সমাজ সচেতন কবি খুন, হত্যা, অবিচারের কথা লিখলেন তাঁর গানে। টাকার লোভে পুলিশের নিরবতা, পরীক্ষার হলে ছাত্র-ছাত্রীদের নকলের প্রবণতা প্রভৃতি বিষয় তাঁর গানের আলোচ্য বিষয় হয়েছে। বাঘা থানা সদর থেকে ৭ কি.মি. পশ্চিমে আলাইপুর গ্রামে একই দিনে একই পরিবারের ৩জন খুন হয়েছিল, সে বিষয় নিয়ে কবি লিখলেন একটি গান।

কি আইন আসিল ভাই সোনার বাংলাতে,
খুন করিয়া মানুষ বাঁচে ছিলনা ভাই পূর্বেতে।

১. আলাইপুর ঘটনা ঘটে, মাডার তিনজন একসাথে,
পুলিশেরা দিনের বেলায় অভিনয় করে আসামী খুঁজে,
রাতের বেলায় তাদের সাথে যুক্তি করে ॥

২. একি প্রথা দেখি হায় কলেজ প্রাঙ্গণে,
ছেলে মেয়ে জোড়ায় জোড়ায় গল্প করে
ক্লাসের ঘণ্টা পড়লে ভ্রুক্ষেপ নাহি করে,
পরীক্ষা আসিলে নকল প্রথা ধরে ॥[২৬]

১৯৯০ সনে কবি তাঁর গানের সহকর্মী শাহাবাজ কে সাথে নিয়ে গেলেন কুষ্টিয়া জেলার উদিবাড়ী গ্রামের আধ্যাত্মিক সাধক শাহ্সুফি মৌঃ মোঃ মনসুর রহমান আল্ চিশতি নিজামির নিকট। তিনি কবির চোখমুখ দেখে কিছু আধ্যাত্মিক প্রশ্ন করেছিলেন। কবি প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন খুব সন্তোষজনক। তিনি সে দিন কবিকে বললেন "তোমার মধ্যে যে তাসাউফের জ্ঞান আছে তা নষ্ট করোনা"। সেই দিন কবি তাঁর নিকট হাতে হাত দিয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। পীর সাহেব শাহবাজকে দেখিয়ে বললেন—এ আমার পুরাতন শিষ্য, একে খেয়াল করলেই আমাকে খেয়াল করা হবে। এই শাহবাজের বাড়ি নাটোর জেলার লালপুর থানার সাদুপাড়া গ্রামে।

কবির পিতা ইসমাইল হোসেন প্রথম বিবাহ করার পর তাঁর স্ত্রী মারা যায়। দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান যথাক্রমে মোসাঃ আনোয়ারা, মোসাঃ বাইজান, মোঃ মোসলেম উদ্দিন। কবির পিতা পুনরায় বিয়ে করেন মোসাঃ খাতুন নেছাকে। এই খাতুন নেছার একমাত্র সন্তান মহসিন চিশতি। ১৯৭৮ সনে বলিহার গ্রামের আবদুল জব্বারের মেয়ে হাজেরার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। কবির সন্তান যথাক্রমে মর্জিনা, আর্জিনা, শিমা।

কবির গানের সংখ্যা প্রায় একশত। তাঁর গানে মানুষকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা হয়েছে :

মানুষ ভজে হও পবিত্র, ঠিক রাখিয়া জ্ঞান নয়ন,
ভজ মানুষের চরণ
মানুষতত্ত্ব না জানিলে সাধন ভজন অকারণ।[২৭]

মহসিন চিশতির জীবনটাই গানের আবহমণ্ডিত। তাঁর সর্বক্ষণের কথায় গানের রেশ পাওয়া যায়। তিনি সুরসিক এবং সুরস্রষ্টা। অভাব দৈন্যের মাঝেও তাঁর মধ্যে আছে একটি আনন্দময় চেতনা। কথার সঙ্গে কথা মিলিয়ে গানে গানে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে তাঁর সময় কাটে। তাঁর গানে কোন শৈল্পিক প্রসাধন নেই, আছে যা কিছু সত্য তারই উপস্থাপন।[২৮]

৬. হযরত খাজা খোরশেদ আলী চিশতি

লোককবি হযরত খাজা খোরশেদ আলী চিশতি ওরফে মুর্শিদ আলীর (১৩০৮-১৩৮৮) আবাস ভূমি ও সমাধি রাজশাহী জেলার বাঘা থানার চকছাতারী গ্রামে। এই বাড়িতে বসবাস করছেন তাঁর ঔরশজাত সন্তানেরা। তিনি একজন পীর ও আধ্যাত্মিক সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন। তাঁর সঙ্গীতের সংখ্যা তিনশ।

কবির জন্ম ১৩০৮ সনে নাটোর জেলার বাগাতীপারা থানার মজমপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মোঃ জয়নাল আবেদীন ও মাতার নাম ওজিমন। কবি মাতৃগর্ভে যখন ৫ মাসের, তখন তাঁর পিতা মোঃ জয়নাল আবেদীন মারা যান। ভূমিষ্ট হওয়ার সাত দিন পর তার মাতা আমেনা খাতুন মৃত্যুবরণ করেন। তখন সাতদিনের সন্তানকে বাবার বাড়ি মজমপুর গ্রাম থেকে নিয়ে আসা হয় মামার বাড়ি লালপুর থানার আড়বাব গ্রামে। মামীর স্তনের দুগ্ধপান করে, মামা মামীর স্নেহে তিনি বড় হয়েছেন। কবির সন্তান মকবুল হোসেন কবির জীবনী সংক্রান্ত সঙ্গীতে বলেছেন–

জন্ম তাঁহার মজমপুরেতে, হযরত জয়নাল আবেদীনের পৃষ্ঠ হতে,
আড়বাব হতে লালন-পালন, দয়াল মামীর ঘরে যায় জানা।[২৯]

কবি আড়বাব প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এবং আড়বাব উচ্চ বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। আর্থিক দৈন্যের কারণে কবির পড়া লেখা বন্ধ হয়ে যায়। কবি জীবন জীবিকার জন্য মাঠে কৃষি কাজ করেছেন। আম ও খেজুরের গুড়ের ব্যবসা করেছেন, স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। এক সময় তিনি পুলিশের চাকরী করেছেন।

কবি বিশ বছর বয়সে হযরত খাজা জিয়াউদ্দিন চিশতি (রহঃ) এর নিকট বয়াত হন। তাঁর বাড়ি ও সমাধি পাঞ্জাবের কাহেলী অঞ্চলে। পূর্ববাংলায় তাঁর অনেক ভক্ত ও মুরিদ ছিল। কবি খোরশেদ আলী তাঁর মুর্শিদের কথায় পুলিশের চাকরী ছেড়ে দিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হন। পাঞ্জাবের হুজুর কবিকে বলেছিলেন- 'তুম চাক্‌রী ছোড় দো, আল্লা মে পাত্তা মিলাও, দেখহো দুনিয়াভী তোমহারা পিছ দৌড় দে'। অর্থাৎ তুমি চাকরী ছেড়ে দাও, আল্লার সাথে সংযোগ স্থাপন কর, দুনিয়ার সবকিছু তোমার পিছনে দৌড়াবে। কবির জীবনে সেই সফলতা একদিন এসেছিল।

কবি ছিলেন বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। ১৩৫৫ বাংলা সনে মুর্শিদের পছন্দমত, বাঘা থানার কলিগ্রাম নিবাসী ফকির আলীর মেয়ে আমেনা এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। ফকির আলীও ছিলেন মুর্শিদ কেবলার একজন ভক্ত। বিয়ের পর তিনি কিছু দিন শ্বশুর বাড়ি ছিলেন। ১৩৬৯ সনে চকছাতারী গ্রামে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। 'চিস্তিয়া মঞ্জিল' নামের বাড়িতে তাঁর সন্তানেরা বসবাস করছেন। তাঁর ৫ ছেলে ও ২ মেয়ে, যথাক্রমে জুলেখা বেগম, আহসান আলী চিশতি (১৯২৭-২০০২), মোবারক হোসেন চিশতি (১৯২৩-১৯৮৫), কাচু হোসেন চিশতি, মোকবুল হোসেন চিশতি (১৯৩৫-২০০৫), নূরুল হুদা চিশতি (১৯৪৩), মোসাঃ জহুরা বেগম (১৯৪০)।

মরমি কবি খোরশেদ আলী আধ্যাত্মিক সাধনা করতে যেয়ে এক রহস্যময় জগতে নিরঞ্জনের সন্ধান পেয়েছেন। কবি বলেন–

কাজলা দিঘির জলে নীল পদ্ম ফুটে
শতদল সহস্র দলে রূপের দুলাল দুলে
তারে দেখতে গেলে নিরবধি সরল হয়ে থাকতে হয়
কালিমী রূপের বাজার আলীশা দরজা তাহার
সেই দরজায় নজর দিলে দেখা যায় বাহার
আপন বেশে মুর্শিদ বসে নিরঞ্জনী কিরণ দেয় ॥[৩০]

কবি মুর্শিদের দেওয়া সবক অনুযায়ী সাধনা করতে যেয়ে মুর্শিদের মাঝেই নিরঞ্জন বা সৃষ্টিকর্তার নূরের জ্যোতি লক্ষ্য করেছেন। কবি আজীবন সঙ্গীত সাধনা করেছেন। এদেশে তাঁর অগণিত ভক্ত মুরিদ রয়েছে। তিনি শিষ্যদের জন্য উপহার স্বরূপ রেখে গেছেন ৩০০ টি মরমি সঙ্গীত।

খাজা খোরশেদ আলী চিশতি রুহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞা দাতা সুফি সাধক। তিনি একজন সত্যের সৈনিক। একজন আদর্শ মানুষ হিসাবে তাঁর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। সত্য, ন্যায় ও স্পষ্টবাদীর কারণে অধিকাংশ মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করত। কেউ কেউ বুঝতে না পেরে তার শত্রুতা করেছে। পরে অনেকের ভুল ভেঙেছে, তাঁর সাহচর্যে এসেছে। একদিকে ছিল তাঁর রুহানী শক্তির প্রভাব অপরদিকে মানুষের প্রতি ভালবাসা, সর্বোপরি আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান করার অপূর্ব কৌশল ছিল তাঁর। এই সব মহৎ গুণের অধিকারী বলেই তিনি সব বাধা উপেক্ষা করে তাঁর গুরুর বাণী প্রচারে সফল হয়েছেন। চরিত্রবলই ছিল তাঁর এক মহাশক্তি। সেই পবিত্র গুণেই মানুষ তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক তত্ত্বে এবং মারেফাতের পথে দীক্ষা গ্রহণ করেছে। মুসলমান ও অমুসলমান

নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করে নিজেদের জীবন ধন্য ও সার্থক করেছেন। তিনি অনেক দুঃখ, কষ্ট, অত্যাচার সহ্য করে ইসলামের গূঢ় রহস্য ও মূলমন্ত্র প্রচার করেছেন। তিনি মনে করতেন মানুষের সেবার মাঝে ভালবাসার মাঝেই রয়েছে আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি।

আল্লাহর নৈকট্য ও রাসূলের প্রেম লাভই ছিল তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দয়া, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, উদারতা এবং বাৎসল্য গুণে তাঁর অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। কোন গোঁড়ামি ছিলনা তাঁর ভিতরে। খুব সাদা সিধে জীবন যাপন করতেন তিনি। পোশাক পরিচ্ছদে তাঁর কোনরূপ জাঁকজমক ছিল না। তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে কড়া নজর ছিল। আল্লাহ ও রাসূলের প্রেম সম্বলিত গান খোরশেদ চিশতির প্রিয় ছিল। তাঁর নিজের লেখা গানগুলো খুব আবেগ দিয়ে দরদের সাথে গাইতেন। তিনি বলেছেন–গান, গজল, কাওয়ালী জায়েজ। তবে শর্ত হলো গানের সাথে কোন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা যাবেনা। গানের মাধ্যমে জেকের ভাল হয়। তাঁর ভক্ত মুরিদেরা বার্ষিক ওরশ ও মজমায় খোরশেদ আলী চিশতির গান করেন। অন্যকোন মহতের সঙ্গীত তাঁরা গান না।[৩১]

কবির শিক্ষার মূল তত্ত্ব হলো তাসাউফ। পীর কামেলের সংশ্রবে অবস্থান করে তিনি মারেফাতের গভীর জ্ঞান লাভ করেছিলেন। সেই সাথে কঠোর সাধনা দ্বারা সেই অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায়, তিনি তাঁর মুর্শিদের সহবতে থেকে সুলতানুল আউলিয়া হতে পেরেছিলেন।

৭. মোঃ আব্দুল আলিম ফকির

মোঃ আব্দুল আলিম ফকির একজন পল্লীকবি। সচরাচর পল্লীর মানুষের হৃদয়ের আকুতি, প্রেম বিরহই তাঁর লেখায় প্রকাশ। শেষ জীবনে এসে তাঁর লেখায় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। যা নিগুঢ় তত্ত্বে ভরা, দেহ বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ। যেমন—

হাড়ের খাঁচায় অচিন পাখি
সদায় থাকে বিদ্যমান
মন মহাজন চিনলি না সে অমূল্য রতন।
হিংসা ভরা হৃদয় নিয়ে
মানুষরূপী যারা দেল চক্ষু
অন্ধ করে ঘুরে বেড়ায় তারা,
সেই অন্ধকারে জ্বলবে আলো
করিলে সাধন ভজন।[৩২]

আলিম ফকিরের তত্ত্বমূলক গানে, তার মর্মকথা, বাউল সম্প্রদায়ের সাধন ভজন রূপকের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া ভজন সাধন বাউল সঙ্গীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে লক্ষ্য করা যায়। ভজন সাধনের মূল বিষয় দেহকে কেন্দ্র করে। অস্তিত্বের মধ্যে রহস্য উদ্ধারই হলো ভজন সাধনের মূল লক্ষ্য।

আধ্যাত্মিক সাধক কবি মোঃ আব্দুল আলিম ফকির ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসের ১লা তারিখে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন রাজশাহী জেলার তানোর থানার চান্দুড়িয়া ইউনিয়নের জুড়ান পুর গ্রামে। তার বাবার নাম মোঃ কসিমুদ্দিন ফকির, মায়ের নাম ময়মন বিবি, দাদার নাম নসিরুদ্দিন। ন'হাটা ইউনিয়নের দুয়ারী মাদ্রাসায় তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। সেখানে ছয় বছর লেখা পড়া করে তিনি চলে আসেন মোহনপুর থানার সাঁকোয়া মাদ্রাসায়। সেখানে অধ্যায়ন করেন চার বছর। মাদ্রাসা লাইনে অষ্টম শ্রেণীতে পড়াকালীন তার ওস্তাদ আবদুল মান্নানের সঙ্গে রাজশাহী বেতারে কণ্ঠ শিল্পী হিসাবে অডিশন দেন। সে অডিশনে তিনি রাজশাহী বেতারের সহকারী শিল্পী হিসাবে নির্বাচিত হন। তিনি রাজশাহীর ওস্তাদ হরিপদ দাসের নিকট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখতে থাকেন, এবং দর্গাপাড়ার আবদুল জব্বারের নিকট আধুনিক গান, নজরুল গীতি ও দেশাত্ববোধক গানের চর্চা করেন। এর কয়েক বছর পর তিনি রাজশাহী জেলা আনছার এডজুটেন্ট এ. কে. এম আবদুল

আজিজের নিকট পল্লীগীতি, মুর্শিদী, ভাওইয়া গান শেখেন। এবং পাবনার সঙ্গীত শিল্পী আবদুল মান্নানের নিকট শেখেন জারী, সারি ও বাউল সঙ্গীত।

আলিম ফকিরের পিতা কসিমুদ্দিন ফকিরের ৮ সন্তান ছিল, যথাক্রমে সুকজান, রূপজান, ফুলজান, সোনাভান, জয়গোন, নেছামন, আনিছুর ও আলিম ফকির। ১৯৫৮ সালে আবদুল আলিম ফকিরের তানোর থানার সিলিম পুর (হাড়দহ) গ্রামের কেফাতুলা সরদারের মেয়ে জরিনা (১৯৪৩) এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। পাঁচ বছর পর তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। জরিনার একমাত্র সন্তান ফেরদৌসী (১৯৬৯)। ১৯৭২ সালে রাজশাহী জেলার বালিয়া পুকুর গ্রামের আমিনুদ্দিন শেখের মেয়ে রাকেমা ওরফে হাবিবার (১৯৫৮) সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়। হাবিবার সন্তান দশ জন, যথাক্রমে হাসনাহেনা, সুফিয়া পারভীন, ফাতেমা, আবুল কাশেম, সেলিনা আলিম, শাহানা, শিরিনা ওরফে হাসিনা, আসমা আলিম, আমিনুর রহমান ও মৌসুমী। এবং ১৮৮২ সনে পবা থানার ধরমপুর গ্রামের সাইরত মণ্ডলের মেয়ে বেড়াছন এর সাথে আলিম ফকিরের তৃতীয় বিয়ে হয়। দুই বছর পর তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। বেড়াছন এর দুই সন্তান। প্রথম সন্তান আবদুল হালিম, দ্বিতীয় সমিরোন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হাবিবাকে নিয়ে এখন সংসার করছেন।

গ্রামের সাধারণ মানুষের দুঃখ বেদনা, প্রেম, বিরহ ও দারিদ্র্য, অসহায় মানুষের মানবেতর জীবন যাপন দেখে তার মনে বেদনা জেগে ওঠে। আলিম উদ্দিন ফকিরের জন্ম ভূমি জুড়ানপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী 'বড় বিলাকর্ণহাড়' বিলে বরেন্দ্র এলাকার পানি এসে ধান ডুবিয়ে দিত। এমন কি বাড়ি-ঘরও অনেক সময় ডুবে যেত। কৃষকেরা অল্পস্বল্প ধান পেলেও ধানের দাম পেতনা। বছরের পর বছর ধান বিনষ্ট হওয়ায় সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন মাঠের শাপলা শালুক ও শালুকের ভ্যাট খেয়ে এখানকার অধিকাংশ মানুষ জীবন যাপন করত।

ধান না হওয়ার কারণে কৃষকেরা তাদের পেশায় নিরাশ হয়ে মাছ ধরে বিক্রি করে সংসার চালাত। কৃষকদের এই দুরবস্থা যুগের পর যুগ চলতে থাকে। এক পর্যায়ে চাষী রহিম বক্স এলাকার গণ্যমান্য লোকজনদের নিয়ে বাঁধ কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটিতে কবি আবদুল আলিম ফকির সাংস্কৃতিক সম্পাদক মনোনীত হন। এবং বিলের উপর বাঁধ দেওয়া প্রসঙ্গে গান রচনা করেন। এটাই তার লেখা প্রথম গান।[৩৩]

বড়বিলা কর্ণহাড় বিলে ফলাও ফসল দ্বিগুণ
স্বনির্ভর হও বাংলার জনগণ ॥
চাষী রহিম ভাইয়ের কথা শুনেন যত আছেন শ্রোতা
কলে কৌশলে করছেন হেথায় নানান রকম প্রথা
তাহার কথামত, আমরা চাষী যত করি বাঁধের আন্দোলন
স্বণির্ভর হও বাংলার জনগণ ॥
আলিম ফকির লিখে জারী আল্লা নবী স্মরণ করি।[৩৪]

১৯৬৯ সালে রাজশাহী জেলার তানোর এলাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান এক রাজনৈতিক জনসভা করেন। তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন এ.এইচ. এম কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী। সেই জনসভায় তাৎক্ষণিক ভাবে তিনি একটি গান লিখে সুর করে গেয়েছিলেন।

আমরা ক'জন নবীন মাঝি দিয়া মজিবের নায়ে পাল
শক্ত হাতে ধরব পাড়ি সামাল-সামাল সামাল-সামাল।[৩৫]

সেই জনসভায় তার গান শুনে সবাই মুগ্ধ হয়েছিলেন। এবং তারা কবিকে আশ্বাস দেন যে আমাদের পায়ের নিচের মাটি শক্ত হলে আপনাকে জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে কবিকে সে মর্যাদা দেওয়া হয়নি।

সে সময় কবি অত্যন্ত আর্থিক দীনতায় ভুগছিলেন। নিরুপায় হয়ে কবি জুড়ানপুর থেকে বায়া তানোর রাস্তার পাশে বাগধানীতে চায়ের দোকান দেন। চায়ের দোকানে অনেক মানুষের ভিড় হয়। গরম চা তাদের হাতে তুলে দিয়ে তিনি নিজের লেখা গান গাইতে থাকেন। অল্প দিনের মধ্যেই তার কবি পরিচিতি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এলাকায় কোন বিয়ে হলে লোকজন তাকে এসে বলত, আমার বন্ধুর বিয়ে একটি গান লিখতে হবে এবং গাইতে হবে। এভাবে তিনি বাগধানী এলাকায় কবি হিসাবে সবার প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন।

১৯৭৮ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তানোরে আগমন করেন। তাঁর আগমনের কয়েক দিন পূর্বে আলিম ফকিরের চায়ের স্টলে তানোর থানাউন্নয়ন অফিসার বলেন যে, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তানোরে আগমন করবেন, সে জনসভায় গাওয়ার জন্য আপনি রাজশাহীর উন্নয়ন ও দাবী সম্বলিত একটি গান লিখবেন এবং গাইবেন। সে রাত্রেই তিনি লিখলেন:

রাজশাহী বাসীদের ভাগ্য আমরা ফিরে চাই ভাই,
রাজশাহী বাসীদের ভাগ্য আমরা ফিরে চাই।
রাজা বাদশার দেশ এটা রাজশাহী ভাই,
একটি বেতার কেন্দ্র তবু ভাল কেন না হয়।
সময় সময় বিদ্যুৎ থাকে না
টুটু শব্দে শোনা যায় না
১০০ কিলোমিটারের ট্যানেস মিটার চাই ॥

রাজশাহীর যত রাস্তা সব পাকা চাই,
তার মধ্যে তানোর-বায়া রাস্তা আগে চাই।
গরুর গাড়ি রিক্সা টম্‌টম্‌ চলতে পারেনা,
দুই একদিন চললে গাড়ির ধুরে থাকে না।[৩৬]

গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার নানাবিধ সমস্যা নিখুঁতভাবে তাঁর গানে তুলে ধরেছেন। তাঁর এই দীর্ঘ গানের মাঝামাঝিতে তিনি লিখেছেন –

রাস্তা ভাঙ্গা চলা যায় না বিজলীবাতি তাও থাকে না
অন্ধকারে চলতে গিয়ে পা ভাঙ্গিয়া যায়
গরীবের আর্তনাদ আজ তোমাকে জানাই ॥
জিয়া ভাইয়ের কাছে আর একটা দাবী চাই,
রাজশাহীতে কলকারখানা আমরা আরো চাই।[৩৭]

১৯৭২ সালে আলিম ফকির রাজশাহী বেতার কেন্দ্রে কণ্ঠস্বর পরীক্ষা দিয়ে পল্লী গীতির 'ক' শ্রেণীর শিল্পী হিসাবে নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সালের শেষের দিকে রাজশাহী বেতারে জারীগানের কণ্ঠস্বর পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। সেই থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ বেতারের রাজশাহী কেন্দ্রে নিয়মিত গান করে চলেছেন। ১৯৮৪ সালে তিনি নিজের লেখা বিভিন্ন প্রকারের ২৫টি গান রাজশাহী কেন্দ্রে জমা দিয়ে গীতিকারের স্বীকৃতি পান।

১৯৮৩ সালে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে তার পৈতৃক নিবাসসহ মোট ১২৫টি ঘর পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। তাতে জুড়ান পুর গ্রামের মনিরুদ্দিনের ৫ বছরের পুত্র বোরজাহান আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই অগ্নিকাণ্ডে আলিম ফকিরের প্রায় পঁচশ গানের পাণ্ডুলিপি পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। এতে তিনি অত্যন্ত মনক্ষুণ্ন হয়ে পড়েন। ঘরবাড়ি সব কিছু হারিয়ে কবি সে দিন অন্যান্য লোকজনের সাথে খোলা আকাশের নিচে গাছ তলার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

কবি আবদুল আলিম ফকির মনের ও ধর্মের টানে পীরের গান গেয়েছেন। অত্যন্ত প্রাণখোলা এই মানুষ। পেশায় কৃষক নেশায় গায়ক। অভাবতাড়িত তার সংসার কিন্তু তার বাড়িতে গিয়ে দেখা গেছে কোথাও এতটুকু হাহুতাশ নেই। ছেলে মেয়েরাও শিল্পী হয়ে উঠেছে। এটা যে তাদের রক্তে মিশে আছে। বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। শিল্পী নিজে সবসময় ফকিরীবেশে চলাফেরা করেন এবং পাক পবিত্র থাকেন। এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ কাজা করাতো দূরের কথা ১৪/১৫ বছর ধরে তাহাজ্জুদ নামাজ একদিনের তরেও ছাড়েননি। ধর্মের প্রতি যেমন তাঁর প্রগাঢ় নিষ্ঠা, গান-বাজনার প্রতিও তেমনি রয়েছে দুর্বলতা। তিনি একদিল পীরের গান ছাড়াও অন্য ধারার গানও করেন। এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত উদার বাছ-বিচার করেন না।

কবির স্মৃতিশক্তিও প্রখর। তিনি তাঁর চার পুরুষের ইতিহাস বললেন। তাঁদের প্রথম পুরুষ অর্থাৎ কবির পরদাদা তজির উদ্দীন মণ্ডল। তিনি সরাসরি একদিল পীরের মুরিদ ছিলেন। একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে তাঁর বংশের সবাই প্রায় শতবর্ষজীবী এবং এক সন্তানের জনক। যাইহোক তজির উদ্দীন মণ্ডলের জন্মস্থান রাজশাহীর মোহনপুর থানার নন্দন হাট গ্রামে। খুব সম্ভব একদিল পীর এখানে কিছুদিনের জন্য আস্তানা গাড়েন। কেননা একদিল পীরের অবস্থান এখন অনেক জায়গাতেই পাওয়া যাচ্ছে। যেমন জয়পুরহাটের ক্ষেতলালে খোঁজ পাওয়া গেছে। তেমনি মোহনপুরেও একটি পীরের পীঠস্থান ছিল। পীঠস্থানের চিহ্ন এখন আর নেই কিন্তু একটি নিদর্শন এখনও টিকে আছে তাহল "একদিল তালা" নামে মোহনপুরে একটি হাট এখনও বসে। এই তজির উদ্দিন মণ্ডল একদিল পীরের ভীষণ ভক্ত ছিলেন এবং সুকণ্ঠের অধিকারী। তাই পীরের নির্দেশে ইসলাম ধর্মের প্রসারের জন্য গান বাঁধতেন এবং গাইতেন। তবে বেশির ভাগ সময়ে গানগুলো পুঁথির সুরে পাঠ করা হত। সে সময় কলেরা মহামারী রূপে দেখা দেওয়ায় তাঁর ছেলে নসির উদ্দীন ফকির মোহনপুর থানার জুড়ান পুরে চলে আসেন। ঐ মহামারীতে তাঁর পিতা মারা যান। নসির উদ্দীন ফকির ও তাঁর বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এবং মণ্ডল থেকে ফকির উপাধিতে রূপান্তরিত হন। তাঁর ছেলে অর্থাৎ কবির বাবা কসিম উদ্দীন ফকির একদিল পীরের ভক্ত হয়ে যান। তিনি ১১৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় রাজশাহীর তানোর, পবা, মোহনপুর, দুর্গাপুর, বাগমারা প্রভৃতি থানায় এ গান জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আলিম ফকির এই এক দিল পীরকে নিয়ে দীর্ঘ গান লিখেছেন :

রাজশাহী তানোর পবা অনেক এলাকাতে
একদিল ফকিরের কথা শুনে লোকের মুখে
সেই সব শুনে আলীম ফকির লিখে এই কাহিনী
এইবারে ইসলাম প্রচার করে পীর মহামনী।[৩৮]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

কান্দে শাহ আল্লারো দরবারেতে
হায়গো আল্লাহ বারীতালা এ ছিল কপালেরে
কান্দে শাহা আল্লারো দরবারেতে
তারপরে শাহা তখন বনে গেল চলে
দশ মাস পরে সন্তান হইল তাহার ঘরে।[৩৯]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

কবি আলিম ফকির একদিল পীর সম্পর্কে তাঁর বাবার নিকট বিভিন্ন এলাকার মানুষের কাছ থেকে যা শুনেছেন তাই তিনি গানে লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে তাঁদের পূর্বপুরুষের লেখা কোন খাতা পত্র এখন তাঁদের কাছে নেই। একাত্তরের মুক্তি যুদ্ধে সব বিলীন হয়েগেছে। যাই হোক তিনি সংক্ষেপে তাঁর গানে যা বলেছেন তার মর্ম হল: একদিল পীর ছিলেন একজন উচুঁমানের কামেল পীর। বিখ্যাত সুফি সাধক শাহ মখদুম রূপোসের রাজশাহীতে ধর্ম বিস্তারের পর একদিল পীরের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের ধারণানুযায়ী আরব দেশের কেনান শহর থেকে তিনি এখানে এসেছিলেন। সেখানে বাস করতো শাহনীল বাদশা। পরে পীর বলে অভিহিত হন তিনি। এই শাহনীল বাদশা ছিলেন নিঃসন্তান। কেউ তার মুখদর্শন করতে চাইতোনা। শেষে এক দরবেশের পরামর্শে ও দোয়ায় তিনি তাঁর বেগম আশেক নূরীকে নিয়ে বাংলার মাটিতে চলে আসেন। কেননা সেই দরবেশ বলেছিল তুমি যদি বারটি বছর অজানা বিভূঁয়ে কোন দেশে আল্লার সাধনায় নিয়োজিত থাক তাহলে তুমি সন্তানের মুখ দেখতে পাবে এবং সেই ছেলে আল্লাহওয়ালা হবেন। তাঁদের সুপুত্র হলেন আলিম ফকিরের গানের আলোচ্য ব্যক্তি একদিল পীর।

কবি ১৬ বছর বয়সে পবা থানার দুয়ারী মাদ্রাসার পীর মাওলানা আহম্মদ আলীর নিকট বায়াত হন। আহম্মদ আলীর ওস্তাদ ছিলেন তার নিজের বাবা মাওলানা আকরাম আলী খান। আকরাম আলী খান বাগদাদ থেকে ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে এদেশে এসেছিলেন। সেখানে তিনি একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। আবদুল আলিম ফকির তাঁদেরই অনুসরণ করে শরীয়তের সকল বিধান মেনে সুন্দর জীবন যাপন করছেন। সঙ্গীতের সাধনায় সব সময় মশগুল আছেন।[৪০]

৮. হযরত খাজা শাহ্ খলিলুর রহমান চিশতি

যাঁদের জ্ঞান সাধানায় ধুলার ধরণী সমৃদ্ধ এবং মাটির মানুষ মহিমান্বিত হয়েছেন, যাঁরা জ্ঞান সাধনায় সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করেন, তাঁরা দেশকাল, জাতি, ধর্মের গণ্ডির বহু উর্ধ্বে। মানুষ মাত্রেই তাঁদের আপনজন ভেবে গর্ব অনুভব করে। বিশিষ্ট মরমি কবি, জ্ঞান তাপস, আত্মতত্ত্ব জ্ঞানী সুফি সাধক হযরত খাজা শাহ্ খলিলুর রহমান চিশতি ওরফে খলিল শাহ্ নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে একজন। কবির আবাসভূমি রাজশাহী শহরের লক্ষীপুরের ডায়াবেটিস ক্লিনিকের পশ্চিম পার্শ্বে। দীর্ঘ ৪৬ বছর যাবত তিনি স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করছেন। ১৯৪০ সালের ২৬ মার্চ দুর্গাপুর থানার জয়নগর ইউনিয়নের দাওকান্দি গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সিরাজ উদ্দিন শাহ এবং মাতার নাম আয়রন নেছা। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে কবির জন্ম।

কবির পিতা সিরাজ উদ্দিন শাহ্ একজন শিক্ষিত বিদ্যোৎসাহী হিসেবে অত্র এলাকায় সর্বজনবিদিত সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দানশীল ও জনদরদী ছিলেন। তার দেওয়া জমিতে প্রতিষ্ঠিত আছে দাওকান্দি ডিগ্রী মহাবিদ্যালয় এবং হেলথ কমপ্লেক্স আজও সে সব বংশীয় মর্যাদা ও বদন্যতার স্মৃতি বহন করছে। কবির দুই বছর বয়সে মাতা আয়রন নেছা কলেরা রোগে মারা যান। কবি পিতার স্নেহে লালিত পালিত হন। তিনি দাউকান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ৫ম শ্রেণী পাশ করেন। ১৯৫৯ সালে দাউকান্দি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস. এস. সি. পাশ করেন। তিনি ১৯৬২ সালে রাজশাহী সিটি কলেজ থেকে আই.এ এবং ১৯৬৫ সালে বি. এ. পাশ করেন।

জীবনে পড়াশুনার জন্য অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে তাঁকে। সংগ্রামী জীবনের কারণে ১৯৬২ সালেই তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সহকারী হিসাব রক্ষক' পদে চাকুরীতে যোগদান করেন। এবং ২০০৪ সালে উপ-রেজিস্ট্রার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

মরমি কবি খলিল শাহ-র সুফি তত্ত্ব দর্শনের অনুসারী হওয়ার পেছনে বাল্যকালের একটি ঘটনা কাজ করেছিল। তিনি যখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র তখন ক্লাশে মাওলানা স্যার সুরা এখলাস পড়াচ্ছিলেন। মাঝখানে তিনি শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করলেন, "হুজুর আল্লার পিতা কে?" এই প্রশ্ন শুনে মাওলানা সাহেব ক্ষেপে গিয়ে বেত্রাঘাত করেন। এই নিয়ে স্কুলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি

হয়। মাওলানা সাহেবের বক্তব্য হলো এটা শেরেকি কথা। তাই তাঁকে বেত্রাঘাত করা হয়েছে। অপর পক্ষে প্রধান শিক্ষকসহ সকল শিক্ষক একমত যে, ছাত্র প্রশ্ন করবে তার জবাব দিতে হবে এবং তাঁকে বুঝিয়ে দিতে হবে শিক্ষককেই। তা না করে তাঁকে কেন বেত্রাঘাত করা হলো ? এ নিয়ে স্কুলে গোলযোগ হয়। অবশেষে খলিল শাহ শিক্ষকের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন যেন তিনি আল্লাহর পরিচয় ও তার বাসস্থান কোথায় তা জানতে পারেন। এই ঘটনায় তাঁর জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। তাঁর অনুসন্ধানী মন, পিপাসিত হৃদয় ফকির ও দরবেশের পেছনে ঘুরতে থাকে এবং বিভিন্ন তরিকার সাধনায় নিয়োজিত হয়।

খলিল শাহ ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ফকির আব্দুস সোবহান এর সান্নিধ্যে গিয়ে রাজশাহীস্থ টিকাপাড়া গোরস্থানে প্রায় রাতেই মোরাকাবায় মশগুল থাকতেন। ১৯৬৭ সালে পীর সাহেবের সাথে সূরা রহমান এর ব্যাখ্যা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। অতঃপর পীর সাহেবের অনুমতি নিয়ে সেখান থেকে বিদায় নেন।

খলিল শাহ বিভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানী মানুষের অন্বেষণে ঘুরে বেড়িয়েছেন বহুদিন। বিভিন্ন ধারার সাধকগণের সংস্পর্শে গিয়ে তিনি তাঁদের ধর্মীয় তত্ত্ব জেনেছেন। এমনি করে তিনি হিন্দু ধর্ম, তান্ত্রিক সাধনা, বৈষ্ণব সাধনা এবং বাউল সাধনায় জ্ঞান লাভ করেন। পরিশেষে সুফি সাধনায় মনোনিবেশ করেন। এক পর্যায়ে গৃহ ত্যাগী একজন মুসলিম সাধকের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে কাটিয়েছেন। উক্ত সাধক পাগল বেশে রাজশাহী শহরে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি শহরের সবার কাছে 'হলদি বাবা' বলে পরিচিত। তিনি রাজশাহী শহরের রাণীনগর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁকে এলাকার লোকে 'সালেক মৌলভী' বলে ডাকতেন। হলদি বাবার সান্নিধ্যে গিয়ে, তাঁর কাছ থেকে খলিল শাহ সুফি সাধনার গভীর তত্ত্বকথা অর্জন করেন। 'ইলমে লাদুনী' বলে যে গোপন আত্মিক জ্ঞান আছে তা তিনি হাসিল করেন। এক পর্যায়ে তাঁকে মুরিদ করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু হলদি বাবা তাঁকে বলেন, "দেখ বাবা খলিল, আমি তোমাকে সুফি সাধনার জ্ঞান দিয়েছি। কিন্তু তোমাকে মুরিদ করতে পারব না। কারণ আমি একজন সংসারত্যাগী মানুষ। আমি যদি তোমাকে মুরিদ করি তাহলে তোমাকেও সংসারত্যাগী হতে হবে। তোমার বাড়ীর ছেলে মেয়েদের কি হবে? সুতরাং আমার পক্ষে বয়াত করা সম্ভব নয়।" হলদি বাবা কবিকে কুষ্টিয়া শহরের অনতিদূরে উদিবাড়ী গ্রামের পীর সাহেব হযরত খাজা শাহ সুফি মনছুর আলী আল চিশতি নিজামীর নিকট যাবার নির্দেশ

দিলেন। কবি নির্দেশ পেয়ে ১৯৬৮ সালে কুষ্টিয়ার সন্নিকটে উদিবাড়ী যান। ৩রা চৈত্র তারিখে পীর কেবলা সাহেবের দরবার শরীফে ওরশ মোবারক হচ্ছিল। খলিল শাহ্ সেখানে গিয়ে এক গাছের গোড়ায় বসে রইলেন। এক সময় পীর সাহেবের পক্ষ থেকে ডাক পড়লো। তিনি পীর সাহেবের সান্নিধ্যে গেলেন এবং এক নিরিবিলি কক্ষে বয়াত হলেন।

খলিল শাহ্ এর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে, তিনি সাধনা পথে গুরুর আদেশ খুবই নিষ্ঠার সাথে দ্বিধাহীন চিত্তে পালন করেন। তিনি পীর কেবলা মনছুর শাহ এর খুব কাছের মানুষ হতে পেরেছিলেন। পীর কেবলা তাঁকে ডাকা মাত্র তিনি সব কাজ ফেলে ছুটে যেতেন। অফিসের কাজ, সন্তান সন্ততির প্রতি দায়িত্ব পালনের চেয়েও পীরের আদেশ তাঁর কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কোন এক সময়ে কুষ্টিয়ার একদল মৌলানা হযরত খাজা শাহ্ সুফি মনছুর আলী আল চিশতির লেখা গ্রন্থের যথার্থ মর্ম অনুধাবন করতে না পেরে কুষ্টিয়া কোর্টে মামলা দায়ের করে। কুষ্টিয়া শহর মিছিল মিটিং এ তোলপাড় করে তোলে। পীর কেবলার অতি ঘনিষ্ঠ বলে যারা নিজেদেরকে জাহির করতো তারাও সেই দুর্যোগ মুহুর্তে মান ইজ্জতের কথা ভেবে নিরব হয়ে গেল। মনে হলো তাঁরা যেন আত্মগোপন করেছেন। সেই ক্রান্তিলগ্নে খলিল শাহ নিজের কথা না ভেবে মুর্শিদের মান মর্যাদা রক্ষার মানসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

কবি তাঁর গুরুর নিকট থেকে মানুষের আত্মসন্ধান ও সত্ত্বার সন্ধানের মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। আত্মার অতল তলে ডুবে গেছেন সাধনার মাধ্যমে। রূপ সাগরে ডুব দিয়েই অপরূপের মাঝে রয়েছেন তিনি। কবি বলেন –

ত্রি মোহনায় তীক্ষ্ণ তুফান,
কুটা পড়লে অমনি তিনখান
ক্ষণপ্রভা নয় তার সমান
অতি উজ্জ্বল চাঁদ হতে।[৪১]

মানুষের মাঝে রুহ সুপ্ত অবস্থায় লুকিয়ে আছে। এই রুহকে জাগিয়ে তোলার কৌশল জানতে পারলেই আল্লাহর ওলী হওয়া যায়। এ জন্য আগে প্রয়োজন নিজেকে চেনা। যা মানুষের চিন্তা চেতনা আর কর্মকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। কবি বলেন মানুষের গোটা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে এই নিজেকে চেনার বিষয়টি। 'আমি কে?' এই প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করে মানুষের গোটা

জীবন। নিজেকে চিনতে ভুল হলে আসে বিভ্রান্তি। আর বিভ্রান্তি তার দৃষ্টি শক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। অনেক বন্ধনে জড়িয়ে ফেলে তাকে। এই বন্ধন থেকে মুক্তি নেই। তাইতো মানুষ কিয়ামতের অধীন। তবে বন্ধন মুক্তির একটা উপায় হলো 'নিজেকে চিনতে পারা'। সঠিকভাবে চেনার ব্যাপারটা বড়ই কঠিন কাজ। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান দিয়ে নিজেকে যথার্থভাবে চেনা যায় না। এই জন্য চাই অতীন্দ্রিয় জগতের জ্ঞান। আর সেই জ্ঞান নির্ভেজাল, অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে আল কোরানে, তৌহিদের জ্যোতিতে হৃদয়কে জ্যোতির্ময় করতে হবে। তাহলেই সে হবে চিরমুক্ত চির স্বাধীন। মনছুর হাল্লাজের মত 'আনাল হক' বলবার অধিকার তিনি লাভ করবেন। তিনি আল্লাহর ওলীদের দলে গিয়ে মিশে যাবেন। তাঁর জীবন হবে সার্থক।[৪২]

পরিশেষে বলা যায় যে, পারিবাকিভাবে ফকিরী প্রভাব এবং চারিত্রিকভাবে সাধনার প্রবণতায় খলিলুর রহমান চিশতি একজন সুফিসাধক হিসেবে কামিয়াবি হবেন বলেই মনে হয়।

৯. মোঃ আজগর আলী ভাণ্ডারী

আধ্যাত্মিক সাধক মোঃ আজগর আলী ভাণ্ডারী রাজশাহী জেলার শাহ মখদুম থানার (সমপুরা) বড় বনগ্রামের পাঁচ আনী পাড়ায় ২৯শে অক্টোবর ১৯৫৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জাফর আলী। তিনি এক নিম্নমধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্মেছিলেন।

তিনি মুশরইল প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ৫ম শ্রেণী পাস করেন। রাজশাহী স্যাটালাইট টাউন হাইস্কুলে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। সাংসারিক অভাব অনটনের কারণে তাঁর লেখা পড়া বন্ধ হয়ে যায়। স্কুলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি, ও গান গেয়ে তিনি কয়েক বার প্রথম হয়ে পুরস্কার পেয়েছেন। মাঠে গরু চড়াতে যেয়েও রাখাল বন্ধুদের তিনি গান শুনিয়ে মুগ্ধ করতেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি গান প্রিয় ছিলেন। গানের আসরের কথা শুনলে যতদূরেই হোক তিনি ছুটে চলে যেতেন। সারা রাত গান শুনে সকালে বাড়ি ফিরেছেন। অভাবের তাড়নায় অন্যের বাড়ি কামলা দিয়েছেন। নিজের জমি চাষ করেছেন। কৃষি কাজের ফাঁকে ফাঁকে স্থানীয় বিভিন্ন শিল্পীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে গানের তালিম গ্রহণ করেন। তিনি নিয়মিত গান শেখেন ওস্তাদ মকসেদ আলীর নিকটে। এছাড়া, বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী কেন্দ্রের স্টাফ দোতারা বাদক কাঞ্চন মিয়ার কাছেও তিনি গান শেখেন। তাঁর কাছে দোতারা বাজানোও শেখেন। কাঞ্চন মিয়া মারা যাওয়ার পর নিজে নিজেই গানের চর্চা করেন।

কবির পিতা জাফর আলীর ৫ সন্তান। যথাক্রমে মোঃ আজগর আলী (জন্ম ১৯৫৮), মোঃ মজের আলী (জন্ম ১৯৬০), মোসাঃ নাজেরা খাতুন (জন্ম ১৯৬৯), মোসাঃ হাজেরা খাতুন (জন্ম ১৯৬৬), মোঃ আজাহার আলী (জন্ম ১৯৭২)। কবি আজগর ভাণ্ডারীর ৩ কন্যা সন্তান। যথাক্রমে দুলালী বেগম (জন্ম ১৯৮৩), আফরোজা খাতুন (জন্ম ১৯৮৫), রেহেনা পারভীন (জন্ম ১৯৮৭)।

১৯৮০ সনে লোককবি আজগর আলী ভাণ্ডারী তাঁর গ্রামেরই অধিবাসী মোঃ মহির উদ্দিন মণ্ডলের মেয়ে মোসাঃ কাতিমুন খাতুনকে বিয়ে করেন। বিয়ের কিছু দিন পর সুফি তত্ত্বের সাধক হযরত মাওলানা মোঃ আনোয়ার হোসেন ভাণ্ডারীর সাথে দেখা হয়। তাঁর বর্তমান আবাসভূমি চারঘাট থানার মেরামতপুর গ্রামে। কবি তাঁর মুখে তাসাউফের কথা শুনে মুগ্ধ হন। এবং তাঁর হাতে

বয়াত হন। কবি তাঁর মুর্শিদের নিকট থেকে পাওয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে বলেন– আল্লাহ আদম কে সৃষ্টি করলেন। বেহেস্ত হতে বিতাড়িত করলেন। বহু দূরত্ব অতিক্রম করে কিভাবে তিনি দুনিয়াতে এলেন, তা আজ পর্যন্ত গোপন রয়ে গেছে। আল্লাহ্ আদমকে ফেরেস্তাদের সেজদা করতে বললেন। আদম কে এলমে লাদুনী শিক্ষা দেয়া হলো। কোন মাদ্রাসায় নেওয়া হয়নি, কোন কিতাব পড়ানো হয়নি। অথচ কর্দমের পুতুল কি শিখলো, কি জানলো ফেরাস্তাকুলও টের পেলনা এটাই মারিফত।

হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত পৃথিবীতে যত নবী রাসূল এসেছেন তাঁরা সকলেই তাসাউফ তথা এলমুল কলবের জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার ফলে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। এই জ্ঞান সিনা থেকে সিনায় দেওয়া হয়। সাধনার মাধ্যমে মুর্শিদের থেকে এই জ্ঞান অর্জন করতে হয়। লোককবি আজগর আলী ভাণ্ডারী তার মুর্শিদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তাসাউফ জ্ঞানের ভিত্তিতে মারফতি, দেহতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের সঙ্গীত রচনা করেন। এবং সে সঙ্গীত গুলোতে নিজেই সুর দিয়ে গেয়ে, শিষ্য ভক্তদের মাতিয়ে তোলেন। বিভিন্ন ওরশ ও গানের মজমায় ভক্ত শিষ্যরা কবির রচিত গান গেয়ে থাকেন। এই পীর, ভক্ত, শিষ্য, প্রশিষ্য মিলে একটি গোত্র বা গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে।

১৯৮৩ সনে কবি আজগর ভাণ্ডারী মুর্শিদী গান গেয়ে বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী কেন্দ্রের নিজস্ব শিল্পী নির্বাচিত হন। সেই থেকে তিনি বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী কেন্দ্রে গান গেয়ে আসছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আনুষ্ঠান ও ফকিরী মজলিশে গান করার অর্ডার পান, এতে যে অর্থ আসে তা দিয়েই কোনমতে তাঁর সংসার চলে।

কবি অনেক দুঃখ কষ্ট, অত্যাচার সহ্য করে ইসলামের গূঢ় রহস্য ও মূলমন্ত্র প্রচার করেছেন। তথাপি তিনি কারো প্রতি কখনো জুলুম করেননি, কটু কথা বলেননি। কাউকেও অভিশাপ, বদদোয়া করেননি, কিংবা কারো নিন্দা গিবত করেননি। তিনি মনে করেন মানুষের সেবার মাঝে, ভালবাসার মাঝেই রয়েছে আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি। তিনি তাঁর পীর কেবলার নিকট থেকে এই শিক্ষা পেয়েছেন।[৪৩]

১০. শাহসুফি সৈয়দ আমজাদ হোসেন হায়দারী

শাহসুফি সৈয়দ আমজাদ হোসেন হায়দারী রাজশাহী জেলার চারঘাট থানার সারদা পোস্ট অফিসের শাদীপুর গ্রামে ১৯৪৪ সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। এই শাদীপুর গ্রামটি থানা সদর থেকে ১০ কি.মি. উত্তরে এবং সারদা পুলিশ একাডেমী থেকে ৪ কি.মি. উত্তরে। এই গ্রামের আতাউর রহমানের নিকট তাঁর শিক্ষা জীবনের হাতে খড়ি। এরপর তিনি ভর্তি হন শাদীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এখানে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। তিনি ষষ্ঠ শ্রেণী পাশ করেন সারদা পাইলট স্কুল থেকে। পরবর্তী দুই বছর ভায়া লক্ষ্মীপুর মাদ্রাসায় লেখা পড়া করেন। তিনি আবার সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন চারঘাট পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে। এই স্কুল থেকে ১৯৬৫ সনে এস. এস. সি. তৃতীয় বিভাগে পাশ করেন। অভাব অনটনের কারণে তাঁর লেখা পড়া বন্ধ হয়ে যায়। তিনি রাজশাহীর রাণী বাজার রেশম পট্টিতে কাশেম মঞ্জিলে হোমিও ঔষধের দোকান দেন। এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞ ডাক্তারদের নিকট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে চিকিৎসা করতে থাকেন।

১৯৬৭ সনে তাঁর মৃত ভাই শামসুল সেখের স্ত্রী মোসাঃ করিমার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। করিমা ছিলেন পার্শ্ববর্তী গ্রাম জাফরপুর উত্তর পাড়ার আজের আলী প্রামাণিকের কন্যা। ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাঁর দোকানের উপর পাকসেনাদের বোমা নিক্ষিপ্ত হলে দোকানটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। সে সময় তিনি চলে আসেন বানেশ্বরে। বানেশ্বর ময়েজ চেয়ারম্যানের যুদ্ধে বিদ্ধস্ত ঘরের দ্বিতীয় তলা নিজেই সংস্কার করে যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই ঔষধের দোকান খোলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি বানেশ্বর কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হন।

ছোটবেলা থেকেই হায়দারী সাহেবের গান বাজনা ও ইসলামী বই পুস্তক পড়ার প্রতি প্রবল ঝোঁক ছিল। স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে পড়াকালীন সময় থেকে তিনি বিভিন্ন গানের দলের সাথে গান গেয়েছেন, নাটকের দলের সাথে নাটক করেছেন। ১৯৭২ সনে সারদা পুলিশ একাডেমীর বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৬ দিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে 'সূর্য মহল' নাটকে ডাঃ জেমস এর নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেন। নায়িকার চরিত্রে ছিলেন নাটোর থেকে আগত গৌরী। উক্ত নাটকে বিবাহ দৃশ্যে বর আমজাদ হোসেন হায়দারী ও কনে গৌরীর যৌথ নাচে মাতোয়ারা হয়েছিলেন দর্শক। এলাকায় তাঁর অভিনয়ের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। নাটকের সাথে সাথে তিনি নাচ ও গানে

দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। স্কুল কলেজের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি হতেন মধ্যমণি। ১৯৭৪ সনে তিনি বানেশ্বর কলেজ থেকে তৃতীয় বিভাগে এইচ. এস. সি. পাশ করেন।

১৯৭৪ সনের দিকে 'আল্লাহ কে?' এই বিশেষ জিজ্ঞাসা তাঁর মনকে ভাবিয়ে তোলে। আল্লাহকে চিনবার উপায় কি? একজন আধ্যাত্মিক সাধকের সন্ধানে বাংলার বিভিন্ন আউলিয়াদের মাজার ও খানকায় ঘুরে বেড়ান। তিনি একদিন স্বপ্নে দেখলেন মাথায় গোলটুপি সাদা পাজামা ও লম্বা পাঞ্জাবী এবং মুখভর্তি সাদা দাড়ি ওয়ালা একজন কামেল পীর কবির মাথা ছুঁয়ে আশীর্বাদ করে দিলেন। সেই দিন থেকে কবি সেই চেহারার মানুষটি খুঁজতে থাকেন। এক বছর পর সেই চেহারার পীর কবির বাড়িতে এসে বললেন, তোমাকে দেখার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়েছিল, তাই তোমার কাছে আসলাম। কবি বললেন আমার ব্যাকুলতা আরো বেশী। আপনি আমাকে চিনেন না, আমার জন্য ব্যাকুল হলেন কি করে। তিনি বললেন তুমি আমাকে না চিনলেও আমি তোমাকে চিনি, তা পরে বুঝতে পারবে। তাঁর পীর কেবলার নাম শাহ্‌সুফি সৈয়দ হোসেন হায়দারী। তাঁর আদি বাড়ি ভারতের বীরভূমে। দেশ বিভাগের পর সপরিবারে চলে আসেন ঢাকায়। প্রথম উঠছিলেন কমলাপুর স্টেশনে। কাজের সন্ধানে গেলেন গার্মেন্টস প্রেসে। সেখানে কর্মচারী বিভাগে একটি চাকুরী পেলেন। তিনি থাকতেন কর্মচারী কোয়ার্টারে। এখানেই তাঁর কর্মজীবনের শুরু এবং শেষ।

পীর কেবলা প্রথম বার কবির বাড়িতে এসে অবস্থান করলেন নয় দিন। এভাবে তিন মাস পর আবার আসলেন, থাকলেন এগারো দিন। কবির বাড়িতে থেকে শুধু এবাদত বন্দেগি করেন। এবং ভবিষ্যতে কবির জীবনে কী ঘটবে তা বলে দিতেন। তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী প্রতিফলিত হওয়ায় কবি তাঁর প্রতি বেশী আকৃষ্ট হন। বিশেষ করে তিনি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন, স্বপ্নে দেখবে তুমি মরে গেছ তোমার জানাজার নামাজে বহুলোক টুপি মাথায় দিয়ে এসেছে, তোমাকে কবর দেওয়া হচ্ছে। তাঁর এই ভবিষ্যৎ বাণীর কয়েক দিন পর তিনি স্বপ্নে একই রকম বিবরণ দেখলেন। কবি এরপর তাঁর নিকট বয়াত হওয়ার মনস্থ করলেন।

আমজাদ হোসেন হায়দারীর বাড়িতে সুফি সাধক শাহ্‌সুফি সৈয়দ হোসেন হায়দারী তৃতীয় বার যখন আসলেন, তখন তাঁর নিকট তিনি বয়াত হলেন। এবার পীর কেবলা তাঁর বাড়িতে তের দিন থেকে কবিকে সাথে করে ঢাকায় নিয়ে গেলন। পর্যায়ক্রমে গুরুর নিকট থেকে সবক নিলেন:

কলেমা, নাজাম, রোজা, মিলাদ মাহফিল, জিকির, আত্ম পরিচয়, আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের। তবে তাঁর বয়াতের পূর্বশর্ত ছিল সমুদয় কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে মুক্ত হতে হবে। কবি প্রথম বার ঢাকায় যেয়ে গুরুর সাথে সাত দিন ছিলেন। ওস্তাদের কথামত তিনি সাধনা শুরু করলেন। তিনি যখন একাকী সাধনায় নিমগ্ন হতেন তখন তাঁর ভেতরে ভাব সঙ্গীতের উদয় হত। তিনি ধ্যানমগ্ন হওয়ার সময় খাতা কলম কাছে রাখতেন এবং সঙ্গীত গুলো খাতায় লিখতেন। তার লেখা প্রথম সঙ্গীতের অংশ :

আলীর পায়ে তীর বিধিলো,
কোন নামাজে মশগুল ছিলো।
টান দিয়া তীর বের করিলো,
আলী না পেল চেতনা ॥
আসল তত্ত্বের আশেক যারা,
নামাজে দেল করে ফানা
পেয়ে তারা অচিন ঠিকানা
হাওয়া পুরে পাতে আসন ॥[৪৪]

লোককবি আমজাদ হোসেনের সাত সন্তান, যথাক্রমে মোঃ আবদুল্লাহ আল্ মামুনুর রশিদ, মোসাঃ মিলন রেখা, মোসাঃ রেবেকা সুলতানা, আঞ্জুমনারা, শিখা সুলতানা, ময়না বেগম ও রাখি সুলতানা।

কবির গানের সংখ্যা প্রায় দুশো। দেহতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক গানের সংখ্যাই বেশী। তিনি একটি সঙ্গীতে লিখেছেন :

কে বুঝিবে সাঁইয়ের লীলা,
আদম থেকে আদমি হয়ে,
শূন্যে তাই করে খেলা॥
হাহুত হতে নাছুতে গিয়ে,
"ফানা ফিল্লার ঘর বাঁধিয়ে,
মালকুত থেকে বাহির হয়ে,
জব্বুরে হয় লেনা দেনা।
জল তরঙ্গের তুফান তুলে,
মিমের সাগর পাড়ি দিয়ে,
এক হতে তিন বানায়ে,
গলে পরে রঙ্গমালা ॥[৪৫]

কবি হোমিও ডাক্তারীকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ১৯৮৫ সনে এইচ. এম. বি. (ঢাকা) হোমিও ও মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক ব্যাচেলর ডিগ্রি লাভ করেন। যার রেজি নং-৬৩৪।

১৯৮৯ সনে তিনি পীর মাতার নিকট থেকে খেলাফত লাভ করেন। বর্তমান তাঁর ভক্ত মুরিদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। কবির নিজস্ব খানকা বানেশ্বরের খুঁটি পাড়ায় 'দি হায়দারী দরবার শরীফ' এ প্রতি বছর ১লা নভেম্বর তারিখে বার্ষিক ওরশ মোবারক পালন করা হয়। এ ছাড়া প্রতি মাসের শেষ বৃহস্পতিবার রাতে জেকের আজগার, আলোচনা সভা, মিলাদ, দোয়া ও তাবারক বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। এবং প্রতি বৃহস্পতিবারে জেকের, ধর্মীয় আলোচনা, মিলাদ ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৮০ সনে শাদীপুর গ্রামের কতিপয় যুবক কবির লেখা সঙ্গীত ও বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে কবিকে ধর্মদ্রোহী বলে প্রথম সারদা ইউনিয়ন কাউন্সিলে কেস করেন। পরে চারঘাট কোর্টে স্থান্তরিত হয়। কোর্ট কর্তৃপক্ষ হাজিরার দিন ধর্মীয় বিষয় ফতোয়া দেওয়ার জন্য কোর্টে দুই জন মাওলানা উপস্থিত করান, তাঁরা হলেন: রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও খুলনা থেকে আগত মাওলানা দলিলুর রহমান। কবি কোর্টে হাজির হয়ে নিজেই কোরান ও হাদিসের আলোকে অভিযোগগুলোর জবাব দেন। সব শেষে মাওলানাদ্বয় ফয়সালায় বলেছিলেন: আমজাদ হোসেন যে পদ্ধতিতে ধর্ম পালন করছেন ও সঙ্গীত লিখছেন তা কোরান হাদিসের বিরোধী নয়। মহামান্য বিজ্ঞ বিচারক মোঃ ওহিদুর রহমান তাঁর ধর্মীয় কার্যকলাপে কোন অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে নির্দোষ খালাস দেন। এবং মামলার রায়ে বলা হয়, তিনি তাঁর ধর্ম যথা-রীতি সর্বত্র প্রচার করতে পারবেন।[৪৬]

লোককবি আমজাদ হোসেন হায়দারী আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত আছেন। তাঁর এই সাধনা লব্ধ আধ্যাত্মিক জ্ঞান সঙ্গীতের ভাষায় প্রকাশ করছেন। সেই সাথে সমাজসেবা ও সাহিত্য চর্চাও যুক্ত হয়েছে।

১১. মোঃ আবুল ক্বাছিম কেশরী

বিশ্ব জনারণ্যের নিভৃত কন্দরে অনেক কুসুম কলিকা ফোটে। আবার দিবাবসানে কেউবা স্বকীয় রূপ-রস-গন্ধ ও বর্ণ থাকা সত্ত্বেও অনাঘ্রাত অবস্থায় মানব চক্ষুর অন্তরালে আপনা আপনিই ঝরে যায়। অথচ বনজ কুসুম বলে কেউ তার খোঁজ রাখে না। এমনই একটি বনজ কুসুম লোককবি আবুল ক্বাছিম কেশরী। তিনি রাজশাহী জেলার মোহনপুর থানাধীন কেশরহাট নামক গ্রামে ১৯১৪ ইংরেজি সনে ও ১৩২০ বঙ্গাদের ২২শে কার্তিক অভিজাত খোন্দকার বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা খোন্দকার আব্দুল হালিম সে অঞ্চলের একজন সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত অলিয়ে কামেল পীর ছিলেন। কবির পূর্ব পুরুষগণ আরব থেকে এদেশে ইসলাম প্রচার কল্পে আগমন করেন। তাঁদের পূর্ববসতি ছিল মোহনপুর থানার ভাতুরিয়া নামক গ্রামে। কালক্রমে তাঁরা কেশর হাটে স্থায়ী বাসিন্দা হন। এবং নামের সাথে কেশরী সংযুক্ত করেন।

তিনি সাকোয়া মাদ্রাসায় পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। লোকনাথ হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। তাঁর কণ্ঠ ছিল অতি সুমধুর। এ সময় তিনি পুঁথি, গ্রামের কাহিনী নিয়ে কবিতা ও ইসলামী গজল ভাল গাইতে পারতেন। বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে ইসলামী গজল গেয়ে সুনাম অর্জন করেন। তিনি ভাল বাঁশি বাজাতে পারতেন। স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে প্রায়ই তিনি প্রথম হতেন। তিনি এই স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। এই সময় গান শেখার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। শিক্ষা জীবনের ইতি টেনে বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় যান। কলকাতায় পরিচয় হয় প্রখ্যাত শিল্পী আব্বাস উদ্দিনের সাথে। আব্বাস উদ্দিন তাঁর গান শুনে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন। কবি হারমনিয়াম, ডুগি, তবলা বাজাতে পারতেন। সেখানে কবি আব্বাস উদ্দিনের কাছে সঙ্গীত চর্চা করেন এবং বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠানে তাঁর সাথে যেতেন ও গান গাইতেন। এক বছর পরে লোকমুখে শুনে বাড়ি থেকে লোক যেয়ে কবিকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। পরবর্তী বছর আব্বাস উদ্দিন রাজশাহীতে আসেন। রাজশাহী শহরে, মোহনপুর ও মোহনগঞ্জে তাঁর আগমন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সব অনুষ্ঠানে কবি গান গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। আব্বাস উদ্দীন রাজশাহী ত্যাগ করার পর আবার তিনি পালাবার চেষ্টা করেন। কবির বাবা ছিলেন একজন পীর, তিনি গান বাজনা পছন্দ করতেন না। তাঁর পালাবার উপক্রম দেখে তাঁকে এই দেশে

স্থায়ী করবার জন্য কবির বাবা তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করেন। ১৩৪৭ সনের ৯ বৈশাখ বাগমারা থানার হাঁসনীপুর গ্রামের মোঃ আবুদল দেওয়ানের মেয়ে মোসাঃ খাদিজা খাতুন ওরফে হাসনা হেনার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। বিশাল জাঁক-জমক আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে তাঁদের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বরযাত্রী ৭৬টি গরুর গাড়ি ও ১২৫টি সাইকেল যোগে কনের বাড়িতে পৌঁছে। সেখানে এ গাড়িগুলো রাখার জায়গার বড় রকমের সংকট দেখা দেয়।

বিয়ের কিছু দিন পর তিনি সাকোয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। এরপর শিক্ষক হিসাবে আসেন মোহনপুর হাইস্কুলে। কয়েক বছর হাইস্কুলে শিক্ষকতা করে আবার চাকুরী নেন জুট বিভাগে। পি. এল. এ পদে জুট বিভাগে চাকুরী নিয়ে মোহনপুর, বাগমারা ও চারঘাটসহ রাজশাহী জেলার বিভিন্ন থানায় কাজ করেন। তিনি কৃষকদের পাট চাষে উদ্বুদ্ধ করতেন। একবার কবি তাঁর কর্মস্থল চারঘাটে নৌপথে আসার সময় প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে পড়েন। সে দিনের ঝড়ে নৌকা ডুবে বহু মানুষ মারা যায়। তিনি সে দিন সে বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়ে বাড়ি চলে যান।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যখন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ছিলেন তখন তাঁর সম্পাদিত আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের একজন শব্দ সংগ্রাহক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আব্দুল ক্বাছিম কেশরী। এতে পারিশ্রমিক ও পেয়েছেন তিনি। কবি কোন এক সময় জমি জরিপের কাজও করেছেন, সে বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করেছেন।

আমরা আমীন জরিপ করি
এই দুনিয়ার মাটি।
মোদের হাতেই লুকিয়ে আছে
জমি মাপা কলকাঠি।
মোরা মোমিন কোমিন সবে এক সাথে
খাটি মাঠে রোদ পানি ঝড় নিয়ে মাথে
বাধা যত পায়ে দলে' যাই
দৃঢ়পণ বুকে আটি।[৪৭]

কবির সাহিত্যিক বন্ধুদের অন্যতম ছিলেন কবি বন্দেআলী মিঞা, নূর মোহাম্মদ, হাশার উদ্দিন, ড. আশরাফ সিদ্দিকী ড. মযহারুল ইসলাম ও প্রফেসর আবদুল হামিদ। কবি নজরুল ইসলাম ও কবি গোলাম মোস্তফার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল।

তিনি ১৯৬০ সনে স্থানীয় রায়ঘাটী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে ৫ বছর এ দায়িত্ব পালন করনে। ১৯৭২ সনে স্থানীয় একটি কুচক্রী মহল জোরপূর্বক তাঁদের ৬ খানা জমি দখল করে নেয়। জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সংঘর্ষ হয়। উক্ত সংঘর্ষে কবি উপস্থিত না থাকলেও কবির বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। কবি গ্রেফতার হয়ে ৪ বছর হাজত বরণ করেন। তিনি হাজতে বসেও অনেক লোকসঙ্গীত রচনা করেছেন। ৪ বছর হাজত বরণ করে মামলার রায়ে নির্দোষ মুক্তি লাভ করেন।

কবির সন্তান যথাক্রমে খোন্দকার খালিদ সাইফুল্লাহ ওরফে দিলদার, মোঃ খালিকুজ্জামান শওকত, মোসাঃ কামরুন নেছা দিলআরা, মোঃ খাবীর আবদুল্লাহ আল্ জামাল মুকুল কেশরী, মোসাঃ কাদরুন নেছা দিলখুশ, মোসাঃ কারিউন নেছা দিল আরাম, মোসাঃ কালবুন নেছা দিলরুবা, মোসাঃ কাবলুন নেছা দিলরোজ, মোঃ খায়রুল্লাহ মোস্তফা কামাল, মোঃ খাদিমুল ইসলাম নেহাল।

কবি পল্লী সাহিত্যের একজন সংগ্রাহকও বটে। গ্রাম বাংলার আনাচে কানাচে যে মূল্যবান পল্লী সাহিত্য সম্পদ ছড়ানো আছে তা' থেকে তিনি বহু কষ্টে ও অর্থ ব্যয়ে প্রচুর ছড়া, মেয়েলী গীত ও অনেক লোক সাহিত্যের মাল-মসলা সংগ্রহ করেছেন। ঐ গুলোকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেন। তা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এ নিয়ে তাঁর পল্লী সাহিত্যের ওপর লিখিত 'রাজশাহী গীতিকা' (মেয়েলী গীতের সংগ্রহ) 'রাজশাহীর ছড়া সাহিত্য' নামক দু'টি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে।[৪৮]

লোককবি আবুল ক্বাছিম কেশরীর 'মূর্খ আবিদ' নামে ৪৭টি গানের সমন্বয়ে একটি সঙ্গীত গ্রন্থ অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। এছাড়া তাঁর ২৬টি গান নিয়ে 'পেউ কাঁহা' ও ৪৪টি গান নিয়ে 'সুরবাণী' নামে দুইটি সঙ্গীত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রয়েছে। তাঁর মোট সঙ্গীতের সংখ্যা প্রায় পাঁচশ।

তাঁর 'মূর্খ আবিদ' গ্রন্থের ৩০নং পৃষ্ঠায় 'লবা' নামে পল্লী গ্রামের এক অবহেলিত বালকের জীবন পরিবর্তনের কাহিনী বর্ণনা করে বলেন :

ও পাড়ার কালো ছেলে লবা ছিল নাম তার,
লিকলিকে দেহ ছিলো ছিলো শুধু পেট সার।
কষে দিলে গালে চড়, না করিত রা শব্দ কভু,
দুঃখে দিন গুজরায় অভিযোগ নাই তবু।

সেই ছেলে অবহেলে জয়করি দুঃখ রাজি,
বসিয়াছে সমাজেতে ইয়া মাতব্বর সাজি।
লবা নাম ভাল নহে নওআব আলী নাম তাই
রাখিয়াছে দেখেশুনে এ নামের তুল্ নাই।
ছিপ্ ছিপে কালো ছেলে পেট মোটা সেই লবানাম,
ধনে জনে মানে শানে দিন যাপে অবিরাম।[৪৯]

কবির পিতা আধ্যাত্মিক সাধক খোন্দকার আবদুল হালিমের নিকট তিনি বয়াত হয়ে মারেফতের জ্ঞান অর্জন করেন এবং মরমি সঙ্গীত রচনা করেন। যেমন :

আমার মনের মন্দিরে রাখি
যে মুরতি পূজিবারে চাই
জগতের মাঝে যেনো কভু তার
কোনই তুলনা নাহি পাই।
সে মূরতি যেনো চাঁদিমার বাঁকা
শয়নে স্বপনে হৃদে মম আঁকা
মিশাতে সে মনোহর ছবি খানি
আপনারে যেনো ভুলে যাই।[৫০]

আবুল ক্বাছিম কেশরীর বাস্তব জীবনের সাথে একটি স্বতঃস্ফূর্ত কাব্য জীবন সংযুক্ত। আপন হৃদয়ে সঞ্চিত তত্ত্বজ্ঞান বিকশিত হয়েছে তাঁর কবিতা ও গানে। মরমি সাধনা ও স্বভাব কবিত্ব তাঁর কাব্য ও সঙ্গীতে এক অপূর্ব রূপ ধারণ করেছে। এই স্বনাম ধন্য সাধক কবি ১৯৯০ সালের ৮ জানুয়ারী রবিবার বিকেল ৩টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১২. মোঃ আবদুর রহিম সরদার

কবি আবদুর রহিম সরদার বাগমারার পরিচিত একটি নাম। 'রহিম কবি' নামে ছোট বড় সবাই চেনে তাঁকে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি একহাতে কাগজ ও অন্য হাতে খঞ্জনি। আর কাঁধে ঝুলানো একটি চটের ব্যাগ। এই যেন তার সম্বল। ভূমিহীন আবদুর রহিম খাসজমিতে ঘর বানিয়ে বসবাস করে আসছেন বাগমারা থানার দ্বীপ নগর গ্রামে। স্বল্প শিক্ষিত রহিম ছন্দের অন্তমিল রেখে কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে কবিতা লেখেন। আর তা হাট-বাজার ও গ্রামে গ্রামে লোকজন জড়ো করে মজমা বসিয়ে নেচে গেয়ে কবিতা শুনিয়ে থাকেন। তাঁর কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়ে শ্রোতারা ২/১ টাকা করে দিয়ে থাকেন। সারা দিন যা আয় হয় তা দিয়েই চলে রহিমের সংসার।[৫১]

অসহায় ভূমিহীন লোককবি মোঃ আবদুর রহিম সরদার বাগমারা থানার বাসুপাড়া ইউনিয়নের দ্বীপ নগর গ্রামে ১৯৪৮ সনের জানুয়ারী মাসের ১৫ তারিখে সন্ধ্যা রাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মোঃ দুলব সরদার, মায়ের নাম মোসাঃ আছিয়া বেওয়া। 'ভূমিহীনের করুণ কাহিনী' কবির আত্ম জীবনীমূলক কবিতায় নিজের পরিচয় দিলেন :

দ্বীপ নগরে বসতবাড়ী দিলাম পরিচয়
আবদুর রহিম নামটি আমার সবারে জানাই
আমার মত ভূমিহীন কে আছে বাংলায়
গ্রামের নামটি দ্বিপনগর বাগমারা হয় থানা
ভূমিহীনের দুঃখের কথা করে যাই রচনা।[৫২]

বড় দুঃখে গড়া কবি আবদুর রহিমের জীবন। ৮ বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা যায়। মা আছিয়া মানুষের বাড়ি ঢেঁকিতে ধান ভানা ও ঝিয়ের কাজ করে খুব কষ্টের মধ্য দিয়ে কবিকে লালন পালন করেন। দ্বীপনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণীতে ৩ মাসে বর্ণ পরিচয় শিখেছিলেন। অভাব অনটন ও বাবাহারা সংসারে কবির আর স্কুলে যাওয়া হয়নি। ৯ বছর বয়সে তিনি চলে যান তানোর থানার কামাড় গাঁ গ্রামের আজিজের বাড়িতে সেখানে তিনি ছাগল, গরু চড়ানোর রাখালি কাজ করেন শুধু পেটভাতে। গ্রামের মাঠে অন্যান্য রাখালেরা যখন গান গাইতেন, একবার শুনেই তিনি সুর দিয়ে গাইতে পারতেন। এমন প্রখর ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি। তাঁর কণ্ঠও ছিল অতি শ্রুতি মধুর। গানে গানে তিনি হয়ে ওঠেন রাখাল বালকদের মধ্যমণি। তিনি যখন গান ধরতেন মাঠে

ঘাটে গ্রামে গান শুনে মানুষ মুগ্ধ হয়ে যেত। আজিজের আলকাপের একটি দল ছিল। তাঁর গান শুনে তাঁকে আলকাপের দলে ভর্তি করে নেয়। কবি নিজেও গান তৈরী করে নিজে গাইতেন। ৫ বছর তিনি এই দলে গান গেয়েছেন। তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে।

সেখান থেকে তিনি চলে আসেন মোহনপুর থানার বেল্লা গ্রামের এলি মাস্টারের আলকাপের দলে। এখানে দু বছর থাকার পর তিনি যোগদেন মোহনপুর থানার গোছা গ্রামের আঞ্জের আলী মণ্ডলের আলকাপের দলে। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাঁকে বেশী টাকা দিবে, আশায় আশায় রেখেছিল ৫টি বছর কিন্তু কবির ভাগ্যে টাকা জোটেনি। শুধু তাঁর জীবন মাটি হয়ে যায়। তিনি মাঝে মাঝে মাকে দেখতে দ্বীপ নগরে আসতেন, টাকা দিয়ে যেতেন, ঘর বাড়ি মেরামত করে দিতেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাঁদের গানের দলটি ভেঙ্গে যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গোছা গ্রাম পূর্বপাড়া মেরুর আলকাপের দলে যোগ দেন। সেই দলে ১ বছর গান গেয়েছেন।

বাগমারা থানার কামনগর গ্রামে জবেরের একটি আলকাপ গানের দলছিল। দলনেতা জবের আবদুর রহিমের গান শুনে ফন্দি আটে, রহিমকে দলে আনতে পারলে উপার্জন ভাল হবে। কবি গোছা গ্রাম থেকে জন্মভূমি দ্বীপ নগরে আসছিলেন মাকে দেখার জন্য। সে দিন জবেরের দল দ্বীপ নগর গ্রামের এছেরকে হাত করে রাত দশটার সময় ছুরি দেখিয়ে মায়ের কাছ থেকে ধরে নিয়ে যায়। কবির মাকে তাঁরা বলে যায় "আপনার ছেলের কোন অসুবিধা নেই, তবে আমাদের দলে গান গাইতে হবে।" সেই রাতেই কামনগর গ্রামে তাঁদের গান ছিল। তিনি সারা রাত গান গেয়ে মাতিয়ে তোলেন কামনগরবাসীকে। তাঁর প্রথম গাওয়া গান :

ডাকিসনারে কালো কোকিল
জাগাইসনারে ব্যথা
এই বসন্তকালে আমার
সঙ্গে নাইরে সখা
বাউল সুরে গাওরে পাখি
উঁচু ডালে বসিয়া
প্রাণ বন্ধুয়া নাই মোর কাছে,
প্রাণ ওঠে মোর কান্দিয়া ॥[৫৩]

কবির মেঝোভাই বাহাদুর পরদিন সকালে কামনগর গ্রামে যেয়ে কবিকে নিয়ে আসেন। কবির মা চোখের পানি ফেলে বলে "বাবা তুমি বাড়ি থাকো কোথাও যাইও না, সারা রাত আমার

চোখে ঘুম নাই।" মায়ের কথায় সব দলবল ছেড়ে চলে আসেন পৈতৃক আবাসভূমি নিজ বাড়িতে। তার মাথায় কোমর পর্যন্ত লম্বা চুল, গায়ে ফকিরী বেশের পোশাক। গ্রামের কতিপয় যুবক তাঁকে বেশরা ফকির বলে অভিযোগ করে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই সমাজে থাকতে হলে তওবা করতে হবে এবং গান বাজনা ছাড়তে হবে। কবি গান না গাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমাজে টিকে থাকলেন। কাঠ মিস্ত্রীর কাজ পেশা হিসাবে গ্রহণ করলেন।

১৯৭৪ সালে ভূমি রেকর্ডের সময় কবি গান বাজনা নিয়ে মোহনপুর থানায় ব্যস্ত ছিলেন, সে সময় তাঁর ভাইয়েরা রেকর্ডে তাঁর নাম না দেওয়ায় পৈতৃক সম্পত্তি থেকে তিনি বঞ্চিত হন। দীর্ঘ বিশ বছর কবিগান গেয়েছেন। তাঁর প্রতিটি রক্ত কণিকায় মিশে আছে গানের সুর। যখন তাঁর অতীত ইতিহাস মনে হয়, গানের সুরে তাঁর রক্ত নেচে ওঠে। গানের নেশায় রাতে চোখে ঘুম আসেনা। একই গ্রামের হদন ও ফেকুর সহযোগিতায় গোপনে দূরের মজমায় গান গাইতে যান। একবার বাগমারা থানার উত্তর দিকে একডালা গ্রামের পাশে কুয়ালী পাড়ায় গান গাইতে যান। গান গেয়ে ফেরার পথে একই থানার কামনগর গ্রামের রজব আলীর বাড়িতে ওঠেন। পূর্বে এই গ্রামে গান গাইতে এসে রজব আলীর কন্যা সখিনার সাথে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। কয়েকদিন পর কবির বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব যায়। কবি সেই রাতেই ভাবীর পুরাতন শাড়ী নিয়ে দুইজন সঙ্গীসহ বিয়ে করতে আসেন কামনগর গ্রামে। বিয়ে করে পরদিন সকালে নতুন বউ নিয়ে দ্বীপনগর নিজ বাড়িতে চলে আসেন।

অভাব অনটনের মাঝ দিয়ে চলতে যাকে কবির নতুন সংসার। বাগমারা থানা সদর থেকে কবির বাড়ি দ্বীপ নগর গ্রাম ৭ কি.মি. উত্তর পশ্চিমে। এবং তাঁর বাড়ির ৪ কি.মি. পূর্বে ফকিন্নী নদী ও ৪ কি.মি. দক্ষিণে বারনই নদী।

অসহায় দরিদ্র ভূমিহীন আবদুর রহিম পরেরজায়গায় বাড়ি করেছিলেন। ৯১ সনে বাগমারা ভূমি অফিস থেকে ভূমিহীন আবদুর রহিমকে ২২শতক জমি এককালীন প্রদান করেন। জমিটি ছিলো দ্বীপ নগর মৌজায়, যার দাগ নং ১০৪৬। এই জমিটি দ্বীপনগর বাজার এলাকায়। হাট কমটি জমি দখল দিতে রাজী হয়নি। এ বিষয়ে 'ভূহিহীনের করুণ কাহিনী' কবিতায় তিনি লিখেছেন :

অফিসের লোকজন জিজ্ঞাসা করিল
দ্বীপ নগরের ভূমিহীন কেবা আছে বল
আবদুর রহিম ভূমিহীন বলিল সবাই
আর কি বলিব দুঃখের কথা বুক ভাসিয়া যায়
আসমানের নিচে জমি আমার বলতে নাই।

চোখ রাঙ্গিয়ে কমিটিগণ আমারে যে কয়
হাটের পাশে খাস জমি দিবনা তোমায়
হাট করাত দূরের কথা প্রাণ বাঁচান দায়।
বিবাদির দাপট দেখে প্রাণে লাগে ভয়
জমি পাওয়া দূরের কথা প্রাণ বাঁচানো দায়
আল্লা জানে কি মুসকিলে আমারে ফেলায় ॥[৫৪]

তৎকালীন বাগমারা থানার ওসি বাসুপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জব্বার মণ্ডল ও দ্বীপ নগরের ছলেমান মেম্বরকে বিষয়টি সুরাহার দায়িত্ব দেন। তাঁরা কবিকে বাড়ি করার নির্দেশ দেন। কবি দুই কাঠা জমির উপর ঘর তোলেন। দের বছর সেখানে বসবাস করেন। একদিন বাজার কমিটির কতিপয় লোক গভীর রাতে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ঘরে আগুন ধরিয়ে আনন্দে পিকনিক করে খায়। কবি 'ভূমিহীনের করুণ কাহিনী' তাঁর আত্মজীবনীমূলক কবিতায় লিখেছেন :

আল্লাহ বিনে এই জগতে আমার কেহ নাই
ঘর বাড়ি ভেঙ্গে তারা পিকনিক করে খায়।
ঘর বাড়ি ভাঙ্গার তদন্ত চার বার হইল
মাহফুজার টি.এন.ও. এবার তদন্তে আসিল
গ্রামের লোকের কাছে এবার সাক্ষী যে চাহিল।
অফিসারের কাছে সাক্ষী গ্রামের লোকে দিল
উসমান আসামী সাক্ষীকে মারিতে লাগিল
অফিসারের লোকজন পালাইয়া গেল ॥[৫৫]

বাগমারা থানা নির্বাহী অফিসার মাহফুজার রহমান তদন্তকাজে অবহেলা করায় কবি তাঁর কবিতায় সে বিষয়টি উল্লেখ করেন। সে কবিতা বাগমারা টি.এন.ও. অফিসের সামনে মজমা বসিয়ে কবিতা পড়ে বিক্রি করছিলেন। টি.এন.ও. সাহেব বিষয়টি জানতে পেরে তাঁর পিয়নকে দিয়ে কবির ১০০ কপি কবিতা আগুনে পুড়িয়ে দেয়। পরবর্তী কবিতায় কবি আবার লিখলেন :

মনের দুঃখে কবিতা প্রচার করে যাই
মাহফুজার টি.এন.ও. আমার কবিতা পুড়ায়
সুবিচারের লাইগা আমি ঘুরিয়া বেড়াই।[৫৬]

বিচারের বাণী চিরদিন নিরবে নিভৃতে কাঁদে। লাঞ্ছিত বঞ্চিত ভূমিহীন পল্লী কবি আবদুর রহিমকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১নং খাস খতিয়ান থেকে ৩ বার জমি দেওয়া হয়। কিন্তু ভোগ দখল একবারও কবির ভাগ্যে জোটেনি।

এলাকায় কোন চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটলেই আবুদর রহিম ছুটে যান ঘটনাস্থলে। সঙ্গে থাকে কলম ও কয়েকপাতা সাদা কাগজ। সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সাজিয়ে গুছিয়ে ছন্দে ছন্দে ঘটনাকে ফুটিয়ে তোলেন। অর্থাভাবে সব কবিতা ছাপাতে পারেন না। রহিমের ইচ্ছা সবগুলো কবিতার পাণ্ডুলিপি ছাপিয়ে তা বাজারে বিক্রি করা। প্রায় ৩০ টি পাণ্ডুলিপি ছাপিয়েছেন। আর ৭০টি পাণ্ডুলিপি তৈরী আছে। তাঁর কবিতার চাহিদাও বেশ আছে। কয়েক বছর থেকে টাকার অভাবে আর ছাপাতে পারেননি। প্রেস মালিকরাও বাঁকিতে ছাপাতে রাজি হন না। বাধ্য হয়ে হাতে লেখা কবিতার সাদা কাগজের পাণ্ডুলিপিই সুরে সুরে পড়ে শোনান। তিনি জানান চাঞ্চল্যকর হত্যা ও প্রেম সম্পর্কিত কবিতার চাহিদা বেশী। শ্রোতারা এ ধরণের কবিতা শুনতে আগ্রহী। এক সময়কার কাঠ মিস্ত্রী রহিম দেড় যুগ ধরে কবিতা লিখে আসছেন। তাঁর কবিতা বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী কেন্দ্রেও প্রচার হয়ে থাকে। তিনি বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী কেন্দ্রের একজন অনিয়মিত গীতিকার ও সুরকার।

লোককবি আবদুর রহিমের ঘরে দুই কন্যা সন্তান, যথাক্রমে মোসাঃ রোজিনা খাতুন জন্ম ১৯৮২, মোসাঃ রিমিনা খাতুন জন্ম ১৯৮৮। বড় মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন, ছোট মেয়ে ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতার মধ্যে রয়েছে: ভূমিহীনের করুণ কাহিনী ১ম ও ২য় খণ্ড, শরাফত মাস্টার নির্মম হত্যার করুণ কাহিনী, কোদালে মুণ্ড কাটা খুনের কবিতা, মাঝিক গ্রামের শাহিনুর খুনের কবিতা, নজরুল খুনের কবিতা, চেয়ারম্যান গোলাম রব্বানী খুনের কবিতা, আবুল হোসেন সরকার দুলু হত্যার কাহিনী, ওয়াহেদ প্রফেসারকে জবাই করার কবিতা, বাবুল মেম্বর খতমের কবিতা, এরশাদ শিকদারের ফাঁসির কবিতা, রহিদুল ইসলাম পাখি হত্যার কাহিনী, আনোয়ার কমিশনার হত্যার কবিতা, ইউ.পি. সদস্যসহ ৬জনকে জবাই করার করুণ কাহিনী, মুক্তি যুদ্ধের কবিতা, ভাষা আন্দোলনের কবিতা, যুব উন্নয়নের কবিতা, কৃষি মেলার জারী গান, বন্যা দুর্গত এলাকার মানুষের করুণ কাহিনী, সন্দীপন গণশিক্ষার জারী, গায়েন আলীও মাজেদা বিবির

প্রেমের কবিতা, শমসের রাসেদার জমজমাট প্রেমের কবিতা, সাঁওতাল মেয়ে আর্চনা ও রাজ্জাকের প্রেমের কবিতা, এবং সাহেব আলী ও বেদেনা বেগমের প্রেমের কবিতা।[৫৭]

সারা জীবন কবিতা লেখার আগ্রহ রয়েছে তাঁর। নিজেকে পল্লীকবি হিসেবে জাহির করে বলেন, "গ্রামের যে সব ঘটনা পেপার পত্রিকায় প্রকাশ পায়না, আমি সেগুলোকে কবিতার মাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশ করি এবং ন্যায় বিচার দাবী করি"। আবদুর রহিমের কবিতার যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে বাগমারা অঞ্চলে। ছোট বড় সবার মুখেই ভেসে বেড়ায় তাঁর কবিতা।

১৩. মোঃ শমসের আলী

লোককবি মোঃ শমসের আলী ১৯৪৮ সালের ১০ই জানুয়ারী রাজশাহী জেলার পবা থানার বড়গাছি ইউনিয়নের বারনই নদীর তীরে সূর্যপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম লেদু মণ্ডল, মায়ের নাম নুরজাহান বেগম। পবা থানা সদর থেকে ৪ কিলোমিটার উত্তরপূর্ব দিকে পাকা রাস্তার পাশে তাঁর বাড়ি।

সূর্যপুর গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে জানা যায়, পূর্বে এই এলাকায় হিন্দুদের বসবাস বেশী ছিল। এই গ্রামের মানুষ কোন একসময় মাঠে একত্র হয়ে সূর্য উদয় ও অস্ত যাওয়ার সময় সূর্য পূজা করত। সেখান থেকে এই গ্রামের নাম হয়েছে সূর্যপুর। এখনো এই গ্রামের উত্তরাংশে অনেক হিন্দুর বসবাস আছে। কবির গ্রামের নামের সাথে তাঁর চেহারার যথেষ্ট মিল আছে। কবির চেহারাও সূর্যের মত উজ্জ্বল।

লোককবি শমসের আলী বেতকুড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এবং তিনি বড়গাছি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তাঁরা ৪ ভাই ও ৫ বোন। কবি স্কুল জীবনে একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ৫ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সব ক্লাসে প্রথম ছিলেন। ছোট বেলা থেকে গান বাজনা তার ভাল লাগত। বাবা মা সংসারের কাজের তেমন চাপ দিতেন না। যেখানে গান বাজনা হত সেখানে চলে যেতেন। কবির বয়স তখন ৫ বছর সে সময় পাবনা থেকে আগত সুধীর চন্দ্র পাল শূকর চড়ানোর জন্য এ অঞ্চলে প্রতিবছরেই আসতো, এবং দুই তিন মাস করে এ অঞ্চলে থাকতো।

সুধীর চন্দ্র সন্ধ্যায় দোতারা বাজিয়ে গান গাইতো তখন তিনি তাঁর পাশে বসে মনোযোগসহকারে শুনতেন এবং তাঁর অত্যন্ত ভাল লাগতো। প্রথম তিনি যে গানটি শুনেছিলেন তাহলো :

উবুত করা একনদী দেখিলাম ভাইরে
উপরে তার তলী . . . . ।

সুধীর চন্দ্রের এই গানের কলি ৫৭ বছরের ব্যবধানে এখনো শমসের আলীর মনে আছে। তাঁর গান শুনার জন্য কবি অনেক দিন মাঠে মাঠে বেড়িয়েছেন। এভাবে সুধীরের পরিচিত মুখ হয়ে উঠলেন তিনি। একদিন সুধীর চন্দ্র হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি গান গাইতে পারো? কবি সেদিন এই গানটিতে সুর দিলেন : .

নদী না যাইওরে বাইদোর
নদী না যাইওরে . . . . . ।

সুধীর চন্দ্র এই গ্রাম্য বালক শিল্পীর গান শুনে বলেছিলেন "সাব্বাস বাবা! সাধনা করলে তুমি একজন বড় শিল্পী হবে।" সুধীর চন্দ্রের সেই ভবিষ্যতবাণী সত্যি হয়েছে। শমসের আলী এখন পবা থানার একজন জনপ্রিয় লোককবি ও লোকশিল্পীর মর্যাদা পেয়েছেন।

সুধীর চন্দ্র এ এলাকা ছেড়ে চলে যাবার পর তিনি নিজহাতে কাঠদিয়ে দোতারা তৈরী করে, সেদোতারা বাজিয়ে গান গাইতেন। সে সময় শিল্পী আব্বাস উদ্দিন, ফেরদৌসী রহমান, আবদুল আলিম, মোস্তফা জামান আব্বাসী ও নীনা খান এদের গান "কলের গানে" প্রচারিত হত। যেখানে গান বাজত সেখানেই তিনি চলে যেতেন। সারাদিন নাওয়া খাওয়া না করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতেন। এতে বাবা মার বকুনী খেয়েছেন অনেক। এইভাবে বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীতের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল ঝোঁক। এখন তিনি গানের ওস্তাদ খোঁজা শুরু করলেন।

বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী কেন্দ্রের সঙ্গীত শিল্পী মৌপাড়ার লোকমান শাহ্ এর নিকট বেশকিছু দিন সঙ্গীত ও যন্ত্র বাজানো শেখেন। তিনি স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে স্বাধীনতা বিদস উদ্‌যাপন ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মঞ্চে দোতারা বাজিয়ে গান গেয়ে দর্শক শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছেন। কবি কলেজ জীবনে নিজ কলেজ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গান গাইতেন, তাঁর গান শুনে শ্রোতারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠতো। একবার বড়গাছি স্কুল মাঠে পাকিস্তানের স্বাধীনতা বিদস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে তিনি গাইলেনঃ:

কোন দিন যেন আসবে গ্রেফতারী পরবাসী . . . . ।

এই গান শুনে শ্রোতারা আনন্দে মেতে উঠলেন। শ্রোতাদের অনুরোধে সেই মঞ্চে তিনটি গান গেয়েছিলেন তিনি। কবির জীবন ইতিহাসে সেই ক্ষণটি ছিলো স্মরণীয়। শ্রোতারা উল্লসিত হয়ে কবিকে অনেকেই টাকা, বই, কলম, খাতা উপহার দিলেন। অনেক উপহার জমা হলো মঞ্চের টেবিলে। কবি নিজেও খুশীতে আত্মহারা হলেন।

সূর্যপুর গ্রামে একটি গান ও নাটকের দল ছিল। এই দলের পরিচালক ছিলেন আছিরুদ্দিন সরকার। তিনি গানের দলের উদ্যোগে এ গ্রামে একটি নাইট স্কুল খোলেন। সেই নাইট স্কুলেরও ছাত্র ছিলেন কবি শমসের আলী। সেখানে লেখাপড়া শেষে নাটকের অভিনয় হত। কয়েকটি নাটকে তিনি অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। একদিন তাঁর সহপাঠিনী রাহেলা লেখা পড়ার ক্ষতি হবে বলে নাট্য চর্চা বাদ দিতে বলেছিলেন তাঁকে। কিন্তু কবি সে দিন পড়াশুনায় মনোনিবেশ না করে নাটক আর সঙ্গীত চর্চায় মেতে থাকতেন।

১৯৭২ সালে তার নিজগ্রাম সূর্যপুর নিবাসী মোঃ তাহের সরকারের কন্যা মোসাঃ সারেজান বিবির সাথে কবির বিয়ে হয়। গান বাজনার মধ্যদিয়ে তাঁর নতুন সংসার চলতে থাকে। তাঁর স্ত্রী মোসাঃ সারেজান বিবিও কবিকে গান গাওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। তাঁদের ঘরে জন্ম নেয় ৩টি কন্যা সন্তান। তারা হলেন যথাক্রমে মোসাঃ মেরিনা বেগম জন্ম ১৯৭৫, মোসাঃ সেরিনা খাতুন জন্ম ১৯৭৯, মোসাঃ রোমানা খাতুন জন্ম ১৯৯১। বড় মেয়ে দু'টিকে তিনি বিয়ে দিয়েছেন। এবং ছোট মেয়েটি মোসাঃ রোমানা খাতুন সবসার উচ্চ বিদ্যালয়ে ৯ম শ্রেণীতে অধ্যায়নরত।

গানের শিল্পী হিসাবে তিনি যখন বিভিন্ন ওরশে যেতেন, সেখানে অনেক বাউল ও সুফিতত্ত্বের সাধকদের কাছে আধ্যাত্মিক কথা শুনে একজন আধ্যাত্মিক সাধকের নিকট বয়াত হওয়ার প্রেরণা জাগে। তখন থেকে তিনি একজন কামেল পীরের সন্ধান করতে লাগলেন। দাউকান্দি বাজারের এসাহাকের নিকট তিনি প্রথম কামেল পীড় সৈয়দ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ এতিবর রহমান আল্ চিশ্‌তি নিজামির কথা শোনেন। পীরের বাড়ি পুঠিয়া থানার বানেশ্বর অঞ্চলের খুঁটিপাড়া গ্রামে। কবি একদিন পীরের বাড়িতে যেয়ে হাজির হলেন। তার নিকট পীরসাহেব বললেন 'দেহ-তত্ত্ব জ্ঞান তথা আত্ম-তত্ত্ব, আধ্যাত্মিক জ্ঞানই হলো ইলমে মারেফাত। এই ইলমে মারেফাত অর্জন না করা পর্যন্ত নিজেকে চেনা যাবেনা এবং আল্লাহর রাসূলকে চেনা অসম্ভব। তাই

আল্লাহর রাসূলকে পেতে হলে একজন কামেল পীরের নিকট বয়াত হওয়া প্রয়োজন। পীরের চিন্তা চেতনার সাথে কবির চিন্তা চেতনা মিলে গেল। কবি তাঁকে দাওয়াত করলেন নিজ বাড়িতে। তিনি দাওয়াত গ্রহণ করে আসলেন কবির বাড়িতে। পীর সাহেবের আগমন বার্তা শুনে এলাকার অনেক মানুষ কবির বাড়িতে জমায়েত হলেন। পীর সাহেব দীর্ঘ সময় ইসলাম, ইমান, ইহ্‌সান ও মারেফাত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করলেন। তাঁর আলোচনা কবির অত্যন্ত ভাল লাগলো। সেই মুহূর্তে কবি ও তাঁর স্ত্রী মোসাঃ সাবেজান বিবিসহ ১২জন সৈয়দ হযরত মাওলানা এতিবর রহমান আল চিশতি নিজামির নিকট বয়াত হলেন। সেই রাতেই মুর্শিদ তাদের প্রাথমিক সবক প্রদান করেন। মুর্শিদের দেওয়া সবক তিনি ভক্তিসহকারে পালন করা শুরু করলেন। কোন এক সময় কবি দেহতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক জগতের অনেক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করলেন। তাঁর অর্জিত জ্ঞানরাজি গানের মাধ্যমে প্রকাশ করা শুরু করলেন। তাঁর প্রথম লেখা গান –

চালাও তরি মুর্শিদ নামে
আটে সাতাসের হিসাব ধরে
ছাড় তরি খোদ মুকামে ॥
আল্লার নামে বাদাম তুলে
মুর্শিদ নামে হাল ধরিয়ে
প্রেমের তরি দাওরে ছেড়ে
টলবে না তরি ঝড় তুফানে ॥[৫৮]

কবি তাঁর মুর্শিদকে এই গানটি দেখানোর পর তিনি দেখে বললেন, যাও মাঝি তুমি উজান গাঙে নৌকা বাইতে পারবে। সেই থেকে কবি পীর কেবলার উৎসাহ পেয়ে গান লেখায় মেতে উঠলেন। এছাড়া গায়ক হিসাবেও তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে আছে রাজশাহীর বিভিন্ন অঞ্চলে।

লোককবি শমসের আলী দুর্গাপুর থানার কানপাড়া ফকির কালাচাঁদ শাহের মাজার শরীফের বার্ষিক ওরশে অতিথি শিল্পী হিসাবে প্রতি বছর গান করেন। এ ছাড়া তিনি বানেশ্বর বাজার, মান্দা থানার চকমানিক, দুর্গাপুর থানার জয় নগর, পবা থানার দাদপুর, শ্রীপুর ন'হাটার শাপাড়া, দাউকান্দি, রাজশাহী শাহ অলিবাবার মাজার, অচিন তলা খানকা, মোহনপুর থানার বিদিরপুর এবং বাঘা থানার শাহদৌলার মাজারসহ রাজশাহী জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের খানকা ও মাজারের বার্ষিক ওরশ মোবারকে অতিথি হিসাবে প্রতি বছর নিয়মিত গান করেন।

নিজ বাড়ির পূর্ব পাশে 'সূর্যপুর খানকা শরীফ' নামে তাঁর প্রতিষ্ঠিত খানকা আছে। ১৯৯৯ সালে কবি শমসের আলী নিজের তিন শতক জমি ওয়াকফ স্টেটে 'সূর্যপুর খানকা শরীফে' দান করেন। এই খানকা শরীফে প্রতি সপ্তাহ, মাস ও বছরের নির্ধারিত দিনে ভক্ত মুরিদেরা একত্র হয়ে জেকের আজগার করেন এবং মারফতি ও মুর্শিদি গান গেয়ে থাকেন। সমস্ত মজমায় গীত অধিকাশ গানই শমসের আলীর। তার গানের সংখ্যা প্রায় ৫০/৬০ হবে। তিনি কখনও গান সংরক্ষণ করেননি। গান লিখে ভক্তভাইদের হাতে দিয়েছেন গাওয়ার জন্য। এই ভাবে রাজশাহী জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর ভক্ত ভাইদের নিকটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেক গান।[৫৯] গবেষক নিজে কবির নিকট থেকে ভক্ত ভাইদের ঠিকানা সংগ্রহ করে অতি কষ্টে ৩০টি গান সংগ্রহ করেছেন। শমসের আলী উদার অসাম্প্রদায়িক কবি। তিনি মানব সমাজকে দৈহিক সাধনার মাধ্যমে আত্মার মুক্তির জন্য নিরলস চেষ্টা করছেন।

১৪. গোলাম জিয়ারত আলী

রাজশাহী জেলার দুর্গাপুর থানার উজাল খলসী গ্রামের অধিবাসী মরমি কবি গোলাম জিয়ারত আলী। তিনি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক। দীর্ঘ ৪০ বছর যাবত রাজশাহী জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি ২৬ বছর ধরে মরমি সঙ্গীত সাধনায় লিপ্ত আছেন। তাঁর গানের সংখ্যা দুইশ পঁঞ্চাশের উপরে। তিনি মরমি ধারায় সঙ্গীত রচনা করেছেন। যেমন –

বিশ্ব জাহানের নমুনা এই ক্ষুদ্র মানব দেহ ভাণ্ডার
যাহা আছে বিশ্বময় সবই মিলে তার ভিতর
মানব স্রষ্টার রহস্যে আবৃত আছে
স্রষ্টা মানবের রহস্য একথা নয়কো মিছে।[৬০]

কবি গোলাম জিয়ারত আলী ১৯৪৪ সনে টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার বেগনড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম- ইয়াকুব আলী সিকদার ও মাতার নাম ইয়ানত নেছা সিদ্দিকা। দুই বছর বয়সে কবির রক্ত আমাশয় দেখা দেয়। বহু চিকিৎসার পরও কিছুতেই ভাল হয় না। ভাল চিকিৎসার জন্য বাবা-মা জমি বন্ধক রেখে কবিকে কবির নানী ও মামার কাছে নিয়ে যান। তাঁরা ভারতের আসাম রাজ্যর কামরূপ জেলার বড়পাটা মহকুমার অধীন হাউলি থানায় বাস করতেন। সেখানে দু'বছর চিকিৎসার পর ভাল না হওয়ায় বাড়িতে ফিরে আসেন। এবং একজন হোমিও ডাক্তার চিকিৎসা করে কবিকে সুস্থ করে তোলেন। কবির বয়স তখন পাঁচ বছর। কবির চাচাতো ভাইয়েরা বন্ধকি জমি ফেরৎ না দেওয়ায় কবির বাবা পরের বাড়িতে কামলা দিয়ে কোন রকমে সংসার চালায়। হঠাৎ কবির বাবা অসুস্থ হন এবং মারা যান। বাবার কবর খোঁড়ার প্রথম কোপ কবিকে দিয়ে দেওয়ানো হয়েছিল, শুধু এতটুকু কবির মনে আছে। পিতার মৃত্যুর পর মায়ের স্নেহে লালিত পালিত হন তিনি। কবির মা অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে তাঁকে লেখা পড়া শেখান। তিনি ১৯৫৭ সালে কোনডা পাঠশালা থেকে ৫ম শ্রেণী পাশ করেন। এরপর তিনি লাউহাটি আজাহার খান মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৬২ সনে লাউহাটি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন। দুর্ভাগ্য তিনি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। ১৯৬৩ সনে পুনরায় পরীক্ষা দিয়ে ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বাল্যকাল থেকেই খেলাধুলা ও নাটক

থিয়েটারের দিকে অত্যধিক ঝোঁক ছিল তাঁর। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর অর্থাভাবে তাঁর পড়া লেখা অকালে বন্ধ হয়ে যায়।

তিনি ১৯৬৪ সালে লাউহাটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। অবসরে টাইপিং শেখেন। শিক্ষকতা ছেড়ে তিনি চলে যান ঢাকায়। সেখানে হাইকোর্টে টাইপিষ্ট ক্লার্ক পদে চাকুরীতে যোগদান করেন। বাইশ দিন চাকুরী করার পর চাকুরী চেড়ে দেন। কবির সহপাঠী মোয়াজ্জেম হোসেন ও তার বড় ভাই টাঙ্গাইল থেকে উঠে এসে রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার পাঁচুবাড়ি গ্রামে বসতি গড়ে তোলেন। সেই সুবাদে মোয়াজ্জেম দুর্গাপুরের বক্তিয়ারপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে অংকের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। মোয়াজ্জেম কবিকে চিঠি লেখে, প্রাইমারীতে চাকুরী করলে পত্র পাওয়া মাত্র চলে আসো। পত্র পেয়ে, তিনি মা বোন কে বলে চলে আসেন মোয়াজ্জেমের কাছে। এখানে এসে একমাস পর ১৯৬৪ সনের ১৮ আগষ্ট শ্রীঘর পুর মডেল প্রাইমারী স্কুলে চাকুরীতে যোগদেন। তখন বেতন পেতেন মাত্র ৫০ টাকা। এক বছর পর উজাল খলসী মডেল প্রাইমারীতে বদলী হন। এখানে তিনি জায়গীর থেকে চাকরী ও লেখাপড়া করতে থাকেন। তিনি ১৯৬৭ সালে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে আই.এ পাশ করেন। এ বছরেই তিনি বদলী হয়ে সরকারী প্রাইমারী স্কুলে আসেন। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে টাঙ্গাইল সদর থানাধীন লালহারা গ্রামের আজগর আলী ভূঁইয়ার একমাত্র কন্যা সুফিয়া বেগমের সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

তিনি ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতা যুদ্ধে ১১নং সেক্টরে (ঢাকা-টাঙ্গাইল) মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে পুনরায় নিজ কর্মস্থল সরদহ সরকারী প্রাইমারী স্কুলে যোগদান করেন।

লোককবি গোলাম জিয়ারত আলী ১৯৭১ সালে ঢাকার গাজীপুরের বালিয়ার চালার বাগেরবাজার অঞ্চলের পীর কেবলা হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ হোসেন হায়দারীর নিকট বয়াত হন। কবি মুর্শিদ কেবলার প্রত্যক্ষ হুকুমে তাঁর কাব্য জীবন শুরু হয়। মুর্শিদ কেবলা কবিকে বলেন "মাস্টার তোমার তো লেখার অভ্যাস আছে তুমি গান লেখ, বই লেখ।" মুর্শিদের এই হুকুম পালন করাই কবি ইবাদত মনে করলেন। তাই প্রতিনিয়ত তিনি তার আদেশ পালন করে

চলেছেন। কবির সঙ্গীত ছাড়াও তত্ত্বমূলক ৩টি গদ্য রচনা আছে। সেগুলো হলো : ১. *ইসলামের মুল স্তম্ভ*, ২. *হক তত্ত্ব*, ৩. *নামাজ প্রতিষ্ঠা রাখার কৌশল*।

তিনি ১৯৬৭ সালে বিয়ের পর তাঁর স্ত্রী ও মাকে নিয়ে রাজশাহীর দুর্গাপুর থানায় স্থায়ী আবাস গড়ে তোলেন। কবির পাঁচ সন্তান, যথাক্রমে সরোয়ার জাহান জুয়েল (জন্ম ১৯৭০), আসাদুজ্জামান টুয়েল (জন্ম ১৯৭৪), জিন্নাত আরা খাতুন ঝর্ণা (জন্ম ১৯৭৬), ফখরুজ্জামান-ফুয়েল (জন্ম ১৯৭৮), (চারমাস বয়সে কলেরায় মারা যায়)। গোলাম হায়দার বিদ্যুৎ (জন্ম ১৯৮০)।[৬১]

কবি শিক্ষকতার পাশাপাশি হোমিও চিকিৎসা ও যাত্রাপালার পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এমন কি নিজেও বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। সাধনা জীবনের পাঁচ বছর পর আপনা আপনি অভিনয়ের নেশা বন্ধ হয়ে যায়। কবি ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। উজাল খলসী বাজারে কবির 'দি হায়দারী হোমিও সেবালয়' নামে ঔষধের দোকান আছে। কবির অবসর জীবন কাটছে এই সেবালয়ে অধ্যাত্ম সাধনা ও কাব্য সাধনার মধ্য দিয়ে।

তথ্যসূত্র

১ নিজস্ব সংগ্রহ : কবি মকসেদ আলী ও তাঁর স্ত্রী নুরবানুর নিকট থেকে প্রাপ্ত। গ্রাম–বলিয়া ডাইং, ইউনিয়ন–গোগ্রাম, উপজেলা– গোদাগাড়ি, সংগ্রহকাল– ৫/১১/২০০৪।

২ নিজস্ব সংগ্রহ : আব্দুস সামাদ, পিতা–খোদা বক্শ মণ্ডল, গ্রাম–ঈশ্বরীপুর,পোঃ প্রেমতলী, থানা–গোদাগাড়ি, বয়স–৭৮, পেশা–কৃষি, সংগ্রহকাল– ২/১১/২০০৪।

৩ ফকির আনোয়ার হোসেন (মন্টু শাহ), *লালন সঙ্গীত* (প্রথম খণ্ড), (ছেঁউড়িয়া, কুষ্টিয়া: লালন মাজার শরীফ ও সেবা সদন কমিটি ১৯৯৩), পৃ. ৯৬।

৪ ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক, *মরমী কবি পাঞ্জু শাহ: জীবন ও কাব্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৯০), পৃ. ৫১৭।

৫ ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক, *মরমী কবি খোদা বক্শ শাহ: জীবন ও সঙ্গীত* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৯৭), পৃ. ১৪১।

৬ নিজস্ব সংগ্রহ: আবদুল খালেকের এই জীবন বৃত্তান্ত কবি ও তাঁর দুই স্ত্রী মরিয়ম ও গুলনাহারের নিকট থেকে সংগৃহীত, সংগ্রহকাল – ৮/৯/২০০৪।

৭ মোঃ আব্দুল খালেক, *তৌহিদ সাগর*, (রাজশাহী, প্রকাশক: গ্রন্থকার চৈত্র ১৩৮২), পৃ. ৪৮।

৮ মুহম্মদ আবু তালিব, *লালন শাহ্ ও লালন–গীতিকা* (প্রথম খণ্ড), (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৬৮), পৃ. ৪৮২।

৯ নিজস্ব সংগ্রহ: গায়ক ফরিদ আহমদ মংলা ফকির, গ্রাম–কৃষ্ণপুর, পোঃ ও থানা–পুঠিয়া, বয়স–৮০, সংগ্রহকাল– ১৪/৯/২০০৪।

[১০] নিজস্ব সংগ্রহ: কবি শমসের আলীর নিকট থেকে, গ্রাম–সূর্যপুর, পোঃ–বড়গাছি, থানা–পবা, সংগ্রহকাল–২১/১১/২০০৪।

[১১] নিজস্ব সংগ্রহ: ক্ষেত্রানুসন্ধান (ফিল্ডওয়ার্ক) থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ময়েজসার পুত্র মোঃ মজির উদ্দীন সা-র নিকট থেকে সংগ্রহ, সংগ্রহকাল–১৭-৮-২০০৪।

[১২] নিজস্ব সংগ্রহ: বাঙ্গালীর গান, ময়েজ সা-র কন্যা ফুলজান বিবির থেকে প্রাপ্ত, বয়স– ৭৭ বছর, গ্রাম–উত্তর মিলিক বাঘা, থানা–বাঘা, জেলা: রাজশাহী, সংগ্রহকাল– ১৯-৮-২০০৪।

[১৩] ড. মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, 'লোককবি ময়েজ সা এবং তাঁর গান' রাজশাহী এসোসিয়েশন পত্রিকা, স্মরণিকা–২০০০, ১২৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব: ১৮৭২-২০০০, পৃ. ৬৯।

[১৪] ড. মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, 'লোক কবি ময়েজ সা এবং তাঁর গান', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯।

[১৫] তদেব।

[১৬] ময়েজ সার ছেলে মজির উদ্দীন সা-র সাথে আলোচনা, স্থান–নিজবাস ভবন, গ্রাম–উত্তর মিলিক বাঘা, তারিখ: ২৫-৮-০০৪।

[১৭] তদেব, পৃ. ৭০-৭১।

[১৮] নিজস্ব সংগ্রহ: জেল খানার গান, আলী মুহাঃ হাশেম, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহদৌলা ডিগ্রী কলেজ, থানা: বাঘা, জেলা: রাজশাহী।

[১৯] ড. মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, 'লোককবি ময়েজ সা এবং তাঁর গান', পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১-৮২।

[২০] ময়েজ উদ্দীন সা-র ছেলে মজির সা-র সাথে আলোচনা, স্থান– নিজবাস ভবন, গ্রাম–উত্তর মিলিক বাঘা, পূর্বোক্ত, তারিখ: ২৮-৮-২০০৪।

[২১] ড. মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, 'লোককবি ময়েজ সা এবং তাঁর গান', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১।

[২২] মোঃ কলিম উদ্দীন মিঞা, *গীতি বিচিত্রা*, (রাজশাহী, বাঘা–কবি কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৮৬) গান নং ৩০।

[২৩] নিজস্ব সংগ্রহ: ক্ষেত্রানুসন্ধান (ফিল্ডওয়ার্ক) থেকে প্রাপ্ত, বাউল মফিজ উদ্দীন পাগলা, গ্রাম– নিশ্চিন্তপুর, পোঃ ও থানা–বাঘা, জেলা– রাজশাহী, সংগ্রহকাল– ১০-১১-২০০৪।

[২৪] কবির এই জীবন কথা কবি ও তাঁর স্ত্রীর নিকট থেকে সংগৃহীত। সংগ্রহকাল– ২৬-০৮-২০০৪।

[২৫] হযরত খাজা মহসিন আলী আল্ চিশতি, খাতা নং ১, পৃ. ৫৬; সংগ্রহকাল– ২২-১১-২০০৪।

[২৬] তদেব, পৃ. ৬০; সংগ্রহকাল– ২২-১১-২০০৪।

[২৭] হযরত খাজা মহসিন আলী আল্ চিশতির সৌজন্যে প্রাপ্ত, প্রাপ্তির তারিখ: ২৩-১১-২০০৪।

[২৮] কবির এই জীবন কথা কবি ও তাঁর স্ত্রীর নিকট থেকে সংগৃহীত, স্থান–নিজ বাস ভবন, গ্রাম-বলিহার, পোঃ মনিগ্রাম, থানা–বাঘা, সংগ্রহকাল– ২৩-১১-২০০৪।

[২৯] কবির সন্তান মোঃ মোকবুল হোসেন চিশতি, গ্রাম–চকছাতারী, পোঃ বাঘা, থানা–বাঘা, সংগ্রহকাল–২৪-১২-২০০৪।

[৩০] কবির সন্তান মোঃ নূরুল হুদা চিশতি, গ্রাম–চকছাতারী, পোঃ ও থানা–বাঘা, সংগ্রহকাল–২৫-১২-২০০৪।

[৩১] কবির এই জীবন কথা কবির সন্তান মোকবুল হোসেন চিশতি, নূরুল হুদা চিশতি, কন্যা জহুরা বেগম ও নাতি গোলাম রব্বানীর নিকট থেকে সংগৃহীত। স্থান–চিস্তিয়া মঞ্জিল' গ্রাম–চকছাতারী, পোঃ বাঘা, জেলা রাজশাহী, সংগ্রকাল–১৬-০৮-২০০৪।

[৩২] কবি আবদুল আলিম ফকির, *আলিম গীতি*, (রাজশাহী, জুন ২০০৪), পৃ. ১৩।

[৩৩] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক, মোঃ কাইমুদ্দিন, পিতা– মোহসিন আলী সরদার, গ্রাম: জুড়ানপুর, পোঃ বাগধানী, থানা: তানোর, জেলা: রাজশাহী, বয়স: ৫২, সংগ্রহের তারিখ: ০২-০৯-২০০৪।

[৩৪] নিজস্ব সংগ্রহ: খাজা আহমদ, পিতা– নজর আলী সরদার, গ্রাম: জুড়ানপুর, পোঃ বাগধানী, থানা: তানোর, জেলা: রাজশাহী, বয়স: ৬০, সংগ্রহের তারিখ: ০২-০৯-২০০৪।

[৩৫] নিজস্ব সংগ্রহ: আসান আলী সরদার, পিতা– হোসেন আলী সরদার, গ্রাম– জুড়ানপুর, পোঃ বাগধানী, থানা– তানোর, জেলা: রাজশাহী, বয়স: ৬২, পেশা–কৃষি, সংগ্রহের তারিখ: ০৩-০৯-২০০৪।

[৩৬] কবি আলিম ফকিরের কাছ থেকে সংগৃহীত, সংগ্রহকাল– ০৩-০৯-২০০৪।

[৩৭] তদেব।

[৩৮] কবি আবদুল আলিম ফকির, *আলিম গীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭।

[৩৯] তদেব, পৃ. ৬৬।

[৪০] কবির এই জীবন কথা তাঁর নিজের ও তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হাবিবার নিকট থেকে সংগৃহীত। সংগ্রহকাল–১৫-০৯-২০০৪।

[৪১] কবি হযরত খাজা খলিলুর রহমান চিশতির নিকট থেকে সংগৃহীত। সংগ্রহকাল– ২০-০৯-২০০৪।

[৪২] কবির এই জীবন কথা কবি ও তাঁর কন্যা মোসাঃ ফরিদা খাতুন (বেলী) নিকট থেকে সংগৃহীত। স্থান–মানছুবিয়া খানকা শরীফ, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী, সংগ্রহকাল–২০-০৯-২০০৪।

[৪৩] কবির এই জীবন বৃত্তান্ত কবি ও তাঁর স্ত্রী মোসাঃ কাতিমুন খাতুনের নিকট থেকে সংগৃহীত। স্থান– নিজবাস ভবন, গ্রাম–বড় বনগ্রাম (পাঁচ আনী পাড়া), পোঃ সপুরা, থানা–শাহমখদুম, জেলা– রাজশাহী, সংগ্রহকাল–১০-১০-২০০৪।

[৪৪] নিজস্ব সংগ্রহ: মোঃ মোনায়েম আলী, পিতা: মোঃ হারেজ আলী, গ্রাম: মোক্তারপুর, পোঃ মোক্তারপুর, থানা: চারঘাট, তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ২৫-১১-২০০৪।

[৪৫] নিজস্ব সংগ্রহ: মোঃ আবু তাহের, পিতা: মোঃ আজের প্রমাণিক, গ্রাম: জাফর পুর, ইউনিয়ন: শলুয়া, থানা: চারঘাট, তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ২৫-১১-২০০৪।

[৪৬] কবির এই জীবন কথা কবি ও তাঁর সন্তানের নিকট থেকে সংগৃহীত, সংগ্রকাল–২৪-১১-২০০৪।

[৪৭] আবুল ক্বাছিম কেশরীর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, মূর্খ আবিদ, গান নং ৩০, সংগ্রহের তারিখ: ১৫-১১-২০০৪।

[৪৮] কবির এই জীবন কথা কবির ছেলে মুকুল কেশরী, মোস্তফা কামাল ও কন্যা দিল খুশ ও দিলরুবা এর নিকট থেকে সংগৃহীত। গ্রাম–কেশর হাট, থানা– মোহনপুর, সংগ্রহকাল– ১৭-১১-২০০৪।

[৪৯] আবুল ক্বাছিম কেশরীর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, *মূর্খ আবিদ*, কবিতা নং-২৩, সংগ্রহের তারিখ: ১৫-১১-২০০৪।

[৫০] আবুল ক্বাছিম কেশরীর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, *পেউ কঁহা*, গান নং-২৪, সংগ্রহের তারিখ: ১৫-১১-২০০৪।

[৫১] প্রথম আলো, বাগমারা (রাজশাহী) প্রতিনিধি, 'কবিতা লিখে ও হাট-বাজারে শুনিয়ে চলে যার জীবন', পৃ. ৪; প্রকাশের তারিখ: ১১-৩-২০০৩।

[৫২] মোঃ আবদুর রহিম সরদার, 'ভূমিহীনের করুণ কাহিণী', ১ম খন্ড পৃ. ২, প্রকাশকাল ১৫-১-১৯৯৭, বাগমারা, রাজশাহী।

[৫৩] কবি আবদুর রহিম সরদার, গ্রাম–দ্বীপ নগর, থানা–বাগমারা, সংগ্রহকাল– ২৭-১১-২০০৪।

[৫৪] মোঃ আবদুর রহিম, 'ভূমিহীনের করুণ কাহিণী' ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ.২।

[৫৫] মোঃ আবদুর রহিম, *ভূমিহীনের করুণ কাহিণী ২য় খন্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ.৬; প্রকাশকাল: ২০-১-৯৭।

[৫৬] তবেদ, পৃ.৭।

[৫৭] কবির এই জীবন কথা কবি ও তার স্ত্রীর নিকট থেকে সংগৃহীত, স্থান– নিজবাস ভবন, গ্রাম–দ্বীপনগর, থানা–বাগমারা, সংগ্রকাল–২৭-১১-২০০৪।

[৫৮] নিজস্ব সংগ্রহ: ক্ষেত্রানুসন্ধান (ফিল্ডওয়ার্ক) থেকে প্রাপ্ত। মোঃ সলেমান পিতা–মোঃ আছিরুদ্দিন, গ্রাম–সূর্যপুর, পোঃ বড়গাছি, থানা–পবা, জেলা, রাজশাহী, বয়স: ৫০, পেশা: কৃষি, সংগ্রহের তারিখ: ২০/১১/২০০৪।

[৫৯] কবির এই জীবনবৃত্তান্ত কবি ও তার স্ত্রীর নিকট থেকে সংগৃহীত। স্থান–নিজবাস ভবন, গ্রাম–সূর্যপুর, থানা–পবা, সংগ্রহকাল– ১৫-১২-২০০৪।

[৬০] নিজস্ব সংগ্রহ: গোলাম জিয়ারত আলী, স্থান–নিজবাস ভবন, গ্রাম–উজাল খলসী, থানা–দুর্গাপুর, রাজশাহী, সংগ্রহকাল–২৫-০৫-২০০৫।

[৬১] কবির এই জীবন কথা কবি ও তাঁর স্ত্রী সুফিয়া বেগমের কাছ থেকে সংগৃহীত। স্থান– নিজবাস ভবন, গ্রাম–উজাল খলসী, থানা–দুর্গাপুর, জেলা–রাজশাহী। সংগ্রহকাল–২৫-০৫-২০০৫।

তৃতীয় অধ্যায়
লোককবিদের সাহিত্যকর্মের নিদর্শন ও মূল্যায়ন

১. মোঃ মকসেদ আলী

লোকসঙ্গীত বাঙলার একটি প্রধান লৌকিক ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাধন সঙ্গীত। বিশুদ্ধ শিল্প-প্রেরণার বশে নয়, বিশেষ উদ্দেশ্যমগ্ন হয়েই এই গান সৃষ্টি করেছেন লোককবিরা। লোককবি মকসেদ আলী সত্য লাভের জন্য, দেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নানাবিধ মাধ্যমের বিকাশ ঘটানোর সাধনা করেছেন। তিনি অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী, সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে অভেদ কল্পনা করেন। গুরুকে পরমসত্তা বা মনের মানুষ হিসাবে মনে করেন। তাঁর মতে মনের মানুষের বাস এই দেহের মধ্যে। এই দেহের সাধনা করলেই মনের মানুষকে পাওয়া যাবে। গানের মাধ্যমে তাঁর সে মনের মানুষকে ধরার চেষ্টা করেন। মানব দেহের মধ্যেই সাঁই লুকিয়ে আছেন বলে কবি মনে করেন :

কি আজব এই মানব জনম
গড়েছেন ঐ মালেক সাঁই।
সৃষ্টির সেরা মানব গড়ে
তার ভিতর নিজে লুকায় ॥
জ্ঞান বিজ্ঞানের চিত্ত মাঝে
স্বরূপে সাঁই রূপ বিরাজে
তাই ফেরেস্তা সিজদা দিল
আজাজিল তা বুঝে নাই ॥[১]

কবির এই গানের সঙ্গে লালন শাহের গানের সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। লালন শাহ্ বলেন :

লামে আলিফ লুকায় যেমন,
মানুষে সাঁই আছেন তেমন,
তা নইলে কি সব নুরীতন,
আদম তনে সিজ্‌দা জানায় ॥[২]

মানুষ সৃষ্টির সেরা এবং সৃষ্টির মূল কারণও মানুষ। মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো মানবের মাধ্যমে আপন সৃষ্টি লীলার প্রকাশ। মানব দেহে সাঁই তাঁর পবিত্র নুর প্রবেশ করিয়ে দেহকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছেন। মানুষের দেহভাণ্ডই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতীক। মনের মানুষ বা সাঁই আছেন দেহের অভ্যন্তরে ঠিক 'খাচার ভিতর অচিন পাখির' মত। তাই মানব জীবন ও মানব দেহকে তাদের সাধনার মূল আশ্রয় হিসাবে মনে করেন। এ সম্পর্কে মরমি কবি মকসেদ আলী বলেন–

মানব দেহ গুপ্ত কাবা
শোনরে মন তোরে বলি।
সেথায় যারা হজ করিল
তারাইতো কুতুব ওলি।[৩]

কবির এই গানের সঙ্গেও যথাক্রমে ভবা পাগলা, পাঞ্জু শাহ ও রকীব শাহের গানের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

ক. আছে আদি মক্কা মানব দেহে, দেখনা মন চেয়েরে ॥
মানব দেহ কি চমৎকার আজগবি উঠছে আওয়াজ
সাত তালা ভেদিয়ে চার মুড়ায় চার নুরের মিম্বর
মধ্যে সাঁইজি বিরাজ করে ॥[৪]

খ. দেহ মধ্যে একখানে মদীনা শরীফ।
সেইখানে হচ্ছে ভাই আল্লার তারিফ ॥
মদিনা পীরান জাগা রাসুলের বাড়ি।
আল্লার মেহেরে সেথা হচ্ছে ঘর বাড়ি ॥[৫]

গ. আদম তনে কোথায় আছে মক্কা-মদিনা
মুমিন বল ঠিকানা ॥[৬]

মানব দেহে অবস্থিত দিল কাবার উপরে আল্লাহর আরশে আল্লাহ বারাম দিচ্ছেন বা অবস্থান করছেন। সেথায় যারা হজ বা সাধনা করছেন, তাদেরকেই কবি কুতুব বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কবির মতে মনের মানুষই পরম। এই মনের মানুষই অটলরূপে ব্রহ্মা হয়ে মণিপুরে বাস করছেন। কখনো আবার নীরে-ক্ষীরে বিরাজ করেন। তাঁর চলাচলের স্থান দ্বিদলে, দশমদলে, মণিপুরে ষোড়শ দলে। তারপর এই মনের মানুষ যুগলরূপে নীরে ক্ষীরে মিলিত হয় এবং শুভলগ্নে চতুর্দল পদে আবির্ভূত হয়ে সাধককে সন্তুষ্ট করেন। কবি বলেন–

সাঁই সাজে নির্জনে বসে
শুক্র-শোনিত রঙ্গ রসে
অটল জলে রূপের ঝলক
দেখবিরে আপন বদন ॥[৭]

কবির এই গানের সাথে যথাক্রমে পাঞ্জু শাহ ও লালন শাহের গানের সাযুজ্য দেখা যায়।

ক. মূল সাধন কর মালেক চিনে
মীন রূপে সাঁই গভীর জলে, যোগ-সাধন কর বরজোখ ধ্যানে ॥
মীন আল্লা নিজ নাম ধরে
কালাম উল্লায় দেখ জেনে
নির্মল মহল মণিপুরে, খেলছে খেলা ঘাট-ত্রিবিনে ॥[৮]

খ. ত্রিবেনীর তিন ধারে
মীনরূপে সাঁই ঘোরে ফেরে
উপর উপর বেড়াও ঘুরে
সে গভীরে ডুবলে না ॥[৯]

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ির মিলন স্থানকে ত্রিবেণীর ঘাট বলা হয়। এই খানেই অটল মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, প্রকৃতি আর পুরুষের মিলনের মাধ্যমে মিলনের সময় বীর্যকে অটল রাখার জন্য বিভিন্ন কলা কৌশলের সাধনা করেন এঁরা। কবির গানে দেহভাণ্ড রক্ষা করা ও অটলের সাধনার কথা আছে। কবি বলেন—

ক. যে দেহের ভাণ্ড রক্ষা করে
সেইতো পূর্ণ মানুষ।
পরোপকারী হতে সে জন
মহী মতে সুপুরুষ ॥[১০]

খ. অটল কামে এত মধু
জানতাম না আগে
কামেতে পীর নাম জপিলে
শমনদার যাবে দূরে ভেগে ।
কামের ঘরে মেরে তালা
প্রেম সাগরে কর খেলা ।[১১]

কবির গানের সাথে যথাক্রমে রকীব শাহ, লালন শাহ্ ও দুর্গাপুরের কবি শামসুল হক চিশতির গানের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

ক. অকুল সাগর ঘোর বাতাসে, জুয়ার আসে মাসে মাসে
ঢেউ খেলে যায় নৌকা ভাসে, পালে নাইকো ধরে।
ফকির সাধু যায় সে ঘাটে পাড়ি দেয় সন্ধানে
প্রেমিক মানুষ সাঁতার খেলে উজান ভাটায় ঘুরে ফিরে ॥[১২]

খ. টলিলে জীব অটলে ঈশ্বর
তাতে কি হয় রসিক নাগর
লালন বলে রসিক বিভোর
রস ভিয়ানে ॥[১৩]

গ. উজানেতে চালাও তরী
নিঃশ্বাসের ঐ হাল ধরে ॥[১৪]

কবি মানব জীবন ও মানব দেহকে পরম সম্পদ বলে মনে করেন। তাঁদের সাধনার মূল আশ্রয়ই দেহ। নর-নারীর গভীর প্রেম দেহ মিলনের মাধ্যমে চরম আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে উপনীত হয়। রতি নিরোধের মাধ্যমে দেহকে অটল করার ও দীর্ঘায়ু লাভের চেষ্টা করেন। কবি বলেন— অধর মানুষকে ধরতে হলে ‘রস মৈথুনের যুগল কলের’ একান্ত প্রয়োজন। এই যুগল কলই হচ্ছে স্ত্রী পুরুষের প্রজনন ইন্দ্রিয়। এই যুগল সাধনা দুই প্রকার। যেমন— স্বকীয়া ও পরকীয়া। স্বকীয়া-সাধানায় সিদ্ধিলাভ সত্বর হয় না। পরকীয়া সাধনাই অধিকতর ফলপ্রসূ।[১৫] যেমন—

ক. পরকীয়া রতি করহ আরতি
সেই সে ভজন সার ।[১৬]

খ. পাত্রযোগ্য হলে হবে পরকীয়া রস আস্বাদন
আত্মা ধীর শান্তরতি, অনিত্য হবে সাধন ॥[১৭]

গ. পরকীয়ায় অধিক উল্লাস
কোন রসের হলে প্রকাশ
যার অঙ্গে রসিক নির্যাস, পরকীয়ায় গুণ গায় ।[১৮]

কবি বলেন— পরনারী এবং অবিবাহিতা রজঃস্বলা পরনারীই এ সাধনার জন্য বেশি উপযুক্ত। কেননা রজঃ অবস্থায় তিন দিনের শেষ দিনই উপযুক্ত সময়, সেই সময় অধর মানুষ ‘আলেক সাঁই’ ধরায় নেমে আসে। তাঁকে ধরার জন্য এই পরকীয়া সাধনা করা হয়। সাধানায় লিপ্ত হয়ে শক্তি

উর্ধ্বরেতা করে পরস্পর রেতস্খলন না করে শক্তি টেনে নিয়ে সহস্রদলের নিচে দ্বিদলে সিদ্ধি শান্তি লাভ করেন।[১৯]

সাধকেরা অটলের সাধনার জন্য মল, মূত্র, রজঃ, বীর্য বিনা দ্বিধায় সাধনার অঙ্গ হিসাবে ভক্ষণ করে থাকেন। রমণীর ঋতুস্রাবের প্রথম তিন দিন সেই অটল মানুষ মস্তক থেকে নেমে এসে রজের সাথে মিলিত হয়ে মূলাধারে আত্মপ্রকাশ করেন। চতুর্থ দিনে তিনি পুনরায় মস্তকে ফিরে চলে যান। সাধকেরা এই তিন দিন মীনরূপী সাঁইকে ধরার নিমিত্তে ত্রিবেণীর ঘাটে শিকারীর মতো বসে থাকেন এবং এই তিন দিনকে সাধকগণ মহাযোগ ও প্রথম দিনকে অমাবস্যার কাল বলে থাকেন। এ সময় পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হয়। অনেক সাধক রজঃ স্রাবের প্রথম দিন প্রথম বর্ষণের বিন্দু পান করেন। কারণ, জন্ম মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে অমরত্ব লাভ করতে হলে বিন্দুপান অবশ্যই করতে হবে।।[২০] এ সম্পর্কে কবি মকসেদ আলী বলেন—

কাম কেলির পাক বিন্দু সাগর
        উছলে উঠলে ত্রিধারায়
দাও হে পাড়ি নবীন নাগর
        ত্রিবেণীর ফণীর ফণায় ॥
ফণীর ফণায় কেলি করণ
আসবে তোমার মরণ শমন
কৌশলে বশ কইর তারে
        যেন শমন ফেরত যায় ॥[২১]

এই মরণ শমন থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিন্দু পান সম্পর্কে যথাক্রমে লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ এবং হাউড়ে গোঁসাই বলেন—

ক. তার এক বিন্দু পরশিলে শমন জ্বালা ঘুচে যায়।

খ. তার এক বিন্দু পরশিলে এড়াবে শমন।

গ. রস পানে জানে তারা অমৃত সেবন ॥[২২]

এবার কবির গানের ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা করা যেতে পারে। কবির ভাষার প্রধান গুণ হল প্রাঞ্জলতা। তাঁর সঙ্গীতে ভাষার জীবন্তরূপ নজরে পড়ে। একটি মর্মস্পর্শী আবেদন, ঐশী ভাবকল্পনা এবং পারলৌকিক সুখসংবাদ কবির গানের ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। ভাষা ব্যবহারের এই

বৈশিষ্ট্য মকসেদ আলীর কবি প্রতিভাকে বিকশিত করেছে। বিচিত্র ভাব ধারার অনন্য সমাবেশে সমৃদ্ধ তাঁর সঙ্গীত। শব্দ চয়নে তিনি কৃতিত্বের দাবিদার। ধ্বনিসৌন্দর্য ও ছন্দের প্রবহমানতা দিয়ে তাঁর সঙ্গীতকে করেছেন তেজোদীপ্ত ও গতিময়।

সার্থক কাব্য সৃষ্টিতে কবিকে আপন ভাবানুযায়ী ভাষা সৃষ্টি করতে হয়। কারণ প্রত্যেক রচনার প্রেরণা এত স্বতন্ত্র, কাব্য সাধকের অনুভূতি এতই অনন্য সদৃশ যে, তাকে রূপ দিতে হলে তার স্বতন্ত্র এমন নিখুঁতভাবে বজায় রাখতে হয় যে, পূর্ব পরিকল্পিত নির্দিষ্ট কোন ভঙ্গী বা ছাঁচ তাঁর কাজে লাগতে পারে না।[২৩] বিচিত্র ভাব ধারার অনন্য সমাবেশে সমৃদ্ধ লোক কবি মকসেদ আলীর সঙ্গীত সাধনা।

কবি হৃদয়ে যে রসানুভূতির জন্ম তার উপযুক্ত প্রকাশের জন্য প্রয়োজন অলংকার সজ্জিত ভাষা। কিন্তু সাজানো-গুছানো ভাষার মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন কবির কোন পৃথক প্রয়াস নয়। বস্তুত রসানুভূতির উদ্ভব ও বিকাশ পরস্পর সম্পৃক্ত ও নির্ভরশীল। সেখানে ভিন্ন প্রচেষ্টায় ভাষাকে গড়ে তুলতে হয় না। ভাবই ভাষাকে গড়ে তোলে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণীয়: 'সেইভাব, সেই ভাবনা, সেই আবির্ভাব যাকে প্রকাশ করিতে গেলেই অলংকার আপনি আসে, তর্কে যার প্রকাশ নেই, সেই হল সাহিত্যের। অলংকার জিনিসটাই চরমের প্রতিরূপ। অলংকৃত বাক্যই হচ্ছে রসাত্মক বাক্য।[২৪] 'আলম' শব্দ থেকে অলংকার শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ ভূষণ। সুতরাং যার দ্বারা ভূষিত করা যায়, সেটাই অলংকার।[২৫] অলংকারকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—শব্দলংকার ও অর্থালংকার। অলংকার-অস্পষ্টতাকে উদ্ভাসিত করে তোলে, জ্ঞানের ক্লান্তিকর অনুসন্ধানকে সুন্দরের আনন্দাভিসার করে তোলে।[২৬]

কবিতায় 'শব্দ' যখন অলংকৃত হয়, তখন তাকে শব্দালংকার বলা হয়। শব্দালংকার অনেকভাবে বিভক্ত। এ সবের মধ্যে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, পুনরুক্তবদাভাস, সাপেক্ষ সর্বনাম, নির্ধারক বিশেষণ ইত্যাদি প্রধান। কবির ব্যবহৃত কয়েকটি অলংকার উদাহরণসহ উদ্ধৃত করা হলো—

১. অনুপাস : যে কোন স্বরসংযোগে সমধ্বনিময় ব্যঞ্জনের পুনরাবৃত্তির ফলে উদ্ভূত শ্রুতি-মাধুর্যই অনুপ্রাস।[২৭] যেমন—

শান্ত কি অশান্ত ভুবন
ক্লান্ত না অক্লান্ত এখন[২৮]

২. যমক : যমক শব্দের অর্থ যুগ্ম। একই বা প্রায় এক রকমের উচ্চার্য শব্দ যদি দু'বার কি তার বেশিবার আলাদা আলাদা অর্থে বসে, তবে যমক অলংকার হয়। অনুপ্রাসে যে শব্দটি পুনরাবৃত্ত সে বার বার ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে না, আর যমকের ক্ষেত্রে শব্দটির প্রতিবার প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থের বদল অবশ্যই ঘটবে, নইলে তা যমক হবে না।[২৯]

আগম নিগম খবর জেনে করগা সাধন
এতো নয় সামান্য সাধন, করবি নিরূপণ।[৩০]

৩. শ্লেষ : একটি শব্দ উচ্চারিত হলে যদি একাধিক অর্থের প্রতীতি জন্মে তাহলে শ্লেষ অলংকারের চমৎকারিতা উদ্ভূত হয়। এই শ্লেষ, শুধু ধ্বনির উপর নির্ভরশীল।[৩১]

গণি শাহ্ ভেদ মা'লীকে বলে
সবার আগে মর তাহলে।[৩২]

৪. সাপেক্ষ সর্বনাম :

যে সাধন সেধে মুর্শিদ মওলা হয়েছে
সেই সাধনের মাঝে মুর্শিদ ভক্ত গড়িছে।[৩৩]

৫. আদ্যাবৃত্তি :

আনচান আনচান করে আমার ও দয়াল চাঁনরে
আনচান আনচান করে আমার প্রাণ।[৩৪]

৬. দূরাবৃত্তি :

মানুষ মানুষে গাঁথা
মিথ্যা নয় এ সত্য কথা
জান গা তুই মানুষ ধরে
হিসাব নিকাসি ॥[৩৫]

অর্থালংকারের মধ্যে চিত্র ধর্মের প্রাধান্য বিশেষভাবে বিবেচ্য। কেননা কবিতার ভাববস্তু বাইরের জগত থেকে সংগৃহীত। কবির মনোরাজ্যে সেই বহির্জাগতিক ভাববস্তুগুলোই সংস্থাপিত হয়। এতেই কবি ভাবনার উৎপত্তি। কবিতায় সেই ভাবনা প্রকাশের মধ্যে বহির্জাগতিক বস্তুগুলোর প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। ভাষার মধ্যে নিহিত এই যে বহির্জগতের প্রতিচ্ছবি এটাই ভাষায় চিত্রধর্ম।

অর্থালংকারে এই চিত্রধর্ম ফুটে ওঠে অতিস্পষ্টভাবে।[৩৬] মকসেদ আলীর সঙ্গীতে যে সমস্ত অর্থালংকার পরিলক্ষিত তা উদাহরণসহ বর্ণিত হলো।

১. উপমা : লোকপ্রসিদ্ধ অন্যবস্তুর সঙ্গে বর্ণনীয় বস্তুর সাদৃশ্য নির্মাণের ফলে উদ্ভূত চারুত্বই উপমা।[৩৭]

সূক্ষ্ম প্রেমের পূর্ণ জ্যোতি
জ্বলছে যেমন বিজলি বাতি।[৩৮]

২. উৎপ্রেক্ষা : উৎপ্রেক্ষা অর্থ হলো সংশয়। উপমেয়কে যদি প্রবল সাদৃশ্যের জন্যে উপমান বলে সংশয় হয়,-তখন তাকে উৎপ্রেক্ষা অলংকার বলে।[৩৯] যেমন–

কর্তা কর্ম করণ গুণে
দৈব বাণী কর্ণে শুনি[৪০]

৩. রূপক : প্রবল সাদৃশ্য দ্যোতনার জন্যে উপমেয়ের উপর উপমানের অভেদ আরোপ করলে রূপক অলংকার হয়।[৪১] যেমন–

যে গঙ্গা পার হয়ে এলাম
সেই গঙ্গা সামনে দেখি
আমার উপায় কি।[৪২]

৪. প্রতীক : প্রতীক বলতে নিদর্শন বুঝায়। কোন ভাবের বা শক্তির প্রতিরূপ রূপে গৃহীত চিহ্ন-সংকেত প্রতীক নামে অভিহিত।[৪৩]

ত্রিবেণী তীর্থ পথে যাবি যদি আয়
শুক্লা তিথির ষোল কলায়
পুলক পূর্ণিমায়॥[৪৪]

৫. সুভাষণ : সুভাষণ বলতে সুন্দর ও হিতকরবাণী বোঝায়। সুভাষণে ধর্মকথার স্পর্শ থাকে একটু প্রচ্ছন্নভাবে।[৪৫]

কলমা নবীর গ্রহণ কর
জিকরে সালাত কায়েম কর।[৪৬]

সাহিত্যমূল্যের সাধারণ আলোচনায় বলা যায়, ব্যক্তিগত ভাব ও অনুভূতি যখন উপযুক্ত ভাষায় আলংকার ও ছন্দাদি যুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং চিত্তে রস সঞ্চার দ্বারা আনন্দদান করে তখনই তা প্রকৃত কাব্য পদ-বাচ্য হয়। সমুন্নত কল্পনা, বিপুল আবেগের সংহত গভীরতা ও প্রকাশের অনবদ্য কৌশলই কাব্য সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচারের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কল্পনার লীলা ও আবেগের তরঙ্গ থাকলেও তা যদি উৎকৃষ্ট কলার মাধ্যমে প্রকাশ না পায় তবে তা প্রকৃত সাহিত্য হতে পারে না।[৪৭] মকসেদ আলীর সঙ্গীতে বিচিত্র গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর সঙ্গীতে একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব এর অপূর্ব গীতিময়তা। এ সব গানের সুরের ইন্দ্রজালে শ্রোতারা তন্ময় হয়ে যায়। সুরের মাধুর্য মকসেদ আলীর সঙ্গীতকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে।

পরিশেষে বলা যায়, কবি তাঁর সঙ্গীতের মধ্যে নিজের অন্তর পুরুষকে প্রকাশ করেন। বাহ্য জগতের রূপ, রস, গন্ধ ও শব্দকে আত্মগত অনুভূতিরসে স্নিগ্ধ করে তোলেন। তাঁর সঙ্গীত অধ্যাত্ম সাধনা ভিত্তিক, যার মধ্যে সাধন প্রণালির কথাও ব্যক্ত হয়েছে। ভাব ভাষা মিলিয়ে মকসেদ আলীর সঙ্গীত শিল্পগুণে সমৃদ্ধ হয়েছে। কবিহৃদয়ের গভীর অনুভূতি ও মননশীলতা আমরা লক্ষ্য করেছি। হৃদয়ানুভূতি ও পরিবেশ অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হয়ে তাঁর সঙ্গীত সার্থকতা লাভ করেছে।

২. মোঃ আবদুল খালেক

সাধারণ মানুষ দেখে বস্তুর বাহ্যরূপ, সুফি-সাধক দেখেন বস্তুর অন্তর-রূপ, তাঁদের দেখা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নয়, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি দিয়ে তারা দেখেন, মনের দুয়ারে কান পেতে শোনেন, সীমিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর বাহ্যরূপের অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন মহিমা, অসীমের যে অন্তহীন ব্যঞ্জনা বিরাজমান, সাধকেরা তা সব দেখতে পান। এ রকম অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন একজন ভাবের সাধককবি মোঃ আবদুল খালেক। তিনি ধ্যানের মাধ্যমে জাতের বা পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভের শিক্ষা তাঁর মুর্শিদ হযরত এতিবর রহমানের কাছ থেকে গ্রহণ করেন। সাধনালব্ধ বিষয়ের নির্যাসে তিনি সঙ্গীত রচনা করেন।

১৩৮২ সনে আবদুল খালেক 'তৌহিদ সাগর' নামে ২০৭টি মরমি সঙ্গীত সম্বলিত একটি সঙ্গীত সংকলন প্রকাশ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব এ বইয়ের ভূমিকা লেখেন এবং সেখানে তিনি মরমি কাব্যের আসরে আবদুল খালেককে খোশ আমদেদ জানিয়েছেন। নিভৃত পল্লীর একজন স্বল্পশিক্ষিত অধ্যাত্ম সাধকের এ গ্রন্থটি পড়ে বিস্মিত হতে হয় এ জন্যে যে, তিনি এ বইতে কট্টর শরীয়ত পন্থীদের বিদ্রূপ করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। এ জন্যে তাঁকে বাংলাদেশের অনেক মরমি কবির মতো ধর্মদ্রোহী আখ্যা দেয়া হয়েছে।

লোককবি আবদুল খালেক 'তৌহিদ সাগর' পাড়ি জমাতে গিয়ে খাজা এতিবরের স্মরণ নিয়েছেন:

আয় খাজা আয় দেরে দীদার।
তু-ছেওয়া ম্যাঁায় হু বেকারার॥
তু-হায় মা'বুদ তু-হ্যায় মাকছুদ,
তু-হ্যায় মেরে খোদ্ বে-খোদ,
আয় মাহবুব্ মেরে পেয়ার॥[৪৮]

কবির বক্তব্য উদ্ধার করতে গেলে বোঝা যায় এখানে খাজাএতিবর ও খাজা মইনুদ্দিন চিশতি আজমেরী একাকার হয়ে আছেন। স্বয়ং খোদা তায়ালা ও এই খাজা হতে পারেন। তুলনীয় লালনের–

যেহি মুর্শিদ সেহি খোদা
ভজ ওলি এ মুর্শিদা
আয়াত লেখা কোরানেতে [৪৯]

আর পাঞ্জু শাহ্ বলেন–

মুহম্মদ হন সৃষ্টিকর্তা
নবী নামে ধর্মদত্তা। [৫০]

সর্বশক্তিমান প্রেমসত্তার প্রতি সুদৃঢ় প্রত্যয়শীল হওয়ার সাথে সাথে ঐশী বাণীবাহক অতিমানবের প্রতিও কবি আস্থাশীল। অতিমানব শ্রেষ্ঠনবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মূল কারণ। বস্তুত এই নবীই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ শিক্ষক, যাঁর অনুসরণ ব্যতীত বিশ্বপ্রভুর সান্নিধ্য লাভ সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি তো অন্তর্হিত, বাস্তবে তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে পথের দিশা কে দিবেন? বস্তুত এই দিশারী নবীর প্রতিনিধি একজন তত্ত্বজ্ঞানী মানুষ যাঁর তত্ত্বাবধানে দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়। ইসলামী পরিভাষায় যাঁকে বলা হয় 'মুর্শিদ'; তন্ত্রে তিনি গুরু নামে অভিহিত। আবদুল খালেকের মতে এ গুরুই পথের দিশারী। গুরু ব্যতীত ভজন সাধন বৃথা। গুরুকে এঁরা সাঁই বলেন। এঁরা অরূপ খোদাকে রূপময় গুরুকে খোদারূপে ভজনা করেন। তিনি গুরুর প্রেমে মত্ত হয়ে নিজেকে প্রজ্জ্বলিত ও অমরত্ব লাভ করার কথা বলেন। যেমন–

কর মুর্শিদ ধরে সাদেকি প্রেম সাধনা।
ইশ্‌কে ইলাহী হাছিল কর যত মোমিন মোমিনা ॥
প্রেমেতে হয়ে মত্ত
চিত্ত কর প্রজ্জ্বলিত
লাভ কর অমরত্ব
জাত ছিফাতে হও ফানা ॥ [৫১]

কবির এই গানের সাথে যথাক্রমে লালন শাহ্ ও নেত্রকোনার প্রখ্যাত বাউল কবি জালাল খাঁর গানের সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় :

ক. ভজ মুর্শিদের কদম এই বেলা
ওগো যার পিয়ালা হৃৎকমলায়
ক্রমে হবে উজ্জ্বলা।[৫২]

খ. মানুষ ভজ কোরান খুঁজো, পাতায় পাতায় সাক্ষী আছে,
মানুষ থুইয়া খোদা ভজো, এ মন্ত্রণা কে দিয়াছে।[৫৩]

নিরঞ্জনকে খুঁজতে যেয়ে কবিকে মানুষ গুরুর সন্ধান করতে হয়েছে। সব মানুষের মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্ব নিহিত থাকলেও যাঁরা ধ্যান-ধারণা ও প্রেম সাধনায় নিজের মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারেন, তাঁরাই আসলে আল ইনসানুল কামেল বা পূর্ণ মানব। প্রকৃত পক্ষে স্রষ্টাই গুরুরূপে মানুষকে সাধন পথে পরিচালনা করেন। কবি বলেন–

মুর্শিদ আমার মানুষ নয়রে
সে দীনের কাঙ্গাল পরম দয়াল
মানুষ রূপে চলে ফিরে
যে তারে জেনেছে যেমন
তার কাছে সে দেখায় তেমন,
আমি দেখি খাছ নিরঞ্জন
ফেরেস্তার রূপে আমার ঘরে ॥
উম্মিগণে দীক্ষা দিতে
পাপী তাপী উদ্ধারিতে
তৌহিদের বাণী ঠোঁটে
মুছাফিরী বেশটি ধরে ॥ [৫৪]

লালন শাহের গানেও এর মিল পাওয়া যায়। মুর্শিদকে তিনি নবী ও খোদা বলে সম্বোধন করেছেন।

আপনি খোদা, আপনি নবী
আপনি সে আদম সফী
অনন্তরূপ করে ধারন
কে বোঝে তার নিরাকরণ

নিরাকার হাকিম নিরঞ্জন
মুর্শিদ রূপ ভজন পথে ॥[৫৫]

সুফিদের সাধনার ধারায় দেখা যায় কোন কোন সুফি কখনো কখনো নানাবিধ শরিয়তবিরোধী উক্তি করেছেন। এঁদের মধ্যে মনসুর হাল্লাজ, বায়জীদ বোস্তামী, ইবনুল ফরীদ, জালালুদ্দীন রূমী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। মনসুরের 'আনাল হক' (আমিই সত্য), ইবনুল ফরীদের 'আনাহিয়া' (আমিই সেই সুন্দরী নারী), বায়েজীদের 'সুবহানী' (আমিই পবিত্র) ইত্যাদি শরীয়ত বিরোধী উক্তি। তেমনি জালালুদ্দীন রূমীর 'আমিই মদ' এ উক্তিও সম্পূর্ণ শরিয়ত পরিপন্থী। তবে এঁরা শরীয়তের বিরুদ্ধে আত্মোপলব্ধিজাত সত্য প্রচার করলে ও শরীয়তের প্রতিকূল কোন আচার অনুষ্ঠানে যোগদান করেননি। তাছাড়া এঁরা কোন অভিনব আচার অনুষ্ঠানের সাধকও ছিলেন না।

মরমি কবি আবদুল খালেকের জীবন চরিত, ধর্মনীতি ও সাহিত্যভাবনা নিয়ে আলোচনা করলেও দেখা যায় যে, তিনি প্রথম থেকে এ পর্যন্ত শরীয়ত'কে অস্বীকার করেননি। তবে তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে শরিয়তের জ্ঞান যে নিতান্ত অপ্রতুল, তা তিনি বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ করেছেন তাঁর গানের অন্তরা উদ্ধৃত করলে বিষয়টি পরিস্কার হবে :

ক. লম্বা জামা দাড়ি টুপি তছবি আর চুলে
ঠক্‌ঠকা ঠক্ সেজদা দিলে খোদা কি ভুলে [৫৬]
খ. হেরা পর্বতের গুহায়,
মসজিদ ছেড়ে নুর নবী কোন ধ্যানে মগ্ন হয়, [৫৭]
গ. আদম কে চিনরে ইনসান
আদম কে চিনলে পরে মিলিবে খোদার সন্ধান ॥[৫৮]

আগে মানুষকে চিনতে হবে, নিজেকে চিনতে হবে তাহলে 'অধর মানুষ' বা খোদার সন্ধান মিলবে। কবি মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, মানবতার মাহাত্ম্য এবং জাতি ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে সব কিছুর উর্ধে স্থান দিয়েছেন। মানুষের কথা, জীবনের মূল্যবোধ এবং সর্বোপরি জগতের কল্যাণ চিন্তা আবদুল খালেকের সঙ্গীতে পাওয়া যায়। মানব দেহে অবস্থিত মক্কা মদিনায় আজও

পুণ্য হজ যাত্রীদের নিত্য হজ চলছে। দিল কাবার উপরে অবস্থিত আল্লাহর আরশে আজও আল্লাহ বারাম দিচ্ছেন বা অবস্থান করছেন। তাই এই দেলকাবা বড় মূল্যবান। কবি বলেন–

সহস্র 'কাবা' হতে একটি হৃদয় মূল্যবান।
খোদে খোদা 'হৃৎ কাবা'তে আছে বর্তমান ॥
কাদা মাটি ইষ্টক পাথর
ইব্রাহীমের বানানো ঘর
দেহ মক্কা আরব শহর
খোদা বিরাজমান ॥[৫৯]

কবির এই গানের সাথে যথাক্রমে ভবা পাগলা ও লালন শাহের গানের সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়:

ক. ও তুই মক্কা যাইবার করলি নারে নাম।
তোর দেহের মধ্যে আছে মক্কা,
কর নারে তারে হাজা'র সালাম ॥[৬০]

খ. আছে আদি মক্কা এই মানব দেহে
দেখ নারে মন চেয়ে।
দেশ দেশান্তর দৌড়ে এবার
মরিস কেন হাঁপিয়ে ॥[৬১]

মরমি কবি আবদুল খালেক একজন ভাব সাধক। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে সত্য শিহরণ তিনি অনুভব করেছেন, তার সত্যতা বিচারজ্ঞানে নয়, বুদ্ধিতে নয়, মেধায় নয়, প্রজ্ঞায় নয় বোধিতে। সীমার মধ্যে সীমাহীন অপরূপের মহিমা উপলব্ধি করতে গিয়ে তিনি কিছু প্রতীক ও কিছু অনুকরণীয় বিষয়কে সামনে রেখেছেন। এক অদ্বিতীয় উপাস্যকে স্বীকার করেও বোধিদৃষ্টিকে তাঁর সাথে একাত্ম হওয়ার উপায় বলে তিনি মেনে নিয়েছেন। এটি মূলত সুফিতত্ত্বের আদর্শ, যেখানে সব কিছুর নিয়ন্তা সেই অবাঙমানস গোচর প্রেমময় সত্তা, যাঁর নির্দেশ ব্যতীত এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই সংঘটিত হয় না।

অরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে ফুটিয়ে তুলতে হয়। কাব্যের ভূষণে রস যখন রূপ ধারন

করে, তখনই তা সত্যিকারের কবিতা। সকল কবির সৃষ্টি সম্পর্কেই এ কথা প্রযোজ্য। মরমি কবি আবদুল খালেকের কাব্যালোচনা করলেও রূপ জগতের বিশেষণ পরিলক্ষিত হয়। তিনি হলেন স্বভাব কবি ও ভাবুক। ভাষা ও ভাবের মনিকাঞ্চন-সমাবেশে তাঁর কাব্য পাঠক চিত্তে ভাব লহরী সৃষ্টি করে। তাঁর মরমি চিন্তায় উত্তম কবিত্বশক্তির বিকাশও লক্ষ্য করা যায়। তিনি মনের মানুষের সন্ধানে সারা জীবন সাধনা করছেন এবং ভক্ত মুরিদদের জন্য উপহার সরূপ লিখছেন তত্ত্বকাব্য ও ভাবসঙ্গীত।

কবিসৃষ্ট ভাষায় তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব সহজেই অনুভূত হয়। কবিতার ভাষাতে যা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনি, তা অনুমান করে নেবার অধিকার নেই কারো। যেটুকু বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে সেটুকুই কবিতা। যদি ভাষা অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ হয়, তবে বুঝতে হবে কবির প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই। লোককবি আবদুল খালেকের কাব্য প্রতিভা ও ভাষার প্রাঞ্জলতা এ দুটো বিষয়কে আশ্রয় করেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কবির বক্তব্য সহজেই বোঝা যায়। তিনি অনেক আরবি শব্দ ও প্রতীকী শব্দ ব্যবহার করেছেন। কবির রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। কবি বলেন–

দিন থাকিতে চিনে নাও'আপনজনা'।
আহমদের মিমের তালা খুলে ঘরে ঢুকনা ॥
আওয়ালে প্রেম ধনাগারে
জাত নিরাকার পরোয়ারে
মাহবুবের মহব্বতে দিওয়ানা।[৬২]

কবির সঙ্গীতে অনেক শব্দালংকার ও অর্থালংকারের ব্যবহার পরিলক্ষতি হয়। যেমন–

১. অনুপ্রাস
চরণ ধরি বিনয় করি, বল দয়াল আমার গতি কি?
আমি চরণ ভুলি পড়েছি গোলে, কখন কি যে হয়ে থাকি।[৬৩]

২. যমক
থাকি যদি বিছানায় আগুণ জ্বলে নিরালায়
জলে গেলে জ্বলে দ্বিগুণ এখন আমি দাড়াই কোথায়।[৬৪]

৩. শ্লেষ

মরার আগে জ্যান্ত মরা মর
মুর্শিদের ত্রি গুণানলে, [৬৫]

৪. উৎপ্রেক্ষা

হাউজে কাওসারের খবর জান মুসলমান।
সপ্তম আসমানের উর্ধ্বে একটি নহর প্রবাহমান ॥[৬৬]

৫. প্রতীক

তারে ধরবি যদি মনরে আমার
ফাঁদ পাত ত্রিবেণীর ঘাটে।[৬৭]

পরিশেষে বলা যায় আবদুল খালেকের সঙ্গীতে একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এক অসাধারণ ভাব বিকাশ। প্রথম শ্রেণীর কাব্যবিচারে দু'টি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রথমত, কবিহৃদয়ের গভীর অনুভূতি ও মননশীলতা। দ্বিতীয়ত হৃদয়ানুভূতি প্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ বা ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করার ক্ষমতা। আবদুল খালেকের হৃদয়ানুভুতি অত্যন্ত গভীর। এর সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশ অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত হয়ে কবির গান সার্থক সাহিত্য মর্যাদা লাভ করেছে। দেহ, মন, আত্মা ইত্যাদি অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির সাথে একান্তভাবে সমন্ধযুক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গীতে নতুন আবেদন সৃষ্টি করেছে।

৩. মোঃ ময়েজ উদ্দীন সা

নিরক্ষর ময়েজ সা অনেক গান রচনা করেছিলেন সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখার ব্যবস্থা করা হয়নি। অনুরাগী আত্মীয় বন্ধুরা তা মুখে মুখে জারি রেখেছিলেন অনেক দিন, তারপর স্বাভাবিক কারণেই সে গান হারিয়ে গেছে। কবির বড় ছেলে মজির উদ্দীন সা, মেয়ে ফুলজান বিবি, কবির নাতি সিদ্দিক সা ও জিল্লুর রহমান সা, এবং বাঘা শাহ্দৌলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক আলী মুহাঃ হাশেম, বাঘা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ওহিদুর রহমান, সলেমান সরকার ও বাউল মফিজসহ স্থানীয় সঙ্গীত শিল্পীদের নিকট থেকে ৪০টি সঙ্গীত সংগৃহীত হয়েছে।

গানের কণ্ঠ এবং রচনার স্বাভাবিকতা তাঁর এমনই ছিল যে তাঁর সর্বক্ষণের কথায় গানের রেশ পাওয়া যেত। তিনি ছিলেন সুরসিক এবং স্রষ্টা। অভাব দৈন্যের মাঝেও তাঁর মধ্যে ছিল একটি আনন্দময় চেতনা। কথায় কথায় মিল, কথায় গানে ব্যঙ্গ নিয়েই তাঁর সময় কাটতো। তাঁর অধিকাংশ গানে লক্ষ্য করা যায় তাঁর চারপাশে যা ঘটছে যে বেদনাময়, অমানবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে তারই সোজা সাপটা বাস্তব আলেখ্য। সে গানে আছে দুঃখী মানুষের কথা, মাটির মানুষের কাহিনী।

কবির 'কন্ট্রোলের গান'টি খুবই চিত্তাকর্ষক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হয়েছিল আকাশচুম্বী, দুর্ভিক্ষে অগুণতি মানুষ মারা গিয়েছিল। রেশনিং এবং কর্তন প্রথা মানুষকে আরও বিব্রত করেছিল। ময়েজ সা-র মত সরল সাদা মানুষ বুঝতে পারতেন না তেল-লবণ চিনি এতকাল মুদির দোকানে পাওয়া গেল এখন পাওয়া যায় না কেন ? বাড়ি বাড়ি মানুষ গুণে, রেশন কার্ড মারফত জিনিস পত্র দেওয়া হতো। ময়েজ বলেন :

বাড়ি বাড়ি মানুষ গুণি তেল লবণ কাপড় চিনি
যার যা লাগবে ভাংনি করে লিলো।
কাগজেতে লিখাইয়া নিজের নামটি সই করাইয়া
কাগজের নামে রেশন কাট পেলো।
বল কন্ট্রোলের আইন কেন হলো ?
ত্যাল লবণ আসে যখন রেশন কাট লিয়ে তখন
রুন্ট্রোলের দোকানে যেতে হলো

যা লেখা আছে রেশন কাটে বলে তা দিবেনা বটে
সারির গুনাক ধমকায়ে খ্যাদালো
বল, কন্ট্রোলের আইন কেন হলো ॥[৬৮]

প্রায় দেড়শত লাইনের এই গানে মানুষের দুঃখ দুর্দশা, বঞ্চনা, ক্ষুধা দারিদ্রের বেদনার্ত চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ, বিধবা এবং নারীদের ওপর শক্তিমানদের অবাঞ্ছিত আচরণ গানের মাঝে লক্ষ্য করা যায়। মেয়েদের প্রতি অপমানজনক ব্যবহার বেইজ্জতির সামিল।

জাতি ধর্ম বর্ণ যাই হোক প্রত্যেক মানুষ জন্ম এবং মৃত্যুর দ্বারা শাসিত। পৈতা দ্বারা মানুষের মহিমা নির্ণীত হয় না, তা হয় তার কর্মের দ্বারা। ব্রাহ্মণ পৈতা গলায় দিয়ে কাপড়ের নিচে আবৃত করে রাখে তাতে জাতের প্রমাণ হয় না। যারা প্রকৃত পক্ষে মানুষের কল্যাণ করে, ময়েজের মতে তাদেরই পৈতা পাওয়া উচিত, যেমন :

১. পৈতা পায় যদি লাপিত তবে কাজটা হতো ঠিক
কারণ—
শুদ্ধ কাজে লাপিত লাগে শব্দ করে দেয় কামা

২. পৈতা লিত যদি ঘোষ তাতে ছিল নাকো দোষ
কিষ্ট ঠাকুর নন্দ ঘোষের পুত্র যে পালক
তাকে পৈতা দিলে কোনইকালে মানের ক্ষতি হতো না।[৬৯]

ব্রাহ্মণ তার উচ্চবর্ণের সম্ভ্রান্তি জ্ঞাপনের জন্য পৈতা গলায় ধারণ করে। ভগবান শূদ্রকে জন্ম-সম্ভ্রান্তি দেয়নি তাই তারা পৈতা পায়নি। সক্রিয় বৈশ্য পেল পৈতে। এই তিন জাতি পৈতা ধারণ করছে অন্যরা তার অধিকারী নয়। পবিত্র সূতায় মঙ্গল প্রতীক আছে তা কার্যত সত্য হয় না, তাই কবি বলেছেন :

যারা লিয়াছে গলায় তারা মনে মনে কয়
যোগ্য সূতোর মাল্য নষ্ট করলাম কার কথায়
যারা লেয়নি গলে তারাই বলে তোদের সঙ্গে চলবোনা।
ভাব দেখে ভাবনায় বাঁচি না . . . .।[৭০]

'পৈতার গান' এবং 'তিলকের গান' এই দুই গানের পৈতাধারী এবং তিলকধারীদের বিরুদ্ধে ময়েজ বিদ্রূপ করেছেন। ধর্মের নামে যারা অধর্ম করে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে, তিলক আর পৈতা গ্রহণ করে যারা অসৎ কাজ করে তাদের বিরুদ্ধে কবির জিহ্বা খরশান। 'পৈতার গান' ময়েজের শ্রেষ্ঠ রচনা। এতে যেমন আছে হাস্যরস তেমনি আছে ব্যঙ্গ। যারা কপালে তিলক কেটে নারী লোভী হয়, অন্যের সম্পত্তি বেদখল করে তাদের স্বরূপ উম্মোচন কবির লক্ষ্য।

'জমিদার ইংরেজদের গান' নামক রচনায় কবি ইংরেজ জমিদারের কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিয়েছেন। দেশীয় জমিদারদের মত ইংরেজ জমিদারও এদেশে জমিদারি ব্যবসা করতো। তারা বাঙালি কর্মচারী দ্বারা দেশবাসীকে শাসন করতো। কবি বলেছেন :

গ্রামের প্রধান যেজন হয়, তাকে ভাল জমি দেয়,
ঐ মহলে আদায় করার হালসামা বানায়।
বাঙালি চাকরি পেয়ে খুশি হয়
বাঙালি দেশের খাতির করে না।
হায় বাঙালি আত্ম আজিত মানে না
হায় বাঙালি গরিব কাঙাল দেখে না।[৭১]

ইংরেজ কুঠিয়ালরা দেশীয় জমিদারদের চেয়ে কম কঠোর ছিল না। নদী-সিকস্তি জমি ইংরেজ জমিদার অধিকার করে নিয়ে নতুন প্রজার নিকট পত্তন দেয়। খাজনার তলব হলে দেরি সহ্য করে না, গরু খুলে নিয়ে যায়। বাঙালি কর্মচারীরাও দেশ বাসীর প্রতি সহানুভূতি করত না।

আছে গান্ধি মহাত্মা, ময়েজ উদ্দিন কি বলবে তার গুণের কথা
বাংলার লোকের জন্য তার কেঁদে যায় আত্মা
বাঙালির আত্মা এমনি কঠিন
বাঙালি তার জন্য কেউ কাঁদে না।[৭২]

'আমের গান' নামক গানে বাঘার স্থানীয় অর্থনৈতিক জীবনের পরিচয় আছে। বাঙালির জীবনে একদিন সুখের অভাব ছিল না কিন্তু এখন সে দিন নেই। গরিব দেশবাসীর অনাড়ম্বর জীবন যাত্রার কথা কবির গানে চিত্রায়িত হয়েছে। একদিন সুখ ছিল কিন্তু আজ তা বিদায় হয়েছে। কবি বলেছেন :

বাংলাতে বাঙালির সুখের অভাব ছিল না
এখন কর্ম ক্ষেত্র বুঝতে পারি বাম হইয়াছে রব্বানা।

চৈত্র বৈশাখে বৃষ্টি হতো বুনতো কুষ্টা ধান
পরে ছিটাতো কায়োন
আষাঢ় মাসে কায়োন হতো দেখো ধানের সঙ্গে মিশা খা'ত
কাঁঠাল রুটির পাইট খাটাত আম বেচে দিত খাজনা
বাম হইয়াছে রব্বানা।[৭৩]

প্রায় ৮০ লাইনের এ গানে গ্রামের কৃষক জীবনের সুখ-দুঃখের বিস্তারিত বিবরণ আছে। ধান-পাট ইত্যাদি ফসলের পর গুরুত্বপূর্ণ ফসল হচ্ছে আম-কাঁঠাল, লিচু এসব দেশি ফল, তবে এর মধ্যে আমের গুরুত্ব সর্বাধিক। বাঘার বড় বড় আড়তদার সেকালে আমের ব্যবসা করতেন। ময়েজের গান থেকে সেকালের দ্রব্যমূল্যেরও ধারণা পাওয়া যায় ১পণ বা ৮০ টা আম এক আনা বা দু আনায় পাওয়া যেত। রবিশস্যের উৎপাদন ভাল না হলে আম তাদের বিশেষ উপকারে আসে।

গ্রামীণ অর্থনীতির চূর্ণ উপাদান ময়েজের কোন কোন গানে পাওয়া যাবে দরিদ্র ভূমিহীন-কৃষকের জীবন ও কর্ম 'পাইটের গান' শীর্ষক রচনায় আছে। কবি বলেছেন :

চির দিনতো পাইটের ভাইরে চলিত দু'টো ভাও
তোমরা সব কাজে খাটাও
আষাঢ় মাসে ভূঁই লিড়াবে কুড়োগুলো রোজে যাবে
ছেলে বুড়া শুদ্ধ যাবে জুয়ানগুলো যাবে না।
জুয়ান পাইটের দল আলাদা ভূঁই লিড়ায়ে দেয়
গিরস্তে কয় হায় রব্বানা পাইটে লিড়ি লি যায় চৌদ্দ আনা
আমাদের বিস্তর দেনা, লাঙ্গল রাখতে পাবর না॥[৭৪]

গ্রামের কৃষক এবং দিন মজুরদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমস্যার পরিচয় আছে এই গানে। সমাজে সচারাচর ভূস্বামী বা বড়লোকরাই দরিদ্র শ্রেণীকে শোষণ করছে, পীড়ন করছে। অথচ ময়েজ সা যে চিত্র উপস্থাপন করছেন তা থেকে মনে হয় দরিদ্র দুর্বল শ্রেণী অপেক্ষাকৃত উচ্চতর শ্রেণীর ওপর অত্যাচার করছে, দিন মজুররাই ভূস্বামী কৃষকদের ওপর চাপ প্রয়োগ করছে। আসলে এ গানে শ্রেণী দ্বন্দ্বের ব্যাপারটি প্রকট হয়ে উঠেছে।

পাকিস্তান আন্দোলন এবং সাতচল্লিশের দেশভাগ ময়েজের মত লোককবির মনেও আলোড়ন জাগায়। দেশভাগ হয়ে হিন্দুস্তান, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষের কি অবস্থা হলো তা

ধরা পড়েছে তাঁর গানে। পাকিস্তানে হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্দশার কথা ময়েজ বাস্তবভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমরা পেলাম পাকিস্তান দেশের হিন্দুরা তামান
কখন বা কি ঘটায় বিধি ডরে কম্পমান
উরা মনে মনে জমি কিনে চলে যাচ্ছে হিন্দুস্তান।
শুনেন যত মুসলমান ভাগ্যগুণে পেলাম পাকিস্তান।[৭৫]

যারা বিষয় সম্পত্তি বিক্রি করে বিস্তর টাকাকড়ি নিয়ে হিন্দুস্তান চলে যাচ্ছে তাদের সম্পর্কে কবির তীব্র অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। দেশত্যাগ করে পরদেশে গিয়ে সুখ শান্তি এবং মান মর্যাদা থাকবে না, তাই ময়েজ বলেন :

তোমার টাকায় করবে কি ও নাম পড়বে রিফুজি
মিরগঞ্জের ঘাট পার হবে ভাই সোলজারকে ঘুস দি
তোমার মাথায় দেখছি ক্যাথার বুঝা
রিফুজি তো পড়বে নাম
ভাগ্যগুণে পেলাম পাকিস্তান ॥[৭৬]

এ গানটি তেষট্টি লাইনের। দেশ ভাগের পর পাকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায় জমিদার ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র বিক্রি করে ভারতে পাড়ি জমায়। কেউ কেউ বিছানাপত্র মাথায় করে রওয়ানা হয়। পুলিশ, সীমান্তরক্ষী ও সেনাবাহিনীর লোকজনকে ঘুস দিয়ে সীমান্ত পার হতে হয়। দেশ ত্যাগ করে ভারতে গিয়ে কিভাবে জীবনযাপন করবে সে সমস্যায় মানুষ সে দিন হয়েছিল দিশেহারা। ঘরবাড়ি বিক্রি করে যাবার সময় নানাস্থানে নানা প্রকার বখরা দিতে দিতে আশ্রয়হীন মানুষ নিঃস্ব হয়ে পড়ে। পুলিশ পাহারাদার ছাড়াও আছে ইজারাদার এবং টাউট বাটপার। ময়েজ ব্যঙ্গ করে বলেন :

ভাইরে চারঘাট হবে পার, দেখলে আজাহার সরকার,
সেইথি দেখো হল আবার ঘাটের ইজাদ্দার,
মানুষ হেটে যাবে পয়সা লিবে, রাখবে না সনমান ॥
ভাগ্যগুণে পেলাম পাকিস্তান।[৭৭]

ময়েজ সা-র গানে গ্রামের উপেক্ষিত জনসাধারণের ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমাজ চিন্তা মানব প্রেম ও মনুষত্ব বোধের পরিচয় আছে তাঁর গানে। তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে কবিমানসে ধর্ম-সমন্বয়, আচার সর্বস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধতা, মানব মহিমাবোধ, সাহিত্যবোধ, জাতিভেদ ও ছুঁৎমার্গের প্রতি ঘৃণা, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ইত্যাদি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

লোককবি ময়েজ সা-র কাব্যের সাহিত্যমূল্য উপেক্ষণীয় নয়। কবিভাষা, শব্দচয়ন, বাণী ভঙ্গি,অলংকার, ছন্দ, আঙ্গিক ইত্যাদি বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, কবি তাঁর কাব্য মধ্যে নিজের অন্তর সত্তাকে প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি তাঁর ব্যক্তি অনুভূতি-নিরপেক্ষ বস্তুসত্তাকেও প্রকাশ করেন।

বিষয়বস্তু যা-ই-হোক, সার্থক রূপসৃষ্টিই কবি কর্মের মূল কথা। রূপ নির্মাণের শিল্পসম্মত শক্তির উপরই নির্ভর করে বিষয়বস্তুর কাব্যিক বিকাশ ও কাব্য কুশলতা। বিষয় যেমনই হোক, কবির দর্শন শক্তি ও প্রদর্শন-ক্ষমতা যথাযোগ্য হওয়া আবশ্যক।[৭৮]

অনুভূতি প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে 'ভাষা'। চিন্তা ও কল্পনার সুষ্ঠু প্রকাশ ভাষার দ্বারাই সম্ভব। অঙ্গভঙ্গী বা অন্য কোন মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। এই ভাষার লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 'মানুষের উচ্চারিত অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা। এরই সাহায্যে একজন মানুষের স্পৃহা বা মনের উত্তেজনা অন্য আর একজন মানুষের কানের মধ্য দিয়ে মরমে প্রবেশ করিয়ে তার মনেও অনুরূপ স্পৃহা বা উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা যায়।[৭৯] কবির ভাষা এক্ষেত্রে আরো প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। কারণ কবিতার মাধ্যমে অন্যের হৃদয়ে রসানুভূতি সৃষ্টি করাই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য। কবির ভাষা তাই কুশলী ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ। এ ভাষা খানিকটা অসাধারণও বটে। সাধারণ বচন দ্বারা প্রকাশযোগ্য নয় বলেই মানুষের রসোদীপ্ত চিৎ-স্পন্দন অনির্বচনীয়। একটি শিল্পসম্মত অনুপম ভাষা ঐ অনির্বচনীয়কে বচনীয় করে তুলতে পারে।[৮০] কবির অন্তর্গূঢ় পরিচয়ও তাঁর বিশেষ ভাষার মধ্যেই নিহিত।

ময়েজ সা-র ভাষার প্রধান গুণ হচ্ছে প্রাঞ্জলতা। কবির রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর ভাষা-বৈশিষ্ট্য দেখানো যেতে পারে।

বাংলায় আগে ছিল নীল ও তার হতকি মুসকিল
না কাটিলে কানডলা আর ধরে লাগায় কিল।[৮১]

ময়েজ সা-র কাব্য পাঠ করলে ভাষার এই জীবন্ত রূপ নজরে পড়ে। গ্রাম দেশে ঝড় বাদল ও শীত গ্রীষ্মের প্রভাব উপেক্ষা করে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি জনসাধারণ গাঁতা করে

অদ্ভুত সুরে এ কাব্যরস আস্বাদনে আত্মমগ্ন থাকে। তাই বলা যায়, সাহিত্যের ভাষায় এত বড় গণতান্ত্রিকতার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর আছে কিনা সন্দেহ।[৮২]

শব্দ চয়নে লোককবি ময়েজ সা কৃতিত্বের দাবিদার। ধ্বনি সৌন্দর্য ও ছন্দের প্রবাহমানতা দিয়ে তিনি বাংলা লোকসঙ্গীতকে করেছেন তেজোদীপ্ত ও গতিময়।

'বানের গানে' লোকজ শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

কত গ্রাম ডুবায় বানে, গাঙ দি ভাসে যাচ্ছে ঘর
মানুষ থাকে গাছের পর
বকরী গরু গেল মরি চারেদিক সাঁতার।[৮৩]

'ইসলাম ধর্মের গানে' বাংলার সাথে আরবি শব্দের ব্যবহার রয়েছে।

কোরআনে লিখছে সোবহান যত আদমের সন্তান
আখেরী জামানায় ভাই-সব হইবে যবন
তোমরা থাকিতে জ্ঞান হও সাবধান ॥[৮৪]

'কন্ট্রলের গানে' বাংলার সাথে ইংরেজি শব্দের সমন্বয় দেখা যায়। কবি বলেন–

ফুড কমিটির সেক্রেটারীর গুণের কথা বলবো কি,
ডিলারের সাথে যোগ দিল ডিলারেতে ভাগ করে লিলো
কাপড় আইলো আশি জোড়া এবার পাবে বিধবারা
তোমাদের সব ফিরে যাওয়াই ভালো ॥[৮৫]

'অব্যবসিকের গানে' আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার রয়েছে–

খরিদ করছে জোয়ারে, জবাই করে বাড়িতে
ধামা ভরে লিয়ে যায় ভাগা দেয় হাটে
মানুষ সস্তা যা পায় সক্কলি খায়
লোকতো ভাল মন্দ দেখে না গো হায়
বকরির ভরন ব্যারাম চিনেনা।[৮৬]

ময়েজ সা-র গানের শব্দাবলি গ্রামীণ এবং গ্রাম্য একটি বিশেষ এলাকার আঞ্চলিক। রাজশাহী জেলার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের একটি নির্দিষ্ট এলাকা যেমন বাঘা চারঘাট লালপুর থানা। স্থানীয় শব্দ এবং বাক্য ব্যবহারের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় গান গুলো থেকে অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

১. বিশেষ্য ল-র ব্যবহার
লাক<নাক, লা–নৌকা, লাপিত–নাপিত, লারায়ণপুর–নারায়ণপুর

২. বিশেষণ ব্যবহারের রূপ
দুইপর <দ্বিপ্রহর, লষ্ট–নষ্ট, (লষ্টমি–নষ্ট মেয়ে), ইদিক–এই দিক, (ই–এই), খস্য–খুশি।

৩. সর্বনামের বিশেষত্ব
উরা [>উহারা> ওরা], উ (>ও), উয়ার (< উহার) –ওরা, তা–তাই।

৪. ক্রিয়া পদে ন স্থলে ল-র ব্যবহার
লিয়ে যায়> নিয়ে যায়, লিচ্ছে> নিয়ে যাচ্ছে, ল্যঅয়> নয়।

৫. ক্রিয়ার অন্যরকম ব্যবহার
থুয়া (থুলো) – রাখা, ঝুড়া–কাটা, থয়–রাখে।

৬. আঞ্চলিক শব্দ
লিমন্দে–নিঃসন্দে, ভাংনি–চাঁদা, বগল বাজায়–খুশি হয়, থিনে–হতে, ম্যালা–অনেক, বিছন–বীজ, হরবন্দী–নানা রকম ইত্যাদি।

৭. বিদেশী শব্দ
পেট্রোল পার্টি–পাহারা দল, পজিশন–সম্মান, ফিট–অজ্ঞান, আয়মাদার–জমিদার, সভ্রান্ত, মি–মিয়া।

৮. তৎসম শব্দের ব্যবহার (পাকিস্তানের গানে)
ভাইরে বানেশ্বর হাটে বহুধান চাল জোটে
পূর্বদেশের ঐগাড়ি ঘোড়া আর মাথা মুটে
উরা রেশন কার্ড লিচ্ছে বটে এক গাড়ি দুই মন ধান।[৮৭]

৯. অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার (সাবেক বাঘার গানে)
গোষ্ট খুব করছে কষ্ট দিচ্ছে জমি জঙ্গল মেরে
লাঙ্গল গাড়ি আছে বাড়ি, দুই লাঙ্গল আবাদ করে।[৮৮]

বিস্তর আঞ্চলিক শব্দ ময়েজ সা-র গানে স্থান লাভ করেছে। ব্যবহৃত শতাধিক গ্রাম্য, ব্যাকরণের নানা শৃংখলায় ফেলে গবেষক এ সব শব্দের শ্রেণী বিন্যাস করতে পারবেন। বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া ও সর্বনাম পদে শব্দের ব্যবহার ব্যাকরণের বৈচিত্র্য সাধন করবে। উল্লেখিত আঞ্চলিক শব্দগুলো দেশের অন্য অঞ্চলেও মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভাব, ভাষা, বাণীভঙ্গী, অলংকার ইত্যাদি বিশ্লেষণ করেও আমরা ময়েজের সঙ্গীতের সাহিত্যিক আবেদন লক্ষ্য করেছি। শব্দ ব্যবহারের চারুত্ব, বিষয় বস্তুর বিন্যাস ক্ষমতা, পাঠকের মনে কৌতূহল সৃষ্টির কলানৈপুণ্য ইত্যাদি ময়েজ সা-কে যে পর্যায়ে উন্নীত করেছে, তাতে অনায়াসে বলা যায় যে, ময়েজ সঙ্গীত বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

৪. মুহাঃ কলিম উদ্দীন মিঞা

দেহের নানা লীলাবিহারী পরমাত্মার সন্ধান করেছেন কবি মুহাঃ কলিম উদ্দীন মিঞা। তিনি সাধনার ক্ষেত্রে অতি সূক্ষ্ম দৈহিক লতিফাগুলোর বিকাশের প্রয়োজন মনে করেছেন। সেগুলোর বিকাশের জন্য মুর্শিদের কৃপা আবশ্যক। কবি কলিম উদ্দীন বলেন—

ঐ যুগল চরণ সাধন সিদ্ধির মূল
ভবে মুর্শিদ সদয় হলে।
ওসে মনের ময়লা সাফ করিয়া
        দিলের আয়না দেয় খুলে ॥
যে কইরাছে গুরুর সাধন
পেয়েছে সে অমূল্য ধন
ওসে ধনের ধনী গুণমণি
        খেলে খোদার খাসমহল ॥[৮৯]

কবির এই গানের সাথে কবি পাগলা কানাই, বাউল কবি ফুলবাস উদ্দীন ও নেত্রকোণার বাউল কবি জালাল খাঁর গানের সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

ক. পাগলা কানাই বলে ও মন বাসনা
গুরুর চরণ কর সাধনা
শমন জ্বালার ভয় রবে না, ভয় রবেনা, [৯০]

খ. অপারের কাণ্ডারী গুরু তুমি পারের কর্ণধার ॥
গুরু তোমার নামে নৌকা গড়ে, আমি হেলায় সাগর যাব তরে ॥
তাতে যদি মোর নৌকা ডুবে গো, নামে কলঙ্ক রবে তোমার[৯১]

গ. ভক্তি আর বিশ্বাসের বলে এই ভূমিতে বীজ বুনিলে
গুরু গোসাইর কৃপা হলে সহজেতেই ফলবে সোনা ॥[৯২]

সাধক কবি কলিম উদ্দীন গুরুবাদে বিশ্বাসী। গুরুকে তিনি সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। মানব গুরুর প্রতি ভক্তি না থাকলে সর্বগুরু আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ লাভ করা যায় না। মানব গুরু আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি। যে সাধন পথে আল্লাহকে পাওয়ার আশায় সাধন করেন, সে পথ দুর্গম, কন্টকাকীর্ণ, অন্ধকারে আচ্ছন্ন পা পিছলে একবার পড়ে গেলে চির অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে যেতে হবে। এইজন্য প্রয়োজন গুরুর। গুরু সুপথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন মনজিল মকসুদে। কবি বলেন—

বড় কষ্টসাধ্যে আল্লাহ মিলে
বড় কষ্টসাধ্যে রাসুল মিলে।

তাঁরে ধরতে যদি না পার মন
এ জনম যাবে বিফলে ॥[৯৩]

গুরুকে কেন্দ্রকরেই কবির সব সাধনা। কিন্তু এই গুরু কৃপা লাভ সহজ নয়। তাঁর কৃপা ভিন্ন তাঁকে লাভ করা যায় না। এই গুরু আপনার হৃদয়েই অবস্থান করেন। সাধন পথে তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁকে পেতে হলে আগে নিজেকে জানতে হবে, নিজেকে ফানা করতে হবে। কবি বলেন–

আগে আপনি ফানা নিজকে জানা
তার পরে তো হয় মন উপাসনা
তবে কেন সাধু ভেদ না জেনে
শুধু মিছে শিরেক কর ॥
যেমন আমাবস্যায় চাঁদের আলো কভু দেখা যায় না
তেমন পাপ কালিমার আঁধার ঘরে হয় না তো সাধনা।[৯৪]

সাধক কবির মতে মানবজনম সহজসাধ্য নয়। এ জীবনের কর্মফলের উপর নির্ভর করে পারলৌকিক জীবনের পুরস্কার। কবি পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। এ জীবনের সমাপ্তির পর সমস্ত কার্যকলাপের একদিন চূড়ান্ত হিসাব হবে। তারপর ভালমন্দের বিচারে শান্তিময় বা অশান্তিময় জীবন নিয়ে আবার আসতে হবে। তবে মানব জনম বড় দুর্লভ। কবি বলেন–

ভবে মানব জনম সোনার জনম
এ জনম আর হবে না,
তুমি আত্মাতে পরমাত্মার মন
করবে যোগ সাধনা ॥[৯৫]

এই মানব জনম সম্পর্কে লালন শাহ বলেন–

এমন মানব-জনম আর কি হবে।
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে ॥
অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই,
শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই,[৯৬]

আর দুদ্দু শাহ বলেন–

জনম দুর্লভ অতি ভাই
এমন জনম আর কি পাই[৯৭]

স্রষ্টা সব রকম জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে মানুষকে খলিফার মর্যাদা দিয়ে পাঠিয়েছেন এই লীলাভূমিতে। মানুষ এবাদতের দ্বারা ফেরেস্তার চাইতেও বেশী সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারে। তাই মানুষ আল্লাহর বন্ধু। এই মানুষকে বাদ দিয়ে জাত আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব প্রকাশ ও

বিকাশ কল্পনা করা যায় না। জাত আল্লাহপাক প্রেমের বশবর্তী হয়ে জগত ও মানুষকে সৃষ্টি করেন। তাইতো আরবি ভাষায় মানুষকে বলা হয় ইনসান। 'উন্‌স' শব্দ থেকে আগত ইনসান। 'উন্‌স' শব্দের অর্থ হলো প্রেম ভালবাসা, মানুষ পরস্পর একে অপরকে ভালবাসবে। নারী ও পুরুষের প্রেম ভালবাসায় সার্থক ও সুন্দর করে গড়ে তুলবে এই পৃথিবী। মানবীয়, মহীয়ান শক্তির সাধনা দ্বারা মাটির মানুষ নিজেকে 'আশরাফুল মখলুকাত' (সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ) বলে প্রমাণ করতে পারে। দেহতত্ত্বের আদর্শে বিশ্বাসী কবি বলেন, নিগূঢ় দেহ সাধনার মাধ্যমে পরমাত্মাকে পাওয়া সম্ভব।

মরমি কবি কলিম উদ্দীনের সঙ্গীত, জীবন চরিত ও ধর্মনীতি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি শরীয়তকে কখনও অস্বীকার করেননি। শরীয়তের চেয়ে তত্ত্ব জ্ঞানের প্রাধান্য দিয়েছেন। কবি বলেন–

তুমি যতই হও মন টাইটেল ধারী
ভবে আলেম ফাজেল হাফেজক্বারী
তবু হবেনা হায় মোকাম জারী
　　কামেল পীর স্মরণ বিনা ॥[৯৮]

কবি পল্লীগীতি, ভাওয়াইয়া, দেশের গান, আধুনিক গান, মুর্শিদি ও মারফতি বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করেছেন। ১৯৮৬ সনে ৪০টি গানের সমন্বয়ে 'গীতি বিচিত্রা' নামে তাঁর একটি সঙ্গীত সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। কবি কলিম উদ্দীন তাঁর আবাসভূমি 'বাঘা' অঞ্চলের আউলিয়াদের স্মৃতি বিজরিত ঐতিহাসিক পটভূমি তাঁর সঙ্গীতে তুলে ধরেছেন। কবি বলেন–

তোরা দেখে যারে পদ্মা তীরে
　　বাঘাতে এসে একবার
শাহ আব্বাস, শেরে আলী, হামিদ
　　শাহদৌলার মাজার ॥
হেথা আছেরে ভাই শাহী মসজিদ
　　অপূর্ব তার কারুকাজ,
নিপুন হাতে গড়া সেতো
　　নানা রংয়ের নানা সাজ,
ও তার পুর্বদিকে প্রকাণ্ড দিঘি
　　চৌদিকে শোভা ভাণ্ডার ॥
বাঘায় বিয়াল্লিশ মৌজার ভূমিদান
　　করেছিলেন শাহজাহান
গৌড় বাদশা নূসরত শাহর

মসজিদ দিঘির নির্মাণ
সবিতো ভাই আউলিয়াদের
সবইতো গুণ প্রকাশের হয় কারবার ॥[৯৯]

করিব সঙ্গীত পর্যালোচনা করে দেখা যায় তাঁর গানে তত্ত্ব কথার পাশা পাশি সমকালীন সমাজ এবং দেশকালের চিত্রও পাওয়া যায়। গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরেছেন মনে প্রাণে তাঁর সঙ্গীতে।

মরমি কবি কলিম উদ্দীনের গানের তত্ত্বমূল্য যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে তার সাহিত্যমূল্য। জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতাকে এবং আধ্যাত্মিক সাধনালব্ধ জ্ঞানকে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন– তা অলংকারে বিভূষিত। নিসর্গ, দৈনন্দিন জীবন, দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত দ্রব্য সামগ্রী, তেমনি আর ও অনেক উপাদানে নির্মাণ করেছেন তাঁর তত্ত্ব প্রাধান সঙ্গীত সম্ভার।

তিনি তাঁর কাব্যে ভাব, ভাষা, ছন্দ ও অলংকার ব্যবহারে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ব্যবহৃত অলংকার সমূহের পরিচয় উদাহরণসহ দেয়া হল।

১. অনুপ্রাস
হায়রে মনের ক্ষেদে বেড়াই কেঁদে ভাসিয়ে নয়ন জলে ॥
ঐ যুগল চরণ সাধন সিদ্ধির মূল, ভবে মুর্শিদ সদয় হলে।[১০০]

২. যমক
সে আরাম বিরাম হারাম করে করিলে সাধন
কামেল পীরে দিবে তারে অমূল্য রতন[১০১]

৩. উপমা
যত গাওস কুতুব পীর আউলিয়া
থাকেন ঐ রূপেতে বিভোর হইয়া।[১০২]

৪. সাপেক্ষ সর্বনাম
আবার সেই ননী, ঘি হয় তখনি
যখনি তাপ দেয় অনলে[১০৩]

৫. নির্ধারক বিশেষণ
এই গুন্ গুন্ গুন্ গুঞ্জরনে
ফাগুন এলো ঐ বনে বনে
আশার স্বপন দোলে দুই নয়নে।[১০৪]

পরিশেষে বলা যায় কলিম উদ্দীনের গানে বিচিত্র চিন্তার জন্ম হয়েছে। তাঁর ভাটিয়ালী ও অন্যান্য গানে নদী, মাটি ও মানুষের কথা বিধৃত হয়েছে। গানগুলি মানে ও গুণে এমনি বৈশিষ্ট্য ধারণ করে যা একজন সাধকের অন্তরের উপলব্ধি থেকেই জাত, সমধর্মী লোকসঙ্গীত থেকে তাকে সহজেই আলাদাভাবে চেনা যায়।

৫. হযরত খাজা মহসিন আলী আল চিশতি

গুরু বা মুর্শিদ এ জগতে পরম সম্পদ। ভগবানই গুরু রূপে শিষ্যকে সাধন পথে পরিচালিত করেন। ভগবানই আমাদের বন্ধু ও পথ প্রদর্শক। সেই নিরঞ্জন নিরাকার হাকিম খোদা মুর্শিদ রূপে সাধন পথে মানুষকে পরিচালিত করছেন। এই ধারনায় বিশ্বাসী মরমি কবি হযরত খাজা মহসিন আলী আল চিশতি। কবি বলেন–

আদমি হলে যায়রে ভবে আদমকে চিনা,
চিনবি যদি আল্লা আদম, শ্রীরূপে হও গা ফানা ॥

আল্লা আদম না হইলে, পাপ হইত সেজদা দিলে,
দেখরে মন চক্ষু খুলে গোপন রাব্বানা ॥[১০৫]

কবির এই গানের সাথে পর্যায়ক্রমে বাউল কবি ফুলবাস, জহরশাহ, দুদ্দু শাহ ও লালন শাহ এর গানের সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন–

ক. আল্লা আদম মাহমুদা এ তিন কভু নয় জুদা
আত্মারূপে আছে খোদা, [১০৬]

খ. সে আল্লা নবী আদম ছবি তিন জনে সে গাছে
খেলা করে।[১০৭]

গ. মানুষ আকার ধরে
খোদ খোদা যে ঘোরে ফেরে[১০৮]

ঘ. আপন সুরাতে আদম গড়লেন দয়াময়।
নইলে কি আর ফিরিশতারে সিজদা দিতে কয় ॥[১০৯]

সাধক কবি গুরুবাদে বিশ্বাসী। মানব গুরুর প্রতি ভক্তি নিষ্ঠা না হলে পরমাত্মার অনুগ্রহ হয় না। শিষ্যের সাধনা পরিপূর্ণ হলে গুরু প্রকৃতি-পুরুষ ঘটিত যোগ সাধনার সময় স্বয়ং উপস্থিত থেকে কখন কিরূপে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া করতে হবে, কখন কোন লতিফা বন্ধ করতে হবে, কোন লতিফা মুক্ত রাখতে হবে, বিভিন্ন অনুভূতিতে কি কি করণীয় প্রভৃতি অতি গুহ্য বিষয়ের উপদেশ দেন। দমের সাধনার মাধ্যমে সেই অচিন পাখি বা পরমাত্মাকে লাভ করা যায়। কবি বলেন–

অচিন পাখি ধরবি যদি, দমের সাধন কর,
দেহের মাঝে আট কুঠরা, দেখো মহল থরে থর।

হাওয়াতে যে উঠে বসে চুপকরে রয় কালার বেশে,
কালাকে সাধলে বাঁচবি শেষে, বুঝো কেবা আপন পর।[১১০]

কবির এ গানের সাথে লালন শাহ্ ও ফুলবাসের গানের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।

ক. ধর চোর হাওয়ার ঘরে ফাঁদ পেতে
সে কি সামান্য চোরা, ধরবি কোণা-কান্‌ছিতে ॥[১১১]

খ. দমেতে দম মিশায়ে দম ধরে টান গা বসে।
টানতে টানতে পারবে জানতে, অধর চাঁদ সে পড়বে খসে।[১১২]

কেবল ভোগমূলক কামের কারবার না করে দেহের উর্ধ্বগত স্বরূপ তত্ত্ব অবলম্বন করে প্রেমের সাধনা করতে হবে। কাম রিপুকে জয় করে এই স্বরূপতত্ত্বে সূক্ষ্ম, অপ্রাকৃত, দেহোত্তীর্ণ প্রেমের ক্ষেত্রে উঠে আসতে হবে। কবির সাধনা কামের মধ্য হতে প্রেমকে নিষ্কাশন করা, কামের বিষ নাশ করে প্রেমের অমৃত লাভ করা। তাই দেহ ভোগের ক্ষেত্রে কামের সঙ্গে একটা গুরুতর যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনা রয়েছে। এই সাধনসমরে সাধকের যুদ্ধাস্ত্র অতি শক্তিশালী ও অব্যর্থ হওয়া প্রয়োজন, না হলে অতো বড় ভীষণ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় অনিবার্য। সেই সমরক্ষেত্রে বিজয়ী হতে হলে নবীর তরিক ধরতে হবে। কবি মহসিন আলী বলেন–

না ধরিলে নবীর তরিক ভব পারের উপায় নাই
ধর তরিক বান্ধো নিরিখ থাকবে না আর কোন ভয়

ভবো নদীর তুফান ভারী ধারা চিনে ধর পাড়ি
করতে গেলে মাঝিগিরি নিরিখ রেখো সুধারায় ॥

যখন নদীর তুফান দেখে, মাঝি যারা সজাগ থাকে
মরে না তারা পলেও পাকে, ঢেউ কাটিয়ে চলে যায়।[১১৩]

কবির সাধনার বস্তু 'গুরুতত্ত্ব'। গুরুতত্ত্ব বলতে আসল গুরু বা পরম তত্ত্ব বা ভগবান অর্থাৎ অন্তরাত্মার কথা বলেন, তাঁর স্বরূপই গুরুতত্ত্ব। এই স্বরূপ বলতে, এই স্বরূপের তিনটি অংশ আছে, একটি ভোক্তা শক্তিমান বা পুরুষরূপে, আর একটি শক্তিভোগ্যা বা প্রকৃতি রূপে, অপরটি উভয়ের মিলিত একটি মহানন্দ-শিহরিত অনির্বচনীয় সম্মিলিত অদ্বয় অবস্থারূপে। দুইটি সত্তার মিলনের দ্বারা এই অনির্বচনীয় তৃতীয় অবস্থা লাভই তাঁদের মূল সাধনা। সাধনার মাধ্যমে মুর্শিদের রূপে যে সত্যিকার আত্মসমর্পণ করেছে, তাঁর কাছেই সাঁই বা পরমাত্মা বিরাজমান। কবি বলেন–

ক. মুর্শিদ রূপে যে মজেছে, সাঁই বিরাজমান তারই কাছে,
মনছুর যেমন হক নাম ধরে, হক নামেই হল ফানা ॥
মহসিন তাই কয় কান্দিয়া, রইলি কেন নিজকে ভুলিয়া,
দেখনা মন উতলিয়া, মায়ারূপ সাঁই রাব্বানা ॥[১১৪]

খ. নকশা যাহার নাইকো দেলে, নামাজ তাহার যায় বিফলে,
দেখনা মন কুরান খুলে, আকিমুচ্ছালাত কয়।
নামাজেতে হইলে খাড়া, মন বেড়ায় যে পাড়াপাড়া,
পীর মুর্শিদের কদম ছাড়া নকশাতুমি নাহি পাবা ॥[১১৫]

সাধক মানব গুরুকে পরম সত্তা বা ভগবানের একটা রূপ বলে ধারনা করেছেন। কিন্তু আসল গুরু বা মুর্শিদ বলতে পরম সত্তাকেই বুঝিয়েছেন।

কবি মহসিন আলীর মতে মানব জীবন ও মানব দেহ অমূল্য। মানুষই পরম সত্তার প্রতিনিধি এবং তাহার মধ্যেই বিশ্ব প্রতিবিম্বিত। মানবই ঈশ্বরের পূর্ণ পরিণতি এবং ভগবানের সমগ্রস্বরূপ ও গুণাবলীর পূর্ণ অভিব্যক্তি। ঈশ্বরপূর্ণ মানবত্বের দ্বারই মানুষ নিজেকে জানতে পারে। এই 'আল-ইনসান উল-কামেল' বা পূর্ণমানবই ক্ষুদ্র জগৎ। এরই মধ্যে সৃষ্টির প্রাকৃতিক শক্তি বা ঐশ্বরিক শক্তির পূর্ণ প্রতিবিম্বন হয়েছে। মানব দেহেই ব্রহ্মাণ্ড বর্তমান। মানবদেহের যে ঘর, এই ঘরের বাইরে খুঁজলে তাঁকে পাওয়া যাবে না। কবি বলেন–

নিরঞ্জন গোপনের গোপন
ঘর ছাড়া বাইরে খুঁজলে পাবিনা তার দর্শন ॥
বানাইয়া রংমহল সদয় করে চলাচল,
পাখি রূপে ঘুরে ফিরে ধরবি কিসে বল
ঘরের বস্তু খুঁজলে ঘরে মিলবেরে রতন ॥[১১৬]

মহসিনের এই গানের সঙ্গে লালন শাহের গানের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। লালন শাহ বলেন–

না জেনে ঘরের খবর তাকাও কেন আসমানে।
চাঁদ রয়েছে চাঁদের কোলে ঈশান কোণে ॥
খুঁজলে আপন ঘরখানা
তুমি পাবে সকল ঠিকানা।
স্বর্গ চন্দ্র দেহ চন্দ্র হয়
তাতে ভিন্ন কিছু নয়।
এ চাঁদ ধরিলে সে চাঁদ মিলে,
ফকির লালন কয় নিরঞ্জনে ॥[১১৭]

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। এই মানব দেহের অভ্যন্তরে খোদা লুকায়িত আছে। খোদার সন্ধান পেতে হলে, মানুষকেই ভজন করতে হবে, তবেই খোদার দিদার পাওয়া যাবে। কবি মহসিন আলী বলেন—

মানুষ ভজ হও পবিত্র, ঠিকরাখিও জ্ঞান নয়ন
ভজো মানুষের চরণ
মানুষ তত্ত্ব না জানিলে সাধন ভজন অকারণ ॥
মানুষ ভজন করল যারা, খোদার দিদার পাইল তারা
মানুষই হয় সৃষ্টির সেরা, সবার উপর হয় আসন ॥
মানুষ কভু নয়বে খোদা, খোদা ছাড়া নয়রে জুদা
মহসিন ভেবে বলে মানুষেতে খোদা মিলে
পড়ে থাকো চরণ তলে সিদ্ধি হবে সাধন ভজন ॥[১১৮]

কবির এগানের সাথে লালন শাহ, দুদ্দু শাহ ও ফুলবাসের গানের সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

ক. মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি
মানুষ ছেড়ে ক্ষ্যাপারে তুই মূল হারাবি।[১১৯]

খ. মানুষ ভজনের কথা জানাই তোরে
যাহাতে অমর হবি যম যাতনা যাবে দূরে ॥[১২০]

গ. মানুষ রতন কর যতন, নর মানে সেই নারায়ণ ॥
এই চৌদ্দ ভুবন খুঁজে পেয়েছে কোনজন, [১২১]

মানুষের মুক্তির পথই হল মানব সেবা। মানব ভজন বা গুরু ভজনের মাধ্যমে মানুষের আত্মা মুক্তি পাবে, খোদার দিদার লাভ করবে। কবি একজন আধ্যাত্মিক সাধক। আধ্যাত্মিক সাধনাকে জীবন ও জগতের মুক্তির একমাত্র উপায় বলে ভেবেছেন। প্রচলিত ধর্মের আচার অনুষ্ঠানকে পরিহার করে একটি স্বতন্ত্র মতাদর্শের মাধ্যমে স্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়াই কবির সাধনার লক্ষ্য।

মহসিন আলী চিশ্‌তি একজন প্রতিভাবান কবি। তাঁর রচিত গানগুলিতে আপামর জন-সাধারণের হৃদয়ের কথা ধরা পড়েছে। তাঁর সঙ্গীত মধুর সুরে গীত হলে সকলেই মোহিত হয়। ভাষার সরলতা, সুরের মাধুর্য এবং আধ্যাত্মিকতাই এর প্রধান কারণ। তিনি সঙ্গীতে শব্দালংকার ও অর্থালংকার ব্যবহার করে সঙ্গীতকে মাধুর্যপূর্ণ করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত অলংকার উদাহরণসহ দেখানো হলো।

১. অনুপ্রাস

মহসিন কেন্দে বলে সাধের জনম যায় বিফলে
মুর্শিদ পদে না ডুবিলে, মানব জনম যায় বিফলে ॥[১২২]

২. যমক

এক মনের দুইটি ধারা সুজনকুজন দেয় পাহারা,
সুজনেরই ভাবুক যারা, তারাই হবে মরণ হারা ॥[১২৩]

৩. শ্লেষ

যে মরিবে ভাবের মরা, কামের ঘরে তার তালামারা
আইনাতে লাগায়ে পারা, গুরুরূপে মিশে রয় ॥[১২৪]

৪. রূপক

অচিন পাখি ধরবি যদি দমের সাধন কর,
দেহের মাঝে আটকুঠরা, দেখো মহল থরেথর। [১২৫]

মহসিন আলীর মারফতি ও মুর্শিদি গানে মানবতত্ত্ব ও দেহতত্ত্বের কথা বিধৃত হয়েছে।

৬. হযরত খাজা খোরশেদ আলী চিশ্‌তি

যে সাহিত্যে সাহিত্য-সাধক জীবনের তথ্যঘটিত যথাযথ বর্ণনা দ্বারা একরূপ জড়বাদের পূজা না করে, জগত ও জীবনের তথ্য ও সত্যকে উচ্চতর কল্পনার আলোকে উদ্ভাসিত করে দেখেন এবং এর অপার রহস্যের চিন্ময় মূর্তি পাঠকের গোচর করেন, তাকেই ভাবতান্ত্রিক সাহিত্য বলা হয়।[১২৬]

ভাবতান্ত্রিক সঙ্গীত রচনা করে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন কবি খোরশেদ আলী। তাঁর গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একটি পরিচ্ছন্ন সাধনার মর্ম কথা রূপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গানগুলোর মাধ্যমে। এ সাধনা দেহকে কেন্দ্র করে। মানব দেহ নশ্বর এবং ধ্বংসশীল। সাধনার দ্বারা এই ধ্বংসশীল দেহের ভিত্তিতে অবিনশ্বর ও স্থায়ী ইমারত তৈরী করা যায়। এটিই খোরশেদ আলীর সঙ্গীতের মূলসুর। আপাত দৃষ্টিতে এ দেহ তুচ্ছ বস্তু বলে মনে হলেও কার্যত তার মূল্য অপরিসীম। সাধকের উক্তিতে তা জানা যায়।

তোয়াফ কর মন কাবাখানা যার কারিগর সাঁই রাব্বানা
মানব জনম সফল হইবে পূর্ণ হবে মনস্কামনা ॥

কাবাকে পাষাণ ভেবনা কেবলা জান সর্বক্ষণ
ফল্গু নদীর উপরে শুকনা নিচে নহর বইছে অনুক্ষণ
করবে মন ভজন সাধন কেবলা কাবায় করে নিশানা ॥

১৪ ভুবনের নকশা আঁটা ঘরের বিচিত্র গঠন
১৮ হাজার আলমে করে ব্যবসা আচরণ
শুক সারি গাইছে সদা কারিগরের বন্দনা ॥

ভক্তের আশা পুরাইতে কাবার হইল পত্তন
খুশি হলে কাবাকুলে বিরাজ করেন নিরঞ্জন
ঘরের মাঝে আসওয়াদ পাথর, চুমা দিলে পাপ থাকেনা ॥[১২৭]

মক্কা নবীর জন্ম ভূমি ও মক্কায় কাবাঘর রয়েছে বলে মুসলিম জাতির কাছে মক্কা নগরী অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। মক্কা নগরীর মত মানবদেহ নগরীও সাধকের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। কারণ এই দেহ সাধনার দ্বারাই সাধককে সাধনায় উত্তীর্ণ হতে হয়। তাই মানবদেহ কুদরতীময়। লালন শাহ বলেন—

মানুষ মক্কা কুদরতীময়,
হচ্ছে গায়বী আওয়াজ সেথায়
সাততালা ভেদিয়ে।[১২৮]

মক্কায় অবস্থিত আসওয়াদ পাথর চুমা দিলে যেমন গুণাহ মাফ হয়, তেমনি মানব দেহে এমন স্থান আছে সেখানে চুমা দিলে অনুরূপ পাপ মোছন হয়। তাই দেহের মধ্যেই মক্কা আছে এ কথা ভবা পাগলা বলেন :

ও তুই মক্কা যাইবার করলি নারে নাম
তোর দেহের মধ্যে আছে মক্কা,
করনারে তার হাজার ছালাম ॥[১২৯]

মরমি কবি খোরশেদ আলীর সাধনা হচ্ছে জীবন সাধনা। যোগপন্থা তাঁর সাধনার অন্যতম শাখা। সাধক দেহ মধ্যে কতকগুলি মোকাম ঠিক করে নিয়েছেন। বাউলেরা এগুলোকে বলেন ষটচক্র। মুসলমান যোগীরা বা দরবেশগণ এর নাম দিয়েছেন 'ছয় লতিফা' সাধনাটি আসলে কঠোর আত্মসংযমের। কবি খোরশেদ আলী বলেন—

দম কলেতে শুমার ধরে দেখনা মানুষ নীরের ঘরে
মতির খাটে আসন পেতে দিচ্ছে কিরণ ভুবন জুড়ে ॥
অটল গতি ধনকুবের খাড়া প্রহরী আছে দ্বারে
রতি পতি না হইলে সেথা যেতে নাহি পারে ॥

উপর তালায় কোট কাচারী নিচ তালাতে রায় প্রচারে
মধ্য তালায় কাম আচারী এনাম দেয় রূপ নজরে ॥
বরন নিতি শুন্যে ঝুলে ফকির দরবেশ দেখতে পারে
মক্কায় গিয়ে ধাক্কা খেয়ে কত হাজি যায়রে মরে ॥
কুল ধর্ম মর্ম স্থলে খোঁজ পাক মাদানী শহরে
হাওয়া করে আসা যাওয়া স্বরূপ দেখায় হৃৎমন্দিরে ॥[১৩০]

লক্ষ্যণীয় বিষয় খোরশেদ আলী মানুষকে সকলের উপরে স্থান দিয়েছেন। কবির মতে মানব দেহই সাধকের প্রধান সাধানার বিষয়। মানুষের মাঝে সেই স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে, কবি খোরশেদ আলী তাকেই খুঁজে পেতে চেয়েছেন। কবি বলেন—

এই দেহে বিদেহ আছে দেখলে জনম সফল হয়
গুরু রঞ্জন লাগাও নয়নে নুরীতন সামনে পাবে ॥

সেতো রুপের খনি সর্ব যিনি পাপিয়ার পরান বল্লভ
দেখিলে মহুয়া মুখ দূ'রেতে যাইবে দুখ কামনা পুরবে ॥

হাহুতে ঘন্টা বাজিল মলকুতে সাড়া পড়িল সময় ফুরাল
পর করণা ঘরের মানুষ কোন সময় ফেলে যাবে ॥[১৩১]

আমাদের দেহ রাজ্যে প্রাণপাখি বা মালেক সাঁই বিরাজ করছে। পাখি এই হৃৎপিঞ্জরে বসে মধুর সুরে কথা বলে। কোথায় তাঁর আসন এ সম্পর্কে পাগলা কানাই বলেন—

পাগলা কানাই বলছে দেহ মাঝে মালেক সাঁই
ও নদীর চার রঙের আসে পানি
কোন জায়গায় তার সাক্ষাৎ হায়রে
আমার এই দেহ নদী।[১৩২]

আর বাউল কবি ফুলবাস বলেন—

মাবুদ মওজুদ আল্লা এই দেহে রয়
তার সঙ্গে নাই দেখা শোনা থেকে এক জায়গায় ॥
এই দেহের মালিক রব্বানা
কোন মোকাম তাঁর বারাম খানা
কি বস্তু কি আকার তাহার কর তার নির্ণয় ॥[১৩৩]

কবি দীন শরৎ এই প্রাণ পাখির পরিচয় দিলেন দেহের কারিগর বলে। যেমন—

ওই ঘরে আছে রে মন তোর ঘরের কারিগর।
ঘরে হাড়ের ঠুনী চামড়ার ছানি
জুইৎ গাঁথুনী কি সুন্দর।[১৩৪]

আর পাঞ্জুশাহ বলেন—

খঁজে কি আর পাবি সে অধরা, সে নয়ন তারা ॥
এই মানুষে মিশে আছে, গোপীর মন চোরা ॥
লীলা সাঙ্গ করে গোরা
স্বরূপেতে মিশে আছে
মায়া পাশরা ॥
স্বরূপ-রূপ বসে মিশে রসে হয়ে ভোরা ॥[১৩৫]

মরমিকবি খোরশেদ আলীর সঙ্গীত চর্চা ছিল ব্যাপক এবং নিষ্ঠাগত। তাঁর রচনায় প্রতিভার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে মনে হয়, তিনি মুরিদদের মধ্যে মজলিসে যে তত্ত্বের আলোচনা করেছেন, সে তত্ত্ব বিষয়ক গান রচনা করেছেন। তাঁর গানগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আল্লা তত্ত্ব, রাসুল তত্ত্ব, মুর্শিদ তত্ত্ব, ও পারাপার তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় তার গানে স্থান পেয়েছে।

কবি খোরশেদ আলীর গানের তত্ত্বমূল্য যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে তার সাহিত্যমূল্য। জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতাকে এবং আধ্যাত্মিক সাধনালব্ধ জ্ঞানের বিষয়ের প্রকাশ ঘটিয়েছেন আলংকারিক ভাষায়। নিসর্গ, দৈনন্দিন জীবন, মানব দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তেমনি আরও অনেক উপাদানে নির্মাণ করেছেন তাঁর তত্ত্বপ্রধান গানের আঙ্গিক। তাঁর সঙ্গীতে ভাব, ভাষা, ছন্দ ও অলংকার ব্যবহারে বেশ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে কবির ব্যবহৃত বিভিন্ন অলংকারের উদাহরণ দেয়া হল–

১. অনুপ্রাস

যদিও মোর জীর্ণতরী পাপে তাপে বোঝাই ভারি, তবু ধরিলাম পাড়ি
ঘোর তূফানে ভয় করিনা খাজা হও যদি সহায়কারী ॥[১৩৬]

২. যমক

মৃদুল বায়ে বাজে বাঁশী ইসরাঈলের নাকে ফাঁসি
মসী নাশি উজল শশী প্রতীপ্তমান আঙ্গিনায় ॥[১৩৭]

৩. শ্লেষ

মরার আগে যে মরেছে জিন্দা মরা তারে কয়
মরগারে মরার আগে দেখবি যদি অমর কায় ॥[১৩৮]

পরিশেষে বলা যায় খোরশেদ আলীর সঙ্গীতের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর অপূর্ব গীতিময়তা। তাঁর প্রতিটি সঙ্গীতে তিনি নিজেই সুর সংযোজন করেছেন। তাঁর সারা জীবনের সাধনার ফসল এই সঙ্গীতগুলো। তিনি সুরের মাধুর্যে এ গুলোকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন। শিল্পীকণ্ঠে গীত হয়ে এ সব সঙ্গীত একটা ভাবের প্লাবন সৃষ্টি করে। উদাসী মাটির সুর শ্রোতাকে অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে নিয়ে যায়।

৭. মোঃ আব্দুল আলিম ফকির

পল্লীবাসীদের জীবন স্বভাবতই সহজ ও সরল। তাঁরা গান গায় সরল কথার গাঁথুনি দিয়ে অতি সহজ সুরে। এই সহজ সরল হাসি কান্না এবং ব্যথা-বেদনার জীবন্ত ছবিই গান। লোককবি আব্দুল আলিম ফকিরের সহজ সরল বাংলা ভাষায় লেখা জারী, সারী, পল্লীগীতি, মারফতি, মুর্শিদী, দেশাত্মবোধক, আধুনিক, ভাওইয়া ও গম্ভীরা গানের সংখ্যা প্রায় পাঁচশ।

২০০৪ সনের জুন মাসে আলিম ফকিরের ১৫৫টি গানের সমন্বয়ে 'আলিম গীতি' নামে একটি সঙ্গীত সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। কবি সংকনটি উৎসর্গ করেছেন তাঁর পিতা মরহুম কসিমুদ্দিন ফকির, মাতা মরহুম ময়মন বিবি, ওস্তাদ আঃ মান্নান, হরিপদ দাস, এ. কে. আঃ আজিজ ও আঃ জব্বারের নামে।

রাজশাহী জেলার বিভিন্ন থানা যেমন– তানোর, মোহনপুর ও চারঘাটের আঞ্চলিক পরিচিতি কবির গানে লক্ষ্য করা যায়। কবি বলেন–

তানোর থানার জমির ধান
মোহনপুরের বরের পান
বাটা ভরা সুপারি আছে গো বন্ধু
খাইয়া যাও পান ॥

মোহনপুরের কেশর হাটে
ধনে মহুরি চুন যাউন আছে
মৌগাছির হাটে বন্ধু
সস্তা দামে মিলবে পান ॥

চারঘাটের চারকোণা খরে
খাইলে সবার মন ভরে
আমজাদ পাতি জরদা বন্ধু
রাজশাহী থেকে এনে দেন
তানোর থানার জমির ধান।[১৩৯]

পান সেবনকারী ও ব্যবসায়ীদের কবি আকৃষ্ট করার জন্য জানালেন মৌগাছির হাটে সস্তা দামে পাওয়া যাবে পান, মহুরি ও যাউন পাওয়া যাবে কেশর হাটে। মুখ রঙিন করা খর পাওয়া যাবে চারঘাট থানায়। এবং সুস্বাদু ও সুঘ্রানের আমজাদ পাতি মিষ্টি জরদা পাওয়া যাবে রাজশাহীতে।

কবি টম্‌টম্‌ বা ঘোড়ার গাড়ির চালক ও আরোহীর মুখের বুলি ব্যবহার করে 'আমপুরা' বা রাজশাহী অঞ্চলের বর্ণনা দিয়েছেন। কবি বলেন--

খট্‌ খট্‌ খট্‌ খট্‌ শব্দ করে
চলে টম্‌টম্‌ গাড়ি
আমপুরা শহরে গেলে আসুন তাড়াতাড়ি
ভাইরে রাজশাহী বাজারত গেলে, আসুন
তাড়াতাড়ি ভাই আসুন তাড়াতাড়ি ॥
নওহাটাতে চরলাম গাড়িতে
রেলগেটে নামবে সোয়ারি
সেখান থেকে ভারা পাইলে যাব গোদাগাড়ি
কাঁঠাল বাইড়া, আলুপট্টি সামনে মাসকাটা দীঘি
সেখান থেকে ভাড়া পাইলে
যাব পারিলা খড়খড়ি ॥
ধোপাঘাটা দাওকান্দি
পান কিনি ভাই গাদির গাদি
বড় গাছির হাটে গিয়ে ফিরবো সবে বাড়ি।[১৪০]

এই গান থেকে রাজশাহী অঞ্চলের ঘোড়ারগাড়ি চলাচলের রুট সম্পর্কে জানা যায়। এবং উল্লেখযোগ্য স্থান যেমন নওহাটা, গোদাগাড়ি, কাঁঠাল বাইড়া, আলুপট্টি, মাসকাটা দীঘি, পারিলা খড়খড়ি, ধোপাঘাটা ও দাওকান্দির পরিচয় পরিলক্ষিত হয়।

তানোর থানার সরনজাই গ্রামের আহমদ আলী ওরফে পঁচার স্ত্রী জয়গন বিবি কবির ছোট বোন। জয়গনের মেয়ের নাম তারা। তাই সে সবার কাছে তারার মা বলে পরিচিত। অসময়ে জয়গন বিবির স্বামী মারা যাওয়ার পর বাড়ি বাড়ি ধান ভেনে বহু কষ্টে টাকা জমা করে। একমন ধান ভানলে মজুরী পায় পাঁচ সিকা। এইভাবে ষাট টাকা জোগাড় করে একটি গরু কিনেছে। জয়গন আপ্রাণ চেষ্টা করেছে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য, সুখের নাগাল পাওয়ার জন্য। কিন্তু সুখ পাখি তার ভাগ্যে জোটেনি। কিছু দিন পরে ব্যারাম হয়ে বহুকষ্টে কেনা গরুটি মারা গেছে। সেই অভাগী জয়গনের জীবনের করুণ কাহিনী কবি তাঁর সঙ্গীতে তুলে ধরেছেন। কবি বলেন--

তারার মা বারা বানে ঢেকিত পাড় দিয়া
পাঁচ সিকা মন ধান বানিয়া ষাইট টাকা জমাইয়া
মনের হাউসে তারার মা গরু কিনিছে
হঠাৎ করি ব্যারাম হইয়া গরুটা মরি গেলছে ॥[১৪১]

কবি আব্দুল আলিম অত্যন্ত প্রাণ খোলা মানুষ। পেশায় কৃষক নেশায় গায়ক। অভাব-তাড়িত তাঁর সংসার, কিন্তু তাঁর বাড়িতে গিয়ে আমরা দেখেছি, কোথাও এতটুকু হা-হুতাশ নেই। ছেলে মেয়েরাও শিল্পী হয়ে উঠেছে। বলা যায় গান তাঁদের রক্তে মিশে আছে।

আলিম ফকিরের সঙ্গীতে ব্যবহৃত কয়েকটি অলংকার উদ্ধৃত করা হলো। যেমন—

১. অনুপ্রাস
পদ্মার ধারে বোলন পুরে আমার বন্ধুর গাঁও,
দুঃখের কথা কইও তারে দেখা যদি পাও।[১৪২]

২. শ্লেষ
মরার আগে নিজে মরলে
দূর হয় তার যাতনা, [১৪৩]

৩. নির্ধারক বিশেষণ
মন প্রাণ তোমার তরে
সঁপে দিলাম আশা করে
জনম জনম ভরে দেখে রেখ তুমি [১৪৪]

৪. সাপেক্ষ সর্বনাম
যে বন হইতে আইসা ছিলি
সে বনে তুই চইলা গেলি [১৪৫]

পরিশেষে বলা যায় যে, কবি সঙ্গীত ও সুর সৃষ্টি করে জনগণকে মহৎ ও সুন্দর করার নিরন্তর চেষ্টা করেন। তাঁর গানগুলো মধুর সুরে গীত হলে সকলেই মোহিত হয়।

৮. হযরত খাজা শাহ্ খলিলুর রহ্মান চিশতি

জীবনের জটিলতার গভীর গহ্বরে যে গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে, তিনি তাঁর সঙ্গীতে তা সন্ধান করেছেন। খলিল শাহের গানে মরমিয়া সাধনার সাথে সাথে জীবনের অন্যান্য দিকও প্রতিবিম্বিত হয়েছে। ধর্মীয় বিভিন্ন মতবাদ তাঁর গানে প্রাণশক্তি পেয়েছে বলা যায়। তাঁর গানে জীবন বন্দনাও লক্ষণীয়। ভাব সাধক বলেই জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ তাঁর গানে অনুভব করা যায়।

কবি খলিল শাহ প্রায় ৩০টি গ্রন্থ লিখেছেন। ২০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট গ্রন্থগুলো প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'তৌহিদের আলো' (১৯৯৯) অন্যতম। ৮৪ পৃষ্ঠার এ বইটিতে ৯১টি সঙ্গীত ও কবিতা স্থান পেয়েছে। কবি মুর্শিদতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব ও নামাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করেছেন। আল্লাহকে দর্শন করতে হলে, তাকে পেতে হলে, প্রত্যেক কাজে প্রত্যেক কথায় এবং প্রতি নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে তাঁকে স্মরণ করতে হবে। সত্য পথ অবলম্বন করতে হবে এবং পীর ধরতে হবে। অন্যথায় পথের সন্ধান পাওয়া যাবে না। অদৃশ্যকে দৃশ্যমান করতে হলে, অদৃশ্য শক্তিকে ধরতে হলে, কামেল গুরু প্রয়োজন। তাঁরা জানেন এই অদৃশ্যকে কিভাবে দৃশ্যমান করতে হয়। এই অদৃশ্য শক্তি কি? তারা ভালভাবে জানেন যে আমাদের সাথে এই অদৃশ্য শক্তির কি যোগসূত্র এবং কি পার্থক্য? যতদিন না মানুষ সৃষ্টির রহস্য জ্ঞান একজন কামেল পীরের নিকট অর্জন না করতে পারবে তত দিন সে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হতে পারবে না। কবি বলেন কেতাবের ভিতরে আল্লাহকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আল্লাহকে পেতে হলে মানুষের মাঝে খুঁজতে হবে। কবি তাঁর সঙ্গীতে বলেন—

ক. যদি মানুষ হতে চাও, মানুষ চিনিয়া মানুষ ধর,
মানুষ সেবিয়া মানুষ ভজিয়া মানুষ ধারণ কর।[১৪৬]

খ. যেথায় মুর্শিদ সেথায় খোদা
বসত করে এক সাথে।[১৪৭]

গ. যেথায় বান্দা সেথায় খোদা
খোদাকে চিনেছে কয়জন
যে বান্দার ধ্যানে খোদায় চিনে
সে হয় অমর নাহি হয় মরণ[১৪৮]

খলিল শাহের এই গানগুলো লালন শাহ্, মদন, ও ফুলবাসের গানের সাথে তুলিত হতে পারে। যেমন—

ক. যেহি মুর্শিদ, সেহি তো রসূল
তাহাতে নাই কোনো ভুল
এ কথা লেখে দলিলেতে
মুর্শিদ খুদা ভাবলে জুদা
তুই পড়বি পেঁচে ॥[১৪৯]

খ. মনের মানুষ এই মানুষে আছে, লও চিনে
তারে দেখরে মন, জ্ঞান নয়নে।
রসিক যারা, জানবে তারা
অরসিকে জানবে কেনে ॥[১৫০]

গ. মানব শহরে বসত সেই করে, খুলে তালা দেখবি আল্লা পাবি 'অধরে'
দেখবি তোরা রূপ চেহারা, প্রেমের বাতি দেও জেলে ॥[১৫১]

মানুষের ভেতরেই যে মানুষ রতন রয়েছে, সাধনার দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে সেই যে পরম পুরুষ আছে, তার অনুভূতিময় একটি সত্তা আছে। সেই সত্তাকে ধরার জন্য মুর্শিদের আশ্রয় নিতে হয়। মুর্শিদই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ শিক্ষক যাঁর অনুসরণ ব্যতীত বিশ্বপ্রভুর সান্নিধ্য লাভ সম্ভব নয়। মুর্শিদের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে সর্বশক্তিমানের প্রসন্নতা লাভের জন্যে যা কিছু অপরিহার্য, ভক্তি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর হৃদয়ে সৃষ্ট এ ভক্তির স্থিতি মানব দেহে। প্রকৃতপক্ষে মানবদেহই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার বারামখানা।

আল্লাহ পাকের ইচ্ছা শক্তির মাধ্যমে বিশ্বে সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে। বহু শক্তির সমাহার রয়েছে আদমের মাঝে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে জ্ঞান শক্তি, পরিবর্তন শক্তি ও ইচ্ছা শক্তি। আল্লাহ পাক আদমের মাঝে থেকে, ত্রিশক্তিকে নিজের মধ্যে নিহিত রেখে সদা সর্বদা কাজ করে যাচ্ছেন। আসল কথা হলো আল্লাহ পাক জাহের হবার জন্যই আদমকে নিজ সুরাতে তৈরি করে প্রকাশ করলেন। পৃথিবীর সব পদার্থ মানব দেহের মধ্যে দিয়ে মানব আত্মাকে কার্যকরী করা হলো। আমরা জানি 'যা আছে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে মানব ভাণ্ডে'। এর প্রকৃত রহস্য কি ইহার রহস্য অনুসন্ধান করতে হলে আদমের মাধ্যমেই করতে হবে। আদমকে চিনতে হবে। অপর দিকে আল্লাহকে পেতে হলে এই আদমের মাধ্যমেই পেতে হবে। সেই অদৃশ্য আল্লাহ পাককে পেতে

হলে কোন পথে যেতে হবে? সেই পথ হলো নিজেকে জানা ও চেনার পথ। আর এই জানা ও চেনার পথ হলো আদম তত্ত্ব ও আদম রহস্যের উদঘাটন করা। এই সব তত্ত্ব কথাই হলো মারেফতের কথা, তাসাউফের কথা। এই তত্ত্ব কথায় পাওয়া যাবে স্রষ্টার সঠিক স্বরূপ।

খোদা তায়ালা তাঁর খোদায়িত্ব প্রকাশ করার জন্যই মানুষকে তাঁর নিজের সুরাতে সৃষ্টি করেছেন। কবি বলেন–

ক. আমি বুঝেছি খোদা মক্কর তোমার,
নিজ রূপ প্রকাশিতে কর আদম তৈয়ার।
আপন সুরাত পরে বানায়ে আদম তরে,
নিজ রুহু তার উপরে করিলে ফুৎকার
আমার আসনে তুমি, তোমারে চিনেছি আমি, [১৫২]

খ. নিজ সুবাতে আল্লাহ মানব গড়েছে
আপনার হতে রুহু কালেবে দিয়েছে
নফসের সাথে আছে মিশে আগে নফসের খবর কর।[১৫৩]

স্বয়ং স্রষ্টাই মানুষের আকৃতিতে, মানুষের মাঝে লুকায়িত অবস্থায় আপন শক্তিতেই খেলা করছে। প্রেম ও ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়ে এই মানব দেহের মহাআত্মাকে ধরতে হবে। কবি মানব অস্তিত্বকে পুণ্যতীর্থ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মানুষই স্রষ্টার প্রধান রূপরেখা, স্রষ্টার নিগূঢ় রহস্যের কেন্দ্র বিন্দু। দেহ সাধানার মাধ্যমেই সাঁই বা নিরঞ্জনের সাক্ষাৎ মিলবে।[১৫৪]

খলিল শাহ এর উল্লেখযোগ্য রচনার পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

আদম তত্ত্ব (১৯৮৮) : "আমি মানুষকে উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি" আল্‌কোরান। স্রষ্টা ও সৃষ্টির রহস্য সূক্ষ্ম কথার মধ্যে নিহিত। আত্মা ও মনের খোরাক সংগ্রহ করতে হলে স্রষ্টা ও সৃষ্টির রহস্য অনুধাবন করতে হবে। আর এই রহস্যের উদ্‌ঘাটন করতে হলে জানতে হবে আদম তত্ত্ব। আদম তত্ত্ব না জানলে খোদার তত্ত্ব জানা হবে না। আল্লাহ ও আদমকে জানার বিষয়সমূহ এ রচনায় আলোচিত হয়েছে।

বাউল বনাম সুফিবাদ (১৯৯৯) : সুফি ও বাউল উভয়ই ভিন্ন আদর্শের অনুসারী। কারণ সুফিদর্শনের উৎস হচ্ছে পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ কোরান মজিদ ও হাদিস শরীফ। বাউলেরা লালনের গানের অনুসরণ করে থাকে। বাউল ও সুফিবাদের মধ্যে পার্থক্য লেখক এ বইতে তুলে ধরেছেন।

জীবন জিজ্ঞাসা (২০০১) : মানুষ কোথা হতে এসেছে, আবার যাবে কোথায়, কে তাকে সৃষ্টি করেছে। স্রষ্টার সাথে তার কি সম্পর্ক, ইসলাম কি, মুসলামান কে, রসূলকে, রসূলের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক কতটুকু ? শরিয়ত, তরিকত, হকিকত, মারেফাত কি এবং কেন? কোরান অধ্বংসী কেন, কাবা কি এবং কেন, আদম হাওয়া এবং গন্দম কি ? একটির সাথে অন্যটির সম্পর্ক, পার্থক্য কতটুকু ? এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে "জীবন জিজ্ঞাসা" গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

বৈচিত্র্যময় প্রেম (২০০০) : সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানবদেহ কত যে বৈচিত্র্যময় ও অসীম কৌশলের আঁধার খলিল শাহ 'বৈচিত্র্যময় প্রেম' বইটিতে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। মানবের আকৃতি প্রকৃতি ও পরিণতি সবকিছুই স্রষ্টার এক অপূর্ব, মহিমান্বিত ও তুলনাহীন বিজ্ঞান। আপাতত দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের কাছে স্রষ্টা অসীম, দূরের ও দূর্জয় হলেও লেখক তাঁর অভিজ্ঞতা ও আত্মপোলব্ধি দ্বারা বুঝিয়েছেন যে মানবই স্রষ্টার প্রতিরূপ। মানবের মাধ্যমেই মহামানবের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

মারেফাত দর্পণ (২০০০) : স্রষ্টা ও সৃষ্টির সমস্ত গোপন রহস্য জানার জন্য কি কি মারেফতের জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। এই বইটিতে সে বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

অন্তর জগতের গোপন রহস্য (২০০০) : মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য উদঘাটন এবং অন্তর জগতের গোপন রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে দুর্বোধ্য মন ও মননশীলতার মত একটি বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপস্থাপনা করেছেন।

ইসলাম ও আধ্যাত্ম দর্শন (১৯৮৮) : ইসলামী সংস্কৃতির উৎস কোথায়, এর প্রয়োজন কতটুকু। আল্লাহর অস্তিত্ব, পরকাল, নুর কি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা রয়েছে এই বইটিতে।

দয়াল বন্ধুর সংলাপ : দয়াল বন্ধুর সংলাপ ১ম খণ্ড (১৯৯৭), ২য় খণ্ড (১৯৯৮) ও ৩য় খণ্ড (১৯৯৭) এই তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। মুসলিম সমাজ আজ অজ্ঞতায় ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত। আকিদা, বিশ্বাস, তাহজিব, তামাদ্দুন সম্পর্কে আলোচনা এবং আধ্যাত্মিক জীবন দর্শন থেকে বিচ্যুত মুসলিমকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন দয়াল বন্ধুর সংলাপে। এছাড়াও খলিল শাহের এশ্‌কে এলাহী বা মিররাতুল আশেকীন, অন্তর জগতের গোপন রহস্য, ইসলামের আলোকে সঙ্গীত, মরমি কবি সুফি সাধক মনসুর শাহ, তোহ্‌ফাতুল মো'মেনীন, আমলে তরিকত বা রত্ন ভাণ্ডার, ফকির খলিল শাহ্‌ এর পত্রাবলী, সুরা ফাতেহার তত্ত্ব দর্শন তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। [১৫৫]

সাধক কবি দেহতত্ত্বের আদর্শে বিশ্বাসী। তিনি দেহ সন্ধান করে দেহাতীত সত্য আবিষ্কার করেছেন বিভিন্ন মোকাম মঞ্জিলের মাধ্যমে। মোকাম মঞ্জিল ছাড়াও খলিল শাহ এর রচনায় ছয় লতিফা, বারো বুরোজ, চার বরজোখ, চার ফেরেস্তা, ছয় রিপু প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। এগুলো থেকে শুধু তত্ত্ব নয়, মানবীয় মহীয়ান শক্তির সাধন দ্বারা মাটির মানুষ নিজেকে 'আশরাফুল মখলুকাত' বলে প্রমাণ করতে পারে। দেহতত্ত্বের আদর্শে বিশ্বাসী এই কবি তাঁর কাব্যে নিগূঢ় দেহ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন সরস ভাষা ও সহজ রীতিতে।

অরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তা কে ফুটিয়ে তুলতে হয়। কাব্যের ভুবনে রস যখন রূপ ধারণ করে, তখনই তা হয় সত্যিকারের কবিতা। সকল কবির সৃষ্টি সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য। এই সব ক্ষেত্রে খলির শাহ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতাকে এবং আধ্যাত্মিক সাধনালব্ধ জ্ঞানকে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি যে ভাব, ভাষা, ব্যবহার করেছেন– তা অলংকারে বিভূষিত। কবির ভাষার প্রধান গুণ প্রাঞ্জলতা। কবি তাঁর সঙ্গীতে তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের ব্যবহার করেছেন। তাঁর সঙ্গীতে ব্যবহৃত কয়েকটি অলংকার উদাহরণসহ উল্লেখ করা হল :

১. সাপেক্ষ সর্বনাম
যে যেমন জেনেছে তারে
সে দেখায় তেমন তাহারে[১৫৬]

২. সুভাষণ
ছাড় হিংসা নিন্দা গিবত গিল্লা,
সর্ব প্রথমে চিন রাসূলুল্লাহ।[১৫৭]

৩. দূরাবৃত্তির
যদি মানুষ হতে চাও, মানুষ চিনিয়া মানুষ ধর,
মানুষ সেবিয়া মানুষ ভজিয়া মানুষ ধারণ কর।[১৫৮]

পরিশেষে বলা যায় সাধক কবি হযরত খাজা শাহ খলিলুর রহমান চিশ্‌তির সঙ্গীতে শব্দ চয়ন ও ছন্দ চাতুর্যে দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়। কবি প্রায়শই অনুপ্রাস অলংকার ব্যবহার করেছেন। প্রত্যেকটি চরণের শেষেই শুধু নয়, মাঝেও বহু মিল দিয়ে ছন্দকে গতিশীল ও হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছেন।

৯. মোঃ আজগর আলী ভাণ্ডারী

সাহিত্যে মানুষের মর্মলোকের স্বরূপ বিধৃত থাকে, মানুষের অন্তরসত্তার পরিচায়করূপে একে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। আর মানুষের মননে ও আচরণে স্থানিক ও কালিক ছাপ অনপনেয় বলে যে কোন ঐতিহ্য মানুষের প্রেরণার মাতৃকা, কর্মের দিশারী ও মর্মের পরিচায়ক।

মানুষের মনে জগত ও জীবন সৃষ্টির রহস্য এবং জগত ও জীবনের মহিমা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সমন্ধে যে চিরন্তন ও সর্বজনীন জিজ্ঞাসা রয়েছে তারই জবাব খোঁজা হয়েছে ধর্ম ও অধ্যাত্ম জীবন সম্পর্কিত রচনায়। কবি আজগর আলী ভাণ্ডারী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নন, সেজন্য তাঁর গানে মানবতাবাদ ও জীবনবাদের পূর্ণ বিকাশ থাকবে স্বাভাবিকভাবেই তা আশা করবার কথা নয়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, উচ্চ শিক্ষার আলোক বঞ্চিত কবি আজগর ভাণ্ডারী তাঁর সারা জীবনের সঙ্গীত সাধনায় শুধু মানুষের কথাই বললেন। তাঁর গানের মূল বিষয়বস্তু মানুষ, মানুষের দেহ। কবি বলেন—

কাম পাহাড়ে ধাক্কা লেগে মণিলাল পাথর চুয়ায়,
উপর তলার রত্নমণি, বিন্দুরূপে ভেসে যায় ॥
মণি পুরের পেলে সন্ধান, প্রেমিকের কপালে প্রমাণ
মাসে একদিন করে সে দান, শুধু সৃষ্টি রক্ষার দায় ॥[১৫৯]

মানব দেহের মাঝে লীলাবিহারী সাঁই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপে দেহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। সাধকের সাধনার মাধ্যমে তাঁর দর্শন মেলে। দেহতত্ত্বের গভীর কথা কবি তাঁর সঙ্গীতের মধ্যে তুলে ধরেছেন। কামকেন্দ্রই কামের প্রধান আবাস। এই আবাস বড় জটিল। মূলাধারকেন্দ্র হতেই কামের জন্ম হয়। এবং মগজে তা লালিত পালিত হয়। এই কামেই জীবনের আদিম পত্তন। কাম ব্যতিরেকে জীবনী শক্তির সূচনা হতে পারে না। কামই পরিশোধিত আকারে প্রেম-ভক্তি স্নেহ-ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়। আর এই প্রেম ভালবাসার মাঝ দিয়েই সাঁইয়ের আগমন।

সাধনার ক্ষেত্রে সাধক কবি আজগর ভাণ্ডারী নারীকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। নারী তথা বামাচারী সাধনায় সাফল্য লাভ করতে পারলে মৃত্যুকে জয় করা যায় এবং এ সাধনায় পরাজিত হলে তাঁর ধ্বংস অবধারিত। কবি বলেন—

মেয়ে রূপী কালসাপেনী জগৎ খেয়ে চেয়ে রয়
যত আছে মায়ের বংশ অন্য শক্তির অর্ধঅংশ
তার কাছে সবাই ধ্বংস, ধনী কাঙাল যত রয় ॥
ফুল ফোটে যার বার মাস, তাতে হয় শক্তির বিকাশ,
তার চরণে হইয়া দাস, মধু খায় যে মৃত্যুঞ্জয় ॥
উথলিয়া লোহিত সাগর, তিন দিন ভাসে নহর,
মানুষ গড়া ছাঁচের ভিতর নতুন মানুষ জন্ম হয় ॥[১৬০]

কবির মতে সাধক কাম-বীজ ও কাম গায়ত্রী জপ ও যুগলমূর্তি ধ্যান করে মদনানুভূতি উত্তেজিত করে যোগক্রিয়ার পদ্ধতি অনুসারে সেই অনুভূতিকে সুষুম্না-পথে উর্ধ্বগামী করে। নিজ দেহাভ্যন্তরে যে পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তি আছে, সেই উভয় শক্তির মিলনের ফলে আনন্দানুভূতিই সাধকের কাম্য। এই অনুভূতিকে 'আজ্ঞাচক্রে' 'দ্বিদল' পর্যন্ত উর্ধ্বগামী করলে সেখানে উভয় শক্তির মিলনজাত যে আনন্দ উৎপন্ন হয়, তাই অন্তরাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি বলে অনুভূত হয়। সেখানেই তারা মনের মানুষকে উপলব্ধি করে।

লোককবি আজগর ভাণ্ডারী বলেন জগত মিথ্যা নয়। এই জগত থেকে নিজেকে ও প্রভুকে চিনতে হবে। সব সৃষ্টির মধ্যে পরমসত্তা বিদ্যমান। সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আল্লাহ পাক নিজেকেই প্রকাশ করেছেন। মহা শক্তিশালী, মহান প্রভু কিছু একটা চায় আর তাহলো প্রেম। একমাত্র প্রেমই জীবাত্মাকে পরমাত্মায় উন্নীত করতে সক্ষম। প্রেমকে স্বীকার করলে দ্বৈতভাবকে স্বীকার না করে উপায় নাই। আর দ্বৈত ভাব হলো জাত ও সেফাত। নফস আর রূহের যুগল মিলনই হলো আসল মিলন। এ মিলনের সময় সাধককে শ্বাস উর্ধ্বগতি রেখে টলের মুখে ঢাকনা দিয়ে অটল রাখতে হবে। কবি তাঁর সঙ্গীতে বলেন—

প্রেম জ্বালা আছে যার গো, প্রেম জ্বালা আছে যার
সে জানেগো বেদনা তাহার ॥
ওরে জল ফেলে জল আনতে গেলে,
হঠাৎ জীবের পাও পিছলে গো,
ওরে কলসীতে জল রাখতে হলে
ওরে পাত্র দেখো লক্ষ্য করে গো,
মাটির কলসী ভেঙ্গে গেলে তাতে জল থাকে না আর ॥[১৬১]

রতি নিরোধের ব্যাপারে এমন কথা বাউল সম্রাট লালন সাঁইও বলেছেন। আজগর ভাণ্ডারী যেমন কলসীর মুখে ঢাকনা দিতে বলেন তেমনি লালন বলেন কামের ঘরে কপাট মারার কথা :

কামের ঘরে কপাট মেরে
উজান মুখে চালাও রস ॥
দমের ঘর বন্ধ রেখে
যম রাজারে কর বশ ॥[১৬২]
এ কথা দুদ্দুশাহ্ একটু অন্যভাবে বলেন :
কামের ঘরে বাঁধাল দেরে মন
যদি হতে চাও মানুষ রতন ॥[১৬৩]

প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনের সময় সাধককে অটল থাকতে হয়। পিছলে পড়ে যদি বিন্দু স্খলিত হয়ে যায়, সেই ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নেয়ার জন্য সাধকেরা তা বিনা দ্বিধায় ভক্ষণ করে। সাধককে কলসীর মুখে ঢাকনা তৈরীর জন্য বা অটল সাধনায় সাফল্য লাভের জন্য যে সমস্ত নিয়ম পালন করতে হয় তা হলো– নারীর ঋতু স্রাবের প্রথম তিন দিন অবশ্যই সহবাসে মিলিত হতে হবে। কেননা বিন্দুরূপে মনের মানুষ নিরাকারে সহস্রদলের উপর ভাসে। নারীর ঋতুর সময় সেই অটল রূপী মানুষ নেমে এসে 'রজের' সাথে মিলিত হয় এবং মূলাধারে প্রকাশ পায়। চতুর্থ দিনে আবার ফিরে চলে যায়। সাধকগণ এই তিন দিন 'মীন' রূপী সাঁইকে ধরার জন্য ত্রিবেনীর ঘাটে বসে থাকেন। এ জন্য এ সময় মিলন খুব গুরুত্বপূর্ণ। অটল সাধনার জন্য সাধকেরা বিনা দ্বিধায় রজ, বীর্য পান করেন। এতে জরা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে অমরত্ব লাভ করা যায় বলে তাঁরা মনে করেন।

লোককবি আজগর ভাণ্ডারীর গানের সংখ্যা ৬০ এর উপরে। তিনি মারফতী ও দেহতত্ত্ব সঙ্গীত ছাড়াও নারী নির্যাতন, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, পরিবার পরিকল্পনা, গর্ভবর্তী মায়ের সেবা ও পুষ্টি, শিশুপুষ্টি, এইড্স প্রতিরোধ, ও টীকাদান প্রভৃতি বিষয় সঙ্গীত রচনা করেছেন। এবং এ সব গান বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গেয়ে লোক সমাজকে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। আধ্যাত্মিক সাধনতত্ত্বের পাশাপাশি ঐহিক জীবনের সমস্যাবলীর কথা আজগর ভাণ্ডারীর গানে স্থান পেয়েছে। জটিল তত্ত্বকথাও তার গানের বাণীতে শিল্পরূপ পেয়েছে। হৃদয়ের অনুভূতি, দার্শনিক তত্ত্ব বেশ সুন্দর করে তাঁর সঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। তাঁর গানের সুর, ছন্দ, ভাব, ভাষা ও অলংকার ব্যবহারে মুগ্ধ হতে হয়। তাঁর সঙ্গীতের সাহিত্যমূল্য, সাঙ্গীতিক মর্যাদা ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কবির সঙ্গীতে ব্যবহৃত শব্দালংকার ও অর্থালংকারের নমুনা উদাহরণসহ উল্লেখ করা হলো।

১. রূপক
উথলিয়া লোহিত সাগর তিন দিন ভাসে নহর,
মানুষ গড়া ছাঁচের ভিতর নতুন মানুষ জন্ম লয়।[১৬৪]

২. প্রতীক
কাম পাহাড়ে ধাক্কা লেগে মণিলাল পাথর চুয়ায়,
উপর তলার রত্নমণি, বিন্দুরূপে ভেসে যায় ॥[১৬৫]

৩. সাপেক্ষ সর্বনাম

ফুল ফোটে যার বার মাস, তাতে হয় শক্তির বিকাশ,
তার চরণে হইয়া দাস, মধু খায় যে মৃত্যুঞ্জয় ॥[১৬৬]

৪. সুভাষণ

নামাজ পড় রোজা রাখ
সোজা রাস্তা ধরে চলো ॥[১৬৭]

সবশেষে বলা যায় কবি আজগর ভাণ্ডারী গ্রাম বাংলার একজন প্রতিভূ কবি। তাঁর হৃদয়ে আছে কবিত্ব, মুখে মিষ্টি কথা, কণ্ঠে পাপিয়ার সুর, আর চরিত্রে অপূর্ব বিনয়শীলতা। তিনি দেহতত্ত্ব সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত। মরণ রহস্য, আত্মতত্ত্ব বিষয়ে তিনি যথেষ্ট পরিজ্ঞাত।

১০. শাহসুফি সৈয়দ আমজাদ হোসেন হায়দারী

মরমি সাধক ও প্রেমিক তাঁদের পবিত্র নিস্কাম প্রেমের পরশে শুচিশুদ্ধ মনের মুকুরে প্রেমাস্পদের ছবি দেখেন। তাঁর জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় সেই প্রেমিকের ভিতরেও তাঁরই সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করেন। এই মরমি সাধকগণ শুধু বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নয়, হৃদয় দিয়ে ধর্মকে উপলব্ধি করেন। এই ধারার একজন উল্লেখযোগ্য মরমি কবি হলেন সৈয়দ আমজাদ হোসেন হায়দারী।

বিশ্ব সৃষ্টির মূলে প্রেম ছিল, আল্লাহ্ ভালবেসে বিশ্বচরাচর ও মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন আপন মহিমা প্রকাশ করতে, নিজেকে সৃষ্টির কাছে পরিচয় করাতে। তাই আল্লাহর প্রেম হতেই তাঁর নুরে মুহম্মদের সৃষ্টি। কবি আমজাদ হোসেন বলেন–

পিরীতের জাতের চাবি, তুলে নে হাতে
খুললে তালা দেখবি মেলা প্রেমের জগতে ॥

আল্লা হতে এলো নুর মুহম্মদ
এস্কের বশে একোন রূপে
খেললেন প্রেমের জগতে ॥

আল্লা নবী হলরে মিলন
মেরাজে তাই হয় আলাপন
আসেক মাসুক হইল মিলন
ওসে প্রেম হইল প্রকাশন
নিরাকারে সাঁই নিরঞ্জন
কোন প্রেমেতে হইল মিলন
পাগল আমজাদ হইল অধম
অন্ধ পথিক সেজে ॥[১৬৮]

সুফি সাধকেরা মূলত প্রেমিক। প্রেমহীন কর্ম ও ধর্ম উভয়ই তাঁদের কাছে অর্থহীন অন্তঃসারহীন। প্রেমই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি ও স্থিতির কারণ।

দেহ ও জীবন যেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তেমনি মানুষ ও ভগবান বা আত্মা ও পরমাত্মা পরস্পর যুগলমিলনে আবদ্ধ। এই যুগলমিলনও ক্ষণস্থায়ী, এর প্রথমটি নশ্বর ও দ্বিতীয়টি অবিনশ্বর।

তবু অবিনশ্বরের মনোহর বা অপরূপ রূপটি সম্যক উপলব্ধির জন্য মানব দেহের আবশ্যকতা আছে। সাধক পুরুষ আমজাদ হোসেন বুঝতে পেরেছেন যে, মানুষের মাঝেই সাঁই বিরাজমান। কবি বলেন–

ভবঘুরে জগতটারে চিনবো আমি কেমনে
জগতের সাঁই আছে কোন খানে ॥

চৌষট্টির বারামখানা
করছেন যে সাঁই মানুষ লীলা
দেখলে জীবের জ্ঞান থাকে না
তালা লাগাও দমের ঘরে ॥
চৌদ্দ পোয়া মানুষ দেহ
সাড়ে তিন ভাগ হয় সেত
যোগ বিয়োগের মিলন করে
খোদা খোঁজো মানব মাঝে
জুদা হয়ে খোদা খুঁজে
মিলবে না তা এই জনমে।[১৬৯]

খোদাকে পেতে হলে গভীর সাধনায় মত্ত হতে হবে। চাতক পাখি যেমন মেঘের বারি পান করার জন্যে অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে আকাশে ঘুরে বেড়ায়, আর কোনো পানি সে পান করেনা, তেমনি সাধক আমজাদ হোসেন বলেন, প্রেমাস্পদকে না পেলে প্রেমিকের অবস্থাও হয় সে রকম। চাতকের মত ব্যাকুল না থাকলে তাকে পাওয়া যায় না :

চাতক সভাব নিয়ে মনে
নীহার করো গুরুর সনে
জ্ঞান চক্ষুতে খুললে তালা
অন্ধকার আর থাকবে না ॥

তালা লাগাও কামের ঘরে
চন্দ্র উদয় হবে দেহের মাঝে
কুপথ তোমার যাবে সরে
দেখবে সাঁইয়ের বারাম খানা ॥[১৭০]

এ বিষয়ে লালন শাহ বলেন–

চাতক স্বভাব না হলে
শুধু কথায় কি মেলে।
অমৃত মেঘের বারি

শুধু মুখের কথায় নয় রে ॥
মেঘে কত দেয় গো ফাঁকি
তবু চাতক মেঘের ভোগী,
অমনি নিরিখ রাখে না আঁখি
চাতক স্বভাব না হলে ॥
চাতকেরই এমনি ধারা
তৃষ্ণায় জীবন যায় রে মারা,
অন্য বারি খায় না তারা
মেঘের বারি না হ'লে ॥[১৭১]

কবি সর্বেশ্বরবাদী সুফিদের সাথে ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন। আল্লাহর নুরে মুহম্মদ ও মুহম্মদের নুরে সারে জাহান সৃষ্টি হয়েছে। সেই দৃষ্টিতে আদমকে আল্লাহরই গুণের প্রকাশ বলে ধারণা করেছেন। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরূপ অনাদি ব্রহ্মের নানা গুণের প্রকাশস্বরূপ পয়গম্বর বা অবতার এ দুনিয়ায় আবির্ভূত হচ্ছেন। তাঁদের এরূপ আবির্ভাবের মধ্যে রয়েছে মায়ার খেলা। এ মায়ার দ্বারাই আচ্ছন্ন হয়ে মানুষ তার সত্যিকার রূপের পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে। সে তার দেহকেই তার আসল রূপ বলে ভ্রমে পতিত হচ্ছে। তার দেহের মাঝেই যে সে অরূপ রতন, সে তত্ত্বটি বুঝতে না পেরে সে তাকে খুঁজে মরছে হেথায় হোথায়। কবি বলেন–

কে বুঝিবে সাঁইয়ের খেলা
নিজ থেকে আদম হয়ে
শূন্যে তাই করে খেলা
হাহুত হতে নাছুত গিয়ে
ফানা ফিল্লার ঘর বাঁধিয়ে
মালকুত থেকে বাহির হয়ে
জাবরুতে হয় লেনা দেনা
জল তরঙ্গের তুফান তুলে
মিমের সাগর পাড়ি দিয়ে
এক হতে তিন বানাইয়ে
গলে পড়ে রঙ্গ মালা ॥[১৭২]

স্রষ্টা সন্ধানী সাধক কবি মানুষের মাঝেই সেই সাঁই বা স্রষ্টাকে খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মতে মানুষই মানুষের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ। এ জগতের সর্বত্রই মানুষের জয় ঘোষণা করতে হবে। ধর্মকে মানুষের কল্যাণের জন্যই নিয়োজিত করতে হবে। মানুষের মধ্যেই সর্বশাস্ত্রের আধার সে মানুষরতন বিরাজমান। একনিষ্ঠ সাধনায় তাঁকে খুঁজলে অবশ্যই সাক্ষাৎ মিলবে।

লোককবি আমজাদ হোসেনের কবিকর্ম অধ্যাত্ম সাধনতত্ত্ব ভিত্তিক, যার মধ্যে স্রষ্টার আরাধনা এবং সাধন-প্রণালীর কথা ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর সঙ্গীতে পরিব্যক্ত হয়েছে মানবিক আবেদন এবং মানব মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা ও অকপট আত্মসমর্পণের সহজ আকুতি। সব কিছু মিলিয়ে তাঁর রচনাবলীর সাহিত্য মূল্য অস্বীকার করা যায় না। তাঁর সঙ্গীতে ভাষারীতি, শব্দ ব্যবহার, বাণীভঙ্গী, ছন্দ ও অলংকার ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন–

১. অনুপ্রাস
স্নেহভরে আদর করে রাখতাম পাখি খাচায় ভরে,
দুধ কলা খাওয়াইতাম তারে ভক্তিভরে আদর করে।[১৭৩]

২. যমক
গুরুর ছবি নুরের রবি উদয় হয়েছে যার অন্তরে,
ধ্যানে জ্ঞানে মহা ধনী অজীবকে সজীব করে।[১৭৪]

৩. প্রতীক
নাম যে তাহার তিন নামে জানা
ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এরাই তিনজনা[১৭৫]

৪. সুভাষণ
তরিক ধরো নামাজ পড়
স্বরূপ দ্বারে সেজদা করো।[১৭৬]

৫. সাপেক্ষ সর্বনাম
যেই বীজেতে হয় যে পুরুষ, সেই বীজেতে হয় প্রকৃতি
একটি বাড়ি দু'টি হাড়ি পাত্র শুধু ভিন্ন রয় ॥[১৭৭]

পরিশেষে বলা যায় নিছক তত্ত্বকথাও যে উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে সরস সাহিত্য হতে পারে আমজাদ হোসেনের মরমি সঙ্গীত তাঁর অপূর্ব নিদর্শন। তাঁর সাহিত্যমূল্য অনস্বীকার্য।

১১. মোঃ আবুল ক্বাছিম কেশরী

রাজশাহী জেলার মহোনপুর থানার উল্লেখযোগ্য লোককবি আবুল ক্বাছিম কেশরী। কবির 'মুর্খ আবিদ' নামে ৪৭টি গানের সমন্বয়ে সঙ্গীত সংকলন রয়েছে। 'সুরবাণী' নামে আর একটি সঙ্গীত সংকলণ আছে, এতে ৪৪টি গান স্থান পেয়েছে। কবির 'পেউকাঁহা' নামে আরও একটি সঙ্গীতের পাণ্ডুলিপি আছে, এতে ২০টি সঙ্গীত রয়েছে।

সঙ্গীত হোক সাহিত্য হোক, সবকিছুর মধ্যেই আমাদের জনসাধারণ একটু তত্ত্বকথা, একটু আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করতে চায়। স্রষ্টার সাথে আমাদের মনের যোগ যে বাঁধা রয়েছে, সেখানে ঝংকার না উঠলে আমাদের পল্লীবাসী পুরোপুরি আনন্দ লাভ করতে পারে না। আবুল ক্বাছিম কেশরী তাই তাঁর চায়পাশের মানুষের সেই আনন্দ রসের সূত্র ধরে মূলত দেহতত্ত্বমূলক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা সম্বলিত সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁর গানে মানুষ চিন্তার অবকাশ খুঁজে পেল আর পেল চিন্তার মধ্য দিয়ে আনন্দরসের আস্বাদ। তাঁর সঙ্গীতে ইসলামী চেতনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কবি খেতমজুর, শ্রমিক ও কৃষককে তাঁদের কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সঙ্গীত রচনা করেছেন। কবি বলেন–

তুই লাঙ্গলে দে মন
খেয়ে বাঁচবি সুখে থাকবি কথা যেরে শোন্ ॥
ভদ্রতা তুই যতই করিস
এই ধানেই যে পেট ভরিস
তাই ধান ফলিয়ে ভদ্রতা কর জাগ্ নিদ্রামগ্ন।
এই সোনার ফসল সবার প্রাণে
ভরিয়ে দেবে মধুর গানে
প্রাণে প্রাণে গানে গানে মেতে রইবে সারা ভুবন
আছে যত অলস কুঁড়ে
কর্ম মুখর জগত জুড়ে
তাদের দিকে তাকায় নাকো স্রষ্টা নিরঞ্জন।[১৭৮]

কবি অর্থনৈতিক অবস্থার ইঙ্গিত দিয়েছেন। কৃষকদের বিপর্যস্ত অবস্থা কবির হৃদয়ে দাগ কেটেছে। অলসতা, কর্মের প্রতি অবহেলা, প্রভৃতি বিষয়ের কারণে কৃষকদের জীবনে দুর্দিন নেমে এসেছে। তাদেরকে উজ্জীবিত করার জন্য তিনি এই সঙ্গীত রচনা করেন।

পরপারে বিশ্বাসী কবি নবীর প্রেমের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। নবীর সুপারিশ ছাড়া সেই কঠিন বিচারের দিন কেউ পার হতে পারবেনা। সেই নবীর বিরহ পিপাসা কবিকে ব্যাকুল করেছে। কবি বলেন—

ক.	মদীনা মোহন হৃদয় রতন, কোথায় লুকিয়ে তুমি
তোমার বিরহে অভাগার সাথে, কাঁদিছে জগত ভূমি
তোমার বিরহ আর সহিতে পারি না
ধ্যানের পীতম এসো গো হৃদয় রাজে
হৃদয় হোক লীন তোমার কদম মাঝে
পিয়াস মিটাও
একান্ত বাসনা মিটাব পিয়াস
তব পাক রওজা চুমি।[১৭৯]

খ.	মন ছুটে যায় হেরার পানে
যথা পিয়ারা রাসুল মাতিয়া রহিত
সদাই খোদার গানে
আমি ভেসে যাব নিজেরে হারাব
পিয়ারা নবীর প্রেম বাগানে।[১৮০]

নবীপ্রেম আমাদের অধ্যাত্ম তত্ত্বসংগীতের একটি প্রধান বিষয়। এ কারণে নবীর জন্মস্থান মক্কা, ধ্যানের জায়গা হেরা পর্বতের গুহা এবং সমাধিস্থল মদীনার কথা বার বার এসেছে। মদীনায় নবীর রওজা মোবারক দর্শন বা জেয়ারত করাকে অশেষ পুণ্যের কাজ বলে মনে করা হয়। মদীনার কথা অনেক কবির গানেই স্থান পেয়েছে। মরমি কবি রকিব শাহ বলেন—

মদিনা শরিফে জপে লতায় পাতায় রব্বানা
মুহম্মদ মুস্তাফা নবীর খাস্ পিয়ারা মদিনা ॥
মক্কা ও মদিনা দুই কি বলিমু তার নমুনা
লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহুর এই মনযিলে ঠিকানা ॥[১৮১]

মানব জীবনে দুরূহ সাধনার জন্য কবি আধ্যাত্মিক গুরুর সান্নিধ্য অপরিহার্য মনে করেছেন। তিনি পরপারে মুক্তির জন্য মুর্শিদের সন্ধান করেছেন। যেমন—

জীবন নদী পাড়ি দিতে
বল নাইকো আমার চিতে
ভাবতে ভাবতে গেল দিন
সন্ধ্যা যে ঘনায়
কোথায় পাব এমন মুর্শিদ
যার আছে মজবুত লাও খানি।

ঝড় তুফানে পার করিতে,
ভয় নাই যার শক্তি চিতে
বসে বসে দিনগুনি ভাই
সে মুর্শিদের আশায়।[১৮২]

মুর্শিদের প্রসন্নতা ব্যতীত আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব নয়, আবুল ক্বাছিম কেশরী এ কথাই ব্যক্ত করেছেন তাঁর গানে। পরপার চিন্তাই কবির বড় চিন্তা। সেখানে নিজের মুক্তির জন্য মুর্শিদের প্রেম, ভালবাসা, একান্ত প্রয়োজন।

সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের দ্বারা সংঘটিত হলেও তার ক্ষেত্র সৃষ্টি করেন সংবেদনশীল সচেতন শিল্পী। কবি স্বাধীনতার সঙ্গীত রচনা করে স্বদেশ প্রেম জাগ্রত করার প্রয়াস পেয়েছেন :

যে দিন ফুটিবে সকলের মুখে হাসি রেখা
তবে বন্ধ হবে বেদনার ইতিহাস লেখা
সে দিন আসিবে কবে নিয়ে নব ইতিহাস
মুছে যাবে ধরা হতে বেদনার শ্বাস।
দূর হবে মানুষে মানুষে অবিশ্বাস,
সোনালী আখায় ভাসিবে সে দিন
জলন্ত আভা ধন্য স্বাধীনতা।[১৮৩]

আবুল ক্বাছিম কেশরী কেবল একজন সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন যথার্থ অর্থে সাহিত্য সংস্কৃতির উপাসক। তাঁর সঙ্গীত এবং বক্তব্যে এসেছে বাঙালি জাতির ধর্ম, সমাজ, এবং স্বদেশ প্রেম। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তিনি সঙ্গীত রচনা করেছেন এবং সফল হয়েছেন।

বিভিন্ন কাব্যিক প্রকরণের সুষ্ঠু সমাবেশ ঘটিয়ে কবিতাকে অখণ্ড রূপদানই মূলত কাব্যের রূপগত গঠন। এই প্রকরণকে অন্যকথায় কাব্যকলা বলা হয়ে থাকে। কবিতাও বাণীরূপ পরিগ্রহ করে কাব্যরসিক চিত্তে আনন্দ দেয়। কবিতার বাণীদেহ নির্মাণের উপরই কবির কাব্যিক সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এ সমস্ত ক্ষেত্রে কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি জীবনমুখী কবি। তাঁর রচনার ভাব, ভাষা, ছন্দ ও অলংকার অত্যন্ত চমৎকার। যেমন–

১. যমক

বন্ধ ঘরের অন্ধ কারায়
জমাট হয়ে আঁধার ঘনায়[১৮৪]

২. সাপেক্ষ সর্বনাম

ভাল নাহি লাগে যারে, মত নাহি মিলে যার,
যে তাহারে ব্যথা হানে সে যে লাগে পিছে তার।[১৮৫]

৩. নির্ধারক বিশেষণ

এই সোনার ফসল সবার প্রাণে
ভরিয়ে দেবে মধুর গানে
প্রাণে প্রাণে গানে গানে মেতে রইবে সারা ভুবন।[১৮৬]

৪. আদ্যাবৃত্তি

ভুলে যাবে তোমার আমার স্মৃতি
ভুলে যাবে দোল জাগানিয়া প্রীতি।[১৮৭]

পরিশেষে বলা যায় লোককবি আবুল ক্বাছিম কেশরী একজন স্বভাব কবি ও ভাবুক। ভাষা ও ভাবের মণিকাঞ্চন সমাবেশে তাঁর রচনাবলি পাঠক চিত্তে ভাবলহরী সৃষ্টি করে।

১২. মোঃ আবদুর রহিম সরদার

সমাজের ছবি, মানুষের পশুশক্তি, খুন হত্যা, পল্লীর মানব মানবীর প্রেম লীলার বর্ণনা লোককবি মোঃ আবুদর রহিম সরদারের গান রচনার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। স্বল্প শিক্ষিত রহিম ছন্দের অন্তমিল রেখে কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে কবিতা লেখেন। তাঁর কবিতার ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল। তাঁর জীবন জীবিকার একমাত্র হাতিয়ার এই কবিতা। এলাকায় কোন চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটলেই ছুটে যান ঘটনাস্থলে। সঙ্গে থাকে কলম ও কয়েক পাতা সাদা কাগজ। সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সাজিয়ে গুছিয়ে ছন্দে ছন্দে ঘটনাকে ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই ৮পৃষ্ঠার। তিনি প্রায় ৫০টি কবিতা লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো।– ১. বাংলা বাহিনীর খুন যখমের কবিতা, ২. ভূমিহীনের করুণ কাহিনী প্রথম খণ্ড ৩. ভূমিহীনের করুণ কাহিনী দ্বিতীয় খণ্ড ৪. সরাফত মাস্টার হত্যার কবিতা, ৫. কোদালে মুণ্ডু কাটা খুনের কবিতা, ৬. সাহিনুর খুনের কবিতা ৭. চেয়ারম্যান গোলাম রব্বানী খুনের কবিতা ৮. নজরুল খুনের কবিতা, ৯. ওয়াহেদ প্রফেসারকে জবাই করে হত্যার কবিতা, ১০. আবুল হোসেন সরকার দুলু হত্যার কবিতা, ১১. বাবুল মেম্বর খতমের কবিতা, ১২. এরশাদ শিকদারের ফাঁসীর কবিতা, ১৩. আত্রাই ইউ.পি সদস্যসহ ৬জনকে জবাই করে হত্যার কবিতা, ১৪. রহিদুল ইসলাম পাখি হত্যার কবিতা, ১৫. ভাষা আন্দোলনের কবিতা, ১৬. গায়েন আলী ও মাজেদা বিবির প্রেমের কবিতা, ১৭. শমসের রাসেদার জম জমাট প্রেমের কবিতা, ১৮. সাহেব আলী ও বেদেনা বেগমের প্রেমের কবিতা, ১৯. সাঁওতাল মেয়ে অর্চনা ও রাজ্জাকের প্রেমের কবিতা, ২০. বন্যাদুর্গত এলাকার কবিতা, ২১. সন্দীপন গণশিক্ষার জারী, ২২. কৃষি মেলার জারী।

পল্লীকবি আবুদর রহিমকে চারণ কবি বলা যায়। কোন ঘটনাস্থলে যেয়ে, ঘটনার বিবরণ শুনে সেই সময়ই সুরে সুরে কবিতা তৈরী করে শ্রোতাদের শুনিয়ে মুগ্ধ করার যাদুকরী প্রতিভা তাঁর আছে। তাঁর এক হাতে কবিতার কাগজ, অন্যহাতে খঞ্জনি। হাট বাজার ও গ্রামে গ্রামে লোকজন জড়ো করে মজমা বসিয়ে নেচে নেচে গান শুনিয়ে থাকেন। তাঁর কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়ে শ্রতারা ২/১ টাকা করে দিয়ে থাকেন। সারা দিন যা আয় হয় তা দিয়েই চলে ভূমিহীন অসহায় আবদুর রহিমের সংসার।

জাগ্রত মুসলিম জনতা (জে. এম. বি) এর প্রধান সিদ্দিকুর রহমান ওরফে বাংলা ভাই, উত্তর বঙ্গে সর্বহারা নিধনের অভিযান চালায়, রাজশাহী জেলার বাগমারা থানা ছিল বাংলা ভাইয়ের প্রধান ঘাঁটি। সেখানে একই দিনে ৮জন সর্বহারাকে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে রাখে। হাট বাজারে মাইকিং করে সর্বহারাদের আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানায়। ২০০৪ ইং সালে এই ঘটনার মাঝ দিয়ে বাংলা বাহিনী সমগ্র বাংলাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

বাগমারা থানার শ্রীপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোকবুল হোসেনকে জবাই করার জন্য বাংলা বাহিনীর সদস্যরা শ্রীপুরে আসে। কবি এ বিষয়ে লিখলেন–

রাজশাহী জেলার ভিতরে বাগমারা হয় থানা
শ্রীপুর ও খয়রার মাঝে বিশাল খতমের ঘটনা
বাংলা ভাই জে. এম. বি গণ পরিচয় জানাই
নাম, গ্রাম, ঠিকানা সেই পেপারেতে পাই ॥

আর বাগমারা কোনাবাড়ীয়া বাহিনী একজন
তাহেরপুর মাদ্রাসার ছাত্র মৌলবীর মতন
এরশাদের ছেলেও তিনি আবদুর রহমান ॥

বগুড়া জেলার মাঝে আদমদিঘী থানা
পাল্লা গ্রামের আবদুল মালেক তাহারও ঠিকানা
তাহার ছেলে জাহিদুল ইসলাম বাহিনী সেই জনা
আর বাগমারা তেগাছি ভাইরে সেন পাড়া গ্রাম
মোহাম্মদ আলীর ছেলে একজন ইব্রাহীমও নাম
তিন জনারও মুখে দাড়ি পেপারে প্রমাণ ॥
জে. এম. বি বাহিনীগণ কি অপরাধ পাই
মোকবুল হোসেন চেয়ারম্যানকে করিবে জবাই।[১৮৮]

কবি কবিতার এই অংশে বাংলা বাহিনীর সদস্যদের পরিচয় দিয়েছেন। বাগমারায় পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির খুব প্রভাব ছিল এক সময়, এ জন্য বাংলা বাহিনী তাদের দমন করার জন্য এখানে স্থায়ী শিবির নির্মাণ করেন। খুন জখমে অশান্ত হয়ে পড়ে বাগমারার পরিবেশ। সৎ লোকের শাসন এখানে স্থায়ী হতে পারে নি। বার বার খুন জখমের শিকার হতে হয়েছে শাসককে। কবি বলেন–

সৎ লোকের শাসন গেল অসতের চলন
ভাল বিচারকে কবিরে, যাবে তার জীবন।[১৮৯]

২০০৫ সালের ২২শে জানুয়ারী কোরবাণীর ঈদের দিন বিকালে চেয়ারম্যান মোকবুল হোসেন ইউনিয়ন পরিষদে যায়। চেয়ারম্যানের বাড়ি ফিরতে রাত হয়। বাংলা বাহিনী শ্রীপুর বাঁধের নীচে ওঁত পেতে থাকে। ইউসুফ আলী মেম্বরকে সাথে নিয়ে চেয়ারম্যান যখন রাস্তায় তখন বাংলা বাহিনীর পাষণ্ডরা চেয়ারম্যানের মাথায় বাড়ি দেয়। এ বিষয়ে কবি বলেন–

চেয়ারম্যান ইউসুফ আলী বাড়ীর পথে যায়
রস্তমের বাড়ীর আগে ঘটনার বিষয়
বাহিনীগণ চেয়ারম্যানের মাথায় বাড়ি দেয় ॥

চেয়ারম্যান চিৎকারিয়া পুকুরে লাফ দেয়,
জে. এম. বি-র গুলির আঘাতে চেয়ারম্যান খাম হয়।
আর লাঠির বাড়িতে ইউসুফ আলী জমিনে লুটায়
চেয়ারম্যান মরিয়া গেছে ইউসুফও হাকায়
জে. এম. বি গণ বোমা মেরে পালাইয়া যায় ॥[১৯০]

এলাকার লোকজন মাইকিং করে খয়রা বিল ঘিরে ফেলে। খয়রা বিলে বাংলা বাহিনী ও জনগণের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধ হয়। বাহিনীর তিন জন ও একজন সাধারণ লোক মারা যায়। পোস্টমর্টেম শেষে যখন বাংলা বাহিনীর লাশ ফিরে আসে, তখন লাশের জন্য বাংলা বাহিনী মিছিল বের করে। কবি বলেন–

বাংলা ভাইয়ের জে.এম.বি গণ শ্লোগান দিয়া কয়
আমাদের লাশ চাই মিছিলও হাকায়
শ্লোগান দিয়া ভবানীগঞ্জ আসিল সবায় ॥

পুলিশদের সাথে তারা মোকাবেলা হয়
র‍্যাব বাহিনী দেখিয়া তারা ভাগিয়া পালায়
বাংলা ভাইয়ের ৬৪ জন ধরাপড়ে যায় ॥[১৯১]

কবির এই কবিতায় তৎকালীন বাগমারার সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে। বাংলা বাহিনীর প্রচণ্ড দাপট আমরা তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করি। কারণ তাঁরা প্রকাশ্য দিবালোকে এক সঙ্গে ৮টি খুন করেছে। গাছের সাথে তাঁদের ঝুলিয়ে রেখেছে। মিছিল করেছে, পুলিশের সাথে মোকাবেলা করেছে। এই সব জীবন্ত চিত্র তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে। কবি একজন চিত্রকরের মত সমাজের সব ঘটনার চিত্র তাঁর কবিতায় অঙ্কন করেছেন।

লোককবি আবদুর রহিম একজন আসরের কবি। লোক মনোরঞ্জনের জন্য তিনি দিনের পর দিন অজস্রগান মজমা বা আসরে দাড়িয়ে রচনা করে গেয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এমন লোক বিনোদনে উৎসর্গীকৃত একজন কবির নিকট থেকে শিল্পগুণান্বিত সঙ্গীত বিশেষ আশা করা যায় না। আবদুর রহিমের অসংখ্য গানে তারই পরিচয় বিদ্যমান। তিনি লোকরঞ্জনের জন্য সহজ সরল বক্তব্যে সঙ্গীত রচনা করেছেন। শিল্প বিচারে এগুলোর মান উচ্চস্তরের নয়। কিন্তু সমাজচেতনা সৃষ্টিতে কবির সুরেলা কণ্ঠের কবিতা পাঠের আসর মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

লোককবি আবদুর রহিম সরদার একজন জীবনসংগ্রামী শিল্পী ও সঙ্গীত রচয়িতা। তাঁর গান রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা ও কথা কাহিনীর পরিচয়ে ঋদ্ধ। তাঁর গানে আছে দুখী মানুষের কথা মাটির মানুষের কাহিনী। সাদামাটা গানগুলোতে আছে তাঁর চারপাশে যা ঘটেছে, যে বেদনাময়, অমানবিক পরিস্থিতি তারই অনাড়ম্বর বাস্তব আলেখ্য। পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও সমস্যা কবিকে আলোড়িত করে, আর তা নিয়েই তিনি গান রচনা করেছেন। জীবনের অসঙ্গতি, খুন, হত্যা, অসাধুতা, ভণ্ডামী, প্রেম বিরহ, এসব বিষয় তাঁর গানে প্রতিফলিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় কবি আবদুর রহিম অশিক্ষিত হলেও তাঁর কবিতা রচনার একটা স্বাভাবিক দক্ষতা আছে। প্রত্যেকটি চরণের শেষেই শুধু নয়, মাঝেও বহুমিল দিয়ে ছন্দের ক্ষেত্রে ছন্দকে গতিশীল ও হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছেন। তাঁর প্রকাশ ভঙ্গীর সারল্য ও দরদমাখা আবেগ শ্রোতা সাধারণকে সহজেই বিগলিত করে। কবি হিসেবে এতেই তাঁর সার্থকতা।

১৩. মোঃ শমসের আলী

মোঃ শমসের আলী স্বভাব কবি। মুখে মুখে পদ রচনায় তাঁর জুড়ি নাই। তিনি একজন তত্বজ্ঞ সাধক। সাধনালব্ধ বিষয়ের নির্যাসে তিনি রচনা করেছেন সঙ্গীত। কবির আধ্যাত্মিকতা অদ্বৈতবাদ ভিত্তিক। যে মুহূর্তে সে স্রষ্টাকে জানে সেই মুহূর্তে সবকিছু স্রষ্টা সত্তায় হারিয়ে যায়। এমন কি সাধক নিজেও মহাসত্তার সঙ্গে এক হয়ে যায়। এ জন্যে কবি শমসের আলী সংসার, সমাজ এবং দেশকালে অবস্থান করেও সব কিছুকে ত্যাগের দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন। স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বিষয়-আশয় নিয়ে ঘর-গৃহস্থালী চালিয়ে এক অজানা মহাসত্তাকে পাবার ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সঙ্গীতে :

আমি আর কি ফিরে পাব তারে
না চিনে হারাইয়াছি যারে ॥
পদ্মা আর যমুনার ধারে এক অন্ধনারী বসত করে
ভরা মাণিক মুক্তা আছে তাহার কাছে রে মন
সে যে নিজের ঘরে তালা মেরে ফাঁদ পাতিয়ে রাখে
যেমন জাতি কলে ঈঁদুর ধরে খাদ্যের আশায় যাইয়া মরে ॥
পড়ে এক মায়ার বসে কাল নাগিনীর কঠিন বিষে
ধরেছে যারে এই ভব সংসারে মন
আবার অন্ধ নারী যুদ্ধ করে কাম সাগরের তীরে
মণিরাজা হার মানিলে অমনি ধইরা গিলে তারে ॥[১৯২]

দেহাভ্যন্তরে অহরহ চলছে জীবাত্মা-পরমাত্মার বিরহ-মিলন খেলা। নারী দেহের অভ্যন্তরে আর এক অন্ধনারীর আবাস রয়েছে। নদীতে তুফান উঠলে যেমন নদীর পানি তোলপাড় করে, ঠিক তেমনি রিপু-ইন্দ্রিয় দেহমধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে থাকে। নারী দেহের জাতিকল থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সাধককে অটল বিজয়ী মন্ত্র লাভ করতে হয়।

অটল মনের জন্যে মানুষকে মুর্শিদের শরণাপন্ন হতে হয়। মুর্শিদই পরপারের একমাত্র কাণ্ডারী। তিনি দেহ তত্ত্বের যাবতীয় ভেদ বলে দিবেন। ঝড় তুফান তাকে পরাজিত করতে পারবে না। কবি বলেন—

আল্লার নামে বাদাম তুলে
মুর্শিদ নামে হাল ধরিয়ে

প্রেমের তরী দাওরে ছেড়ে
টলবে না তরী ঝড় তুফানে ॥[১৯৩]

দেহভিত্তিক অধ্যাত্ম সাধক কবিদের প্রায় সবাই রতিনিরোধের সাধনা করেছেন। বাউল কবি ফুলবাস উদ্দিন যেমনটি বলেন :

যতদিন না হয়রে অটল, তার কি আবার উজান চলে।
গুরুরূপে নিহার দিয়েরে, যেজন সাধে শতদলে।[১৯৪]

সাধক কবির ধারণা নরনারীর যৌন সম্মেলনে বীর্যকে স্খলিত না করে অটলভাবে ধরে রাখলে পরম ঈশ্বরের সাক্ষাৎ মিলে। স্মর্তব্য বাউল সাধকদের জন্যে অনুসরণীয় সেই বহুশ্রুত উক্তি : 'টলিলে জীব অটলে ঈশ্বর'। তাই শমসের আলী ব্যক্তিগত জীবনে সেই 'অটল মানুষকে পাবার জন্য রাজশাহী জেলার বানেশ্বর অঞ্চলের খুঁটিপাড়া গ্রামের মুর্শিদ হযরত এতিবর রহমানের আশ্রয় নিয়েছেন। সে মুর্শিদের দর্শন লাভের আশায় তিনি ব্যাকুল :

ক. আমার প্রাণ কান্দে যাইতে রে
খুঁটিপাড়ার গ্রামে
সেথায় জানি বসেরে আছে
আমার দয়াল মুর্শিদ চাঁন।[১৯৫]

খ. আমার মুর্শিদ চাঁন
তুমি বিনে বুঝেনা মোর প্রাণ
সারা রাতি জেগে জেগে গাই যে তোমার গান
তোমার ছুরাত দেখলো যারা, দেখলো আল্লার মুখ
তোমার বাহু জড়িয়ে বান্দা, ঠাণ্ডা করলো বুক ॥[১৯৬]

কবি মুর্শিদের নিকট থেকে পাওয়া আধ্যাত্মিক শক্তি বলেই গান রচনা করেছেন। তিনি নবীতত্ত্ব, মুর্শিদতত্ত্ব ও পারাপারতত্ত্ব নিয়ে ৫০ টিরও বেশী সঙ্গীত রচনা করেছেন। কবির মতে সৃষ্টিকর্তা দশটি বস্তুযোগে মানব দেহ সৃষ্টি করেছেন, এই দশটি বস্তুর নাম 'লতিফা'। লতিফাগুলো হলো কলব, রূহ, ছির, খফী, আখ্‌ফা, নফ্‌স, আব, আতশ, খাক ও বাত। মানব দেহকেই সাধনার মূল বিষয় বলে মনে করেন। এই মানব দেহতেই 'তিল পরিমাণ' জায়গা আছে, সেইখানে সাঁই বারাম দেয়। সাধনার মাধ্যমে শ্বাসকে উর্ধ্বগামী করে ইঙ্গলা পিঙ্গলা চিনে সাঁইকে ধরতে হয়।

কবি শমসের আলী বলেন—

মনেরে বুঝাইলাম এতো
করো মন সুমতি বচন

মানেনা সে কোন বাক্য
　　চলে সদায় উল্টা পথে ॥
পাগল শমসের কান্দে মনে
　　এতিবর কয় পাক জবানে
ইঙ্গলা-পিঙ্গলা চিনে
　　কর পিরিতি সুষুম্নার দেশে ॥[১৯৭]

কবি শমসের আলী মূলত মরমি সাধক। অধ্যাত্ম ভাবসাধনা তাঁর জীবনের ব্রত। তাঁর গানে সাধনার মর্মকথাও নিগূঢ় অধ্যাত্ম সাধনার রীতিপদ্ধতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করে কবি তাঁর গভীর তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। শমসের আলী ভাষারীতি, শব্দ ব্যবহার, বাণীভঙ্গী, ছন্দ, আঙ্গিক ও অলংকার ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

১. অনুপ্রাস

আবার অন্ধনারী যুদ্ধ করে কামসাগরের তীরে,
মণিরাজা হার মানিলে অমনি ধইরা গিলে তারে ॥[১৯৮]

২. যমক

আমার পাপ দেহ ছাপ হবে কিসে বল
ভেবে আমি পাইনা দিসে ॥[১৯৯]

৩. রূপক

আছে দেহে উলিহিয়াত সাগর
বুদ বুদ করে সদায় ঢেউয়ের লহর।[২০০]

৪. প্রতীক

পাগল শমসের কান্দে মনে, এতিবর কয় পাক জবানে.
ইঙ্গলা-পিঙ্গলা চিনে কর পিরিতি সুষুম্নার দেশে।[২০১]

৫. সুভাষণ

আল্লার নামে বাদাম তুলে
মুর্শিদ নামে হাল ধরিয়ে
প্রেমের তরী দাওরে ছেড়ে।[২০২]

পরিশেষে বলা যায় তাঁর রচনাবলীর যথেষ্ট সাহিত্যিক আবেদন আছে। আছে শব্দ ব্যবহারের চারুত্ব, বিষয়বস্তুর বিন্যাস-ক্ষমতা, পাঠকের মনে কৌতূহল সৃষ্টির কলানৈপুণ্য।

১৪. গোলাম জিয়ারত আলী

মরমি কবি গোলাম জিয়ারত আলী দীর্ঘ ২৬ বছর যাবৎ তত্ত্ব সাধনা ও কাব্য সাধনায় নিয়োজিত আছেন। সাহিত্যচর্চা তাঁর অন্তরের বস্তু। তিনি নিয়মিত এ কাজটি করে চলেছেন। তাঁর সঙ্গীতের সংখ্যা ২৫০টির উপরে। কবি তাঁর সঙ্গীতে দেহের নানা কোঠায় লীলা বিহারী পরমাত্মার সন্ধান করতে যেয়ে প্রথমত অতি সূক্ষ্ম দৈহিক লতিফাগুলোর বিকাশের আহ্বান জানিয়েছেন, দ্বিতীয়ত সেগুলোর মাধ্যমে মনের মানুষ বা আদমরতন সন্ধান লাভ করে পরমতত্ত্বে উপনীত হয়েছেন। কবি বলেন–

আদমের ভিতর আছে এক আদম রতন
তারে চিনে করবে সাধন ভজন ॥
সময় গেলে পড়বিরে ভীষণ ফ্যারে
আদমকে না চিনলে বৃথা যাবে
তোর স্বাধের মানব জীবন ॥[২০৩]

এই মানবের মাঝেই মহামানবের অস্তিত্ব বিরাজ করছে। কবি পাঞ্জু শাহ বলেন –

এই মানুষে সেই মানুষ আছে
সে ঘরের মাঝে ঘর বাঁধিয়ে
কাজল কোঠায় রয়েছে।[২০৪]

আর এ সম্পর্কে ভুবন সদানন্দ বলেন :

আছে এক সোনার মানুষ দেহ পিঞ্জরে
ও তারে রাখতে নাপারে কেউ ধরে।
রেখে ঘুমের ঘোরে শয্যার পরে
ও সে কোন দেশেতে যায় উড়ে ॥[২০৫]

আল্লাহপাক জাহের হবার জন্যই আদমকে নিজ সুরতে তৈরি করে প্রকাশ করলেন। পৃথিবীর সব পদার্থ মানবদেহের মধ্যে দিয়ে মানব আত্মাকে কার্যকরি করে আত্মার সাথে মিশে আছেন। কবি মহিন শাহ বলেন–

নিজ রূপে সাঁই মানুষ গড়ে
আপনি যায় তার ভিতরে
নীরে নুর ভাসে ক্ষীরে
রসে মিলে রয় ॥[২০৬]

মানুষের মধ্যেই মানুষরতন অবস্থান করে। সেই মানুষরতনকে পেতে হলে এই মানুষেরই ভজন করতে হবে। মানব জনম বড় দুর্লভ জনম। এই জীবনে মানুষকে চিনতে না পারলে মানব জীবন ধারনই বৃথা যাবে।

মানবকে চিনতে হলে আগে নিজেকে চিনতে হবে। মুর্শিদের আশ্রয় নিলে তিনিই আপন ঘরের মণিমুক্তার সন্ধান দিবেন। কবি গোলাম জিয়ারত বলেন :

মুর্শিদ আমার জানের জান প্রাণের প্রাণ
কেন ঘুরে মরলে মন চুরাশি ভুবন ॥
আপন ঘরে আছে বোঝাই
মণি মুক্তা, মাণিক রতন
নিজকে চিনে কর তার সন্ধান
ঠিক রাখিও বরজখ ধন ॥[২০৭]

কবি তাঁর লক্ষ্যে পৌছার জন্যে হযরত আলী করমুল্লাহ অজহুর একটি বিখ্যাত বাণীর অনুসারী। হজরত আলী বলেছেন–

'মান আরাফা নাফসাহু, ফাকদ আরাফা রাব্বাহু'[২০৮]

অর্থাৎ যে নিজেকে চিনেছে সে তার রবকে (সৃষ্টিকর্তা) চিনেছে।

নিজেকে জানার জন্য স্রষ্টার দেহ জরিপ আবশ্যক। কবি গোলাম জিয়ারত দেহ জরিপ করে বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে স্রষ্টাকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি বলেন–

মনের মানুষ মন ময়না
কেন কথা কয় না
দমের ঘরে মেরে তালা
হায়দারী আর্শিতে তাঁর দেখে নেনা ॥[২০৯]

কবি দেহ সাধনার মধ্য দিয়ে এই মানুষের মধ্যেই খোদ নিরঞ্জনের সন্ধান খুঁজে পেয়েছেন। এবং মুর্শিদকে নবীর সম্মানে ভূষিত করেছেন। তাই এই মানুষকেই নবী ও নিরঞ্জনের মত কবি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

লোককবি গোলাম জিয়ারতের সঙ্গীত থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তাঁর রচনায় তাত্ত্বিকতা রয়েছে। তাঁর গানগুলো নিটোল কবিত্বমণ্ডিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন–

আমার আদি অন্ত বেদ বেদান্ত
আল্লাহ রসুল হায়দারী জ্বলন্ত
কার ভিতর কে লুকাইয়া রসের রসিক সাজিয়া
প্রেমের খেলা খেলে প্রভু মাতিয়া মাতিয়া
যত কর ছন্দি ফন্দি
প্রেম ছাড়া হয় না সে বন্দি।[২১০]

কবির ভাষারীতি, শব্দ ব্যবহার, বাণীভঙ্গী অপূর্ব। অলংকার ব্যবহারেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন :

১. যমক

পাস আনফাস ডাক তারে
নফিখফি হাওয়ার ঘরে ॥[২১১]

২. শ্লেষ

তাঁর প্রেমের এমনই ধারা
জ্যান্ত মরা মরে তারা
মরার পরে তাঁহার সনে
মনের কথা কয় ॥[২১২]

৩. অনুপ্রাস

মুর্শিদ আমার জানের জান পতিত পাবন
কেনরে মন ঘুরে মর চুরাশি ভুবন।[২১৩]

৪. উৎপ্রেক্ষা

স্বপনে কি যে ইঙ্গিত কর
বুঝিতে না পারি
আমি করিতেছি ভুল অহরহ তারই।[২১৪]

৫. রূপক

বালুচরে ঘর বানাইয়া রসের রসিক সাজিয়া
ডাকি তোমায় প্রাণ ভরিয়া।[২১৫]

৬. প্রতীক

গোলাম জিয়ারত কয়, দেখতে যদি হয় বাসনা
মীম আর্শিতে পারদ লাগাইয়া বরজখে তাঁরে দেখে নেনা।[২১৬]

৭. সাপেক্ষ সর্বনাম

ঝন্ ঝন্ শন্ শন্ বাতাসে
যত কয় তত নয় তাহা সে ॥[২১৭]

৮. সুভাষণ

নামাজের নিশানা চিনে
হুজুরী কলবে পড় ভাই নামাজ ॥[২১৮]

৯. আদ্যাবৃত্তি

প্রেমই আদি প্রেমই অন্ত
প্রেম ছাড়া সবই রঙিন প্রান্ত ॥[২১৯]

১০. দূরাবৃত্তি

হাওয়ায় আসে হাওয়ায় যায়
হাওয়ার ঘরে ভাসে নীরে
বশে আনলে হাওয়ারে
নুরের জ্যোতি জ্বলবে হৃৎমন্দিরে ॥[২২০]

পরিশেষে বলতে হয়, গানের সার্থকতা প্রধানত সুরের ওপর নির্ভরশীল হলেও, তার বাণীর চারুত্বও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শৈল্পিক কলামণ্ডিত বাণী সুরের পাখায় ভর করে শ্রোতার চিত্তে আশ্রয় করে। কবি গোলাম জিয়ারতের গানগুলির তত্ত্বচিন্তা শৈল্পিক সুষমার মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে। শব্দের প্রয়োগে, অলংকারের ব্যবহারে তার গানগুলির তত্ত্ব মূল্যের পাশাপাশি সাহিত্যমূল্যও রয়েছে। ভাবরস ও সুরসৌন্দর্য বাংলার সঙ্গীতকলাকে যে স্বতন্ত্র মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দান করে, সাধক গোলাম জিয়ারতের সঙ্গীতে তা প্রতিফলিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১ নিজস্ব সংগ্রহ : ক্ষেত্র সমীক্ষা (ফিল্ডওয়ার্ক) থেকে প্রাপ্ত, কথক– শফিউল্লাহ সরকার, পিতা–ফসি উল্লাহ, গ্রাম– ব্রাহ্মণ পুষ্করিনী (ইদলপুর), পোস্ট-প্রেমতলী, থানা– গোদাগাড়ি, বয়স– ৮৩, পেশা–কৃষি, সংগ্রহ তারিখ: ১১-১১-২০০৪।

২ মুহম্মদ আবু তালিব, *লালন শাহ ও লালন গীতিকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, মে ১৯৬৮), পৃ. ৯৬।

৩ নিজস্ব সংগ্রহ : কথক মোহাজার আলী, বয়স– ৮২, পেশা–কৃষি, পিতা–আলী মোহাম্মদ সকরকার, গ্রাম–ঈশ্বরীপুর, পোঃ–প্রেমতলী, থানা– গোদাগাড়ি, সংগ্রহ তারিখ: ০১-১১-২০০৪।

৪ গোপিকারঞ্জন চক্রবর্তী, *ভবা পাগলার জীবন ও গান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী জুন ১৯৯৫), পৃ. ১০৬।

৫ ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক, *মরমি কবি পাঞ্জু শাহ: জীবন ও কাব্য*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ২০০১), পৃ. ৪০১।

৬ ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক, *মরমি কবি রকীব শাহ: জীবন ও সঙ্গীত*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ২০০১), পৃ. ১৮৬।

[৭] নিজস্ব সংগ্রহ : হাসান আলী সরকার, পিতা-ঈমান আলী সরকার, গ্রাম–ঈমান গঞ্জ, পোঃ– দামকুড়া, থানা–গোদাগাড়ি, বয়স–৭০, পেশা– কৃষি, সংগ্রহকাল: ৩-১১-২০০৪ ।

[৮] ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক, *মরমি কবি পাঞ্জু শাহ: জীবন ও কাব্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৫ ।

[৯] ফকির আনোয়ার হোসে (মন্টু শাহ), *লালন সঙ্গীত*, প্রথম খণ্ড, লালন সেবা সদন কমিটি, ছেঁউড়িয়া, কুষ্টিয়া, পৃ. ২২৮ ।

[১০] নিজস্ব সংগ্রহ: আবদুস সামাদ, পিতা- খোদা বকশ মণ্ডল, গ্রাম-ঈশ্বরীপুর, পূর্বোক্ত, সংগ্রহকাল: ২-১১-২০০৪ ।

[১১] নিজস্ব সংগ্রহ : হাসান আলী সরকার, পিতা-ঈমান আলী সরকার, গ্রাম-ঈমানগঞ্জ, পূর্বোক্ত ।

[১২] খোন্দকার রিয়াজুল হক, *মরমি কবি রকীব শাহ: জীবন ও সঙ্গীত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৭ ।

[১৩] ফকির আনোয়ার হোসেন (মন্টু শাহ), *লালন সঙ্গীত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩ ।

[১৪] খাজা শাহ মোঃ শামসুল হক চিশতি, *মরমি সংগীত দর্শন* (দুর্গাপুর, রাজশাহী, ১৯৯৪), পৃ. ২৭, গান নং-২৭ ।)

[১৫] নিজস্ব সংগ্রহ : কবি মকসেদ আলীর নিকট থেকে, সংগ্রহকাল: ১-১১-২০০৪ ।

[১৬] ফকীর আবদুর রশীদ, *সূফী দর্শন* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮০), পৃ. ১২২ ।

[১৭] বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *বাউল গান ও দুদ্দুশাহ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৩৭১), পৃ. ২৪ ।

[১৮] তদেব, পৃ.৩৬ ।

[১৯] কবি মকসেদ আলীর সঙ্গে সাক্ষাতকার, পূবর্বোক্ত, তারিখ : ১-১১-২০০৪ ।

[২০] তদেব, সংগ্রহকাল: ৩-১১-২০০৪ ।

[২১] নিজস্ব সংগ্রহ : মনসুর রহমান, পিতা-ঈমানী সরকার, গ্রাম–ঈমান গঞ্জ, পোঃ– দামকুড়া, থানা– গোদাগাড়ি, বয়স–৭০, পেশা–কৃষি, সংগ্রহকাল: ৩-১১-২০০৪ ।

[২২] ফকীর আবদুর রশীদ, *সূফী দর্শন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩ ।

[২৩] মোহিতলাল মজুমদার, *সাহিত্য বিচার*, পরিবর্ধিত প্রথম বিদ্যোদয় সংস্করণ, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, কলিকাতা, পৃ. ৪৭ ।

[২৪] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্য পথে*, পরিবর্ধিত সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৯ ।

[২৫] মনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্য দর্শনের ভূমিকা*, প্রথম সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ১৯ ।

[২৬] তদেব, পৃ. ২২ ।

[২৭] ক্ষুদিরাম দাস, *বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি*, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪ ।

[২৮] নিজস্ব সংগ্রহ : কবি মকসেদ আলীর নিকট থেকে প্রাপ্ত, সংগ্রহকাল: ০৫-১১-২০০৪ ।

[২৯] শুদ্ধসত্ত্ব বসু, *অলংকার জিজ্ঞাসা*,পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ. ১৮ ।

[৩০] নিজস্ব সংগ্রহ : কথক–ধুলু মৃধা, বয়স–৭০, পেশা–চাকুরী, গ্রাম–পবা পূর্ব নতুন পাড়া, পোঃ– সপুরা, থানা–শাহমখদুম, সংগ্রহকাল: ০৬-১১-২০০৪ ।

[৩১] ক্ষুদিরাম দাস, *বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি*, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা, পৃ.৪ ।

[৩২] নিজস্ব সংগ্রহ : কবি মকসেদ আলীর নিকট থেকে প্রাপ্ত, সংগ্রহকাল: ০৫-১১-২০০৪ ।

[৩৩] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক হাসান আলী সরকার, পিতা-মোসলেম উদ্দিন সরকার, গ্রাম–বলিয়া ডাইং, পোঃ– প্রেমতলী, থানা– গোদাগাড়ি, বয়স–৮২, পেশা–চাকুরী, সংগ্রহকাল: ০৩-১১-২০০৪ ।

[৩৪] নিজস্ব সংগ্রহ : কথক মনসুর সরকার, পিতা-ঈমানী সরকার, গ্রাম–ঈমান গঞ্জ, পোঃ– দামকুড়া, থানা– গোদাগাড়ি, বয়স–৭০ পেশা– কৃষি, সংগ্রহকাল: ০৩-১১-২০০৪ ।

[৩৫] নিজস্ব সংগ্রহ : কবি মকসেদ আলীর নিকট থেকে প্রাপ্ত, সংগ্রহকাল: ০৫-১১-২০০৪ ।

[৩৬] শশি ভূষণ দাশগুপ্ত, *সাহিত্য জগত*, উপমা কালিদাসস্য, নবসংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬।

[৩৭] ক্ষুদিরাম দাস, *বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।

[৩৮] নিজস্ব সংগ্রহ : আব্দুস সালাম ফকির, গ্রাম-পূর্ব ছোট বনগ্রাম, পোঃ- সপুরা, থানা-শাহমখদুম, বয়স-৬০, পেশা-ব্যবসা, সংগ্রহকাল: ৬-১১-২০০৪।

[৩৯] শুদ্ধসত্ত বসু, *অলংকার জিজ্ঞাসা* পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ. ১৮।

[৪০] নিজস্ব সংগ্রহ : কবি মকসেদ আলীর নিকট থেকে প্রাপ্ত, সংগ্রহকাল: ০৫-১১-২০০৪।

[৪১] ক্ষুদিরাম দাস, *বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭।

[৪২] নিজস্ব সংগ্রহ : শফিউল্লাহ সরকার, পিতা-ফসি উল্লাহ, গ্রাম-ব্রাহ্মণ পুষ্করিনী (ইদলপুর), পোঃ- প্রেমতলী, থানা-গোদাগাড়ি, বয়স-৮৩, তারিখ: ১১-১১-২০০৪।

[৪৩] বিনায়ক সান্যাস, *রবিতীর্থে*, প্রথম সংস্করণ, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-১৩৬৬, পৃ. ৩।

[৪৪] নিজস্ব সংগ্রহ : কথক-মোজাহার আলী, পিতা-আলী মোহাম্মদ সরকার, গ্রাম-ঈশ্বরীপুর, পোঃ- প্রেমতলী, থানা-গোদাগাড়ি, বয়স-৮২, পেশা-শিক্ষকতা, সংগ্রহকাল: ০১-১১-২০০৪।

[৪৫] আশরাফ সিদ্দিকী, *লোকসাহিত্য* (দ্বিতীয় খণ্ড) পরিবর্ধিত সংস্করণ, মুক্তধারা, ঢাকা-১৯৭৭, পৃ. ৩৪।

[৪৬] নিজস্ব সংগ্রহ : কথক- আবদুস সামাদ, পিতা-খোদা বক্স মণ্ডল, গ্রাম-ঈশ্বরীপুর, পূর্বোক্ত।

[৪৭] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান* (কলিকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, প্রথম সংস্করণ-১৯৫৭), পৃ. ১১০।

[৪৮] মোঃ আবদুল খালেক, *'তৌহিদ সাগর'* পূর্বোক্ত, পৃ. ১, গান নং-১।

[৪৯] মুহম্মদ আবূ তালিব, *লালন শাহ ও লালন গীতিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৯।

[৫০] খোন্দকার রফি উদ্দীন, *ভাব সংগীত* (হরিশপুর, ঝিনাইদহ। প্রকাশক: গ্রন্থকার, ১৯৬৮), পৃ. ৩ গান নং-১।

[৫১] নিজস্ব সংগ্রহ : কথক আবদুস সাত্তার, পিতা-এলাহী বকশ, গ্রাম-চকদূর্লভপুর, পোঃ- নন্দনপুর, ইউনিয়ন- ভালুক গাছি, থানা- পুঠিয়া, বয়স-৫৬, পেশা-কৃষি, সংগ্রহকাল: ১০-৯-২০০৪।

[৫২] ফকির আনোয়ার হোসেন মন্টুশাহ, লালন সঙ্গীত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯।

[৫৩] নিজস্ব সংগ্রহ : বাদশা ফকির, গ্রাম-শাদীপুর, পোঃ- সারদা, থানা- চারঘাট, বয়স-৫৫, পেশা- কৃষি, সংগ্রহকাল:১৪-৯-২০০৪।

[৫৪] মোঃ আবদুল খালেক, *'তৌহিদ সাগর'* পূর্বোক্ত, পৃ. ৩, গান নং-৪।

[৫৫] মুহম্মদ আবু তালিব, *লালন শাহ ও লালন গীতিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৯।

[৫৬] মোঃ আবদুল খালেক, *'তৌহিদ সাগর'* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮, গান নং-২৪।

[৫৭] তদেব, পৃ. ৪১, গান নং-৫০।

[৫৮] তদেব, পৃ. ৪০, গান নং-৪৮।

[৫৯] নিজস্ব সংগ্রহ : হামিদ আকবর হোসেন, পিতা-ময়েন মণ্ডল, গ্রাম-নন্দনপুর, পোঃ- নন্দনপুর, ইউনিয়ন-ভালুকগাছি, থানা- পুঠিয়া, বয়স-৬০, পেশা-চাকুরী, সংগ্রহকাল: ১০-৯-২০০৪।

[৬০] গোপিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, *ভবা পাগলার জীবন ও গান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০।

[৬১] মুহম্মদ আবূতালিব, *লালন শাহ ও লালন গীতিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯০।

[৬২] নিজস্ব সংগ্রহ : কথক-ফরিদ আহমেদ মংলা ফকির, গ্রাম-কৃষ্ণপুর, পোঃ ও থানা-পুঠিয়া, বয়স-৮০, সংগ্রহকাল: ১০-৯-২০০৪।

---

[৬৩] মোঃ আবদুল খালেক তৌহিদ সাগর, পূর্বোক্ত, ১৩৮২, গান নং-৯৩, পৃ. ৭৮।

[৬৪] তদেব, গান নং-৮২, পৃ. ৯৭।

[৬৫] তদেব, গান নং-৪৩, পৃ. ৪০।

[৬৬] তদেব, গান নং-১৮১, পৃ. ১৫৪।

[৬৭] তদেব, গান নং-১০৯, পৃ. ৯৩।

[৬৮] ড. মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, *লোককবি ময়েজ সা এবং তাঁর গান*, রাজশাহী এসোসিয়েশন পত্রিকা, স্মরণিকা ২০০০, ১২৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব : ১৮৭২-২০০০, পৃ. ৭৪।

[৬৯] নিজস্ব সংগ্রহ : ক্ষেত্রানুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত, 'পৈতার গান' ময়েজ সা-র কন্যা ফুলজান বিবির সৌজন্যে, গ্রাম : দক্ষিণ মিলিক বাঘা, থানা–বাঘা, জেলা– রাজশাহী, বয়স–৭৭ সংগ্রহের তারিখ : ১৯-৮-২০০৪।

[৭০] নিজস্ব সংগ্রহ : পৈতার গান, ময়েজ সা-র কন্যা ফুলজান বিবির সৌজন্যে প্রাপ্ত, পূর্বোক্ত।

[৭১] নিজস্ব সংগ্রহ : 'জমিদার ইংরেজদের গান' কথক– ময়েজ সা-র নাতি সিদ্দিক সা, গ্রাম– উত্তর মিলিক বাঘা, থানা–বাঘা, জেলা–রাজশাহী, বয়স– ৩৫, পেশা– ব্যবসা, সংগ্রহের তারিখ: ২৬-৮-২০০৪।

[৭২] নিজস্ব সংগ্রহ : 'জমিদার ইংরেজদের গান' কথক– ময়েজ সা-র নাতি সিদ্দিক সা, পূর্বোক্ত।

[৭৩] নিজস্ব সংগ্রহ : আমের গান কথক– ওহিদুর রহমান, সহকারী শিক্ষক, বাঘা উচ্চ বিদ্যালয়, বয়স– ৫৫, সংগ্রহের তারিখ : ২৭-৮-২০০৪।

[৭৪] নিজস্ব সংগ্রহ : পাইটের গান, কথক– ময়েজ সা-র পুত্র মজির উদ্দীন সা, গ্রাম : উত্তর মিলিক বাঘা, থানা– বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স– ৮৬, সংগ্রহের তারিখ: ২৫-৮-২০০৪।

[৭৫] নিজস্ব সংগ্রহ : 'পাকিস্তানের গান' ময়েজ সা-র পুত্র মজির উদ্দীন সা-র সৌজন্য প্রাপ্ত, স্থান: নিজবাস ভবন, উত্তর মিলিক বাঘা, সংগ্রহের তারিখ: ২৬-৮-২০০৪।

[৭৬] নিজস্ব সংগ্রহ : 'পাকিস্তানের গান' ময়েজ সা-র পুত্র মজির উদ্দীন সা-র সৌজন্যে প্রাপ্ত, পূর্বোক্ত।

[৭৭] নিজস্ব সংগ্রহ : 'পাকিস্তানের গান' ময়েজ সা-র পুত্র মজির উদ্দীন সা-র সৌজন্য প্রাপ্ত, পূর্বোক্ত।

[৭৮] মোহিতলাল মজুমদার, *সাহিত্য বিচার*, পরিবর্ধিত প্রথম বিদ্যোদয় সংস্করণ, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ পৃ. ১৯৯।

[৭৯] সুকুমার সেন, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, একাদশ সংস্করণ ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা, পৃ.২।

[৮০] শশিভূষণ দাশ গুপ্ত, *সাহিত্য জগত*, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, উপমা কালিদাসস্য, নব সংস্করণ, কলিকাতা, পৃ.৬।

[৮১] নিজস্ব সংগ্রহ : 'জমিদার ইংরেজদের গান' ময়েজ সার দৌহিত্র সিদ্দিক সা, পূর্বোক্ত, পৃ.

[৮২] মুহম্মদ আবদুল হাই, *ভাষা ও সাহিত্য*, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ইস্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ১৪৩।

[৮৩] নিজস্ব সংগ্রহ : বানের গান, কথক– আবদুস সাত্তার প্রামাণিক, পিতা: হাজী আবেদ প্রামাণিক, গ্রাম– চকছাতারী, পোঃ ও থানা– বাঘা, জেলা– রাজশাহী, বয়স– ৫৫, পেশা– কৃষি, সংগ্রহকাল: ২৫-৮-২০০৪।

[৮৪] নিজস্ব সংগ্রহ : ইসলাম ধর্মের গান, কথক– ময়েজ সা-র দৌহিত্র জিল্লুর রহমান সা, গ্রাম–উত্তর মিলিক বাধা, পোঃ ও থানা– বাঘা, জেলা– রাজশাহী, বয়স– ২৭, পেশা : চাকুরী তাং ২৫-৮-২০০৪।

[৮৫] নিজস্ব সংগ্রহ : কন্ট্রোলের গান, কথক– বাউল মফিজ পাগলা, পিতা: মোঃ ইমান আলী ফকির, গ্রাম– নিশ্চিন্তপুর, পোঃ– ও থানা– বাঘা, বয়স– ৫৫, পেশা–গান গাওয়া, সংগ্রহের তারিখ: ২৮-৮-২০০৪।

[৮৬] নিজস্ব সংগ্রহ : অব্যবসিকের গান, কথক– ময়েজ সা-র পুত্র মজির উদ্দীন সা, পূর্বোক্ত।

[৮৭] নিজস্ব সংগ্রহ : পাকিস্তানের গান, কথক– ময়েজ সা-র পুত্র মজির উদ্দীন সা, পূর্বোক্ত।

---

[৮৮] নিজস্ব সংগ্রহ : সাবেক বাঘার গান, কথক – আবদুল ওদুদ মাস্টার, গ্রাম–খালিদাস খালী, পোঃ ও থানা–বাঘা, পেশা–চাকুরী, বয়স–৫০ সংগ্রহকাল: ২৬-০৮-২০০৪।

[৮৯] নিজস্ব সংগ্রহ : কথক – শ্যামল কুমার দাস, গ্রাম–খায়ের হাট, পোঃ– ব্যাংগাড়ী, থানা–বাঘা, বয়স– ৩৮, পেশা–গান গাওয়া, সংগ্রহকাল: ১০-১১-২০০৪।

[৯০] ড. মযহারুল ইসলাম, *কবি পাগলা কানাই*, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলা বাজার ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ১৩৪।

[৯১] আহমদ শরীফ সম্পাদিত *বাউল কবি ফুলবাস উদ্দীনের পদাবলী*, বংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১০৯।

[৯২] বাউল কবি মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন খাঁর *জালাল গীতিকা* (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশক আবদুল হামিদ খান জালালী (কবির সন্তান), কেন্দুয়া, নেত্রকোণা, ১৯৮৬, পৃ.৩৭।

[৯৩] মুহাঃ কলিম উদ্দীন মিএগা, *গীতি বিচিত্রা*, বাঘা, রাজশাহী, ১৯৮৬, পৃ. ২৯, গান নং–২৯।

[৯৪] মুহাঃ কলিম উদ্দীন মিএগা, *গীতি বিচিত্রা*, বাঘা, রাজশাহী, ১৯৮৬, পৃ. ২৯, গান নং–২৯।

[৯৫] মুহঃ কলিম উদ্দীন মিএগা, *গীতি বিচিত্রা*, পূর্বোক্ত, গান নং-৩০।

[৯৬] অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান* (কলকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি ১৯৭৮), পৃ. ৪৫৬।

[৯৭] সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত *বাংলা দেহতত্ত্বের গান*, (কলকাতা : পুস্তক বিপণি ১৯৯০) পৃ. ৩৭।

[৯৮] মুহাঃ কলিম উদ্দীন মিএগা. *গীতি বিচিত্রা*, পূর্বোক্ত, গান নং–৩০।

[৯৯] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক – প্রবাস চন্দ্রদাস, গ্রাম–খায়ের হাট, পোঃ– ব্যাংগাড়ী, থানা–বাঘা, বয়স–৫০, পেশা– গান গাওয়া, সংগ্রহকাল: ১০-১১-২০০৪।

[১০০] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক – শ্যামল কুমার দাস, গ্রাম–খায়ের হাট, পূর্বোক্ত।

[১০১] মুহাঃ কলিম উদ্দীন মিএগা, *গীতি বিচিত্রা*, পূর্বোক্ত, গান নং–২৬।

[১০২] পূর্বোক্ত, গান নং–৩১।

[১০৩] পূর্বোক্ত, গান নং–২৬।

[১০৪] পূর্বোক্ত, গান নং–৩০।

[১০৫] নিজস্ব সংগ্রহ: হযরত খাজা মহসিন আলী চিশতির সৌজন্যে প্রাপ্ত। স্থান–নিজ বাস ভবন, গ্রাম– বলিহার, পোঃ–মনিগ্রাম, থানা–বাঘা, সংগ্রহকাল: ২০-১১-২০০৪।

[১০৬] ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত *বাউল কবি ফুলবাস উদ্দীন ও নসরুদ্দীনের পদাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬।

[১০৭] সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত *বাংলা দেহ তত্ত্বের গান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২।

[১০৮] তদেব, পৃ. ৪৫।

[১০৯] অধ্যাপক মোহাম্মদ গোলাম রসুল, সুফীবাদ ও লালন গীতি, খোন্দকার রিয়াজুল হক সম্পাদিত *লালন সাহিত্য ও দর্শন*, ঢাকা: ১৯৭৬, পৃ.৯৭।

[১১০] নিজস্ব সংগ্রহ: কবি মহসিন আলীর নিকট থেকে সংগৃহীত, পূর্বোক্ত।

[১১১] মুহম্মদ আবু তালিব,*লালন শাহ ও লালন গীতিকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৬৮), পৃ. ৪৬৫।

[১১২] ড.আহমদ শরীফ সম্পাদিত *বাউল কবি ফুলবাস উদ্দীন ও নসরুদ্দীনের পদাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।

[১১৩] কথক: মোঃ আবদুল আউয়াল, পিতা–মোঃ উমাজ উদ্দিন প্রামানিক, গ্রাম– মনিগ্রাম, পোঃ–মনিগ্রাম, থানা–বাঘা, সংগ্রহকাল: ২৮-১২-২০০৪।

[১১৪] নিজস্ব সংগ্রহ: হযরত খাজা মহসিন আলীর নিকট থেকে প্রাপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ.।

---

[১১৫] কথক : মোসাঃ এজমা খাতুন, পিতা- মোঃ উমাজ উদ্দিন প্রামানিক, গ্রাম- মনিগ্রাম, পোঃ-মনিগ্রাম, থানা-বাঘা, সংগ্রহকাল: ২৬-১২-২০০৪।

[১১৬] কথক: সুশীল কুমার সরকার, পিতা-সুধীর কুমার সরকার, গ্রাম- আটঘরিয়া, পোঃ- মনিগ্রাম, থানা-বাধা, বয়স-৪৫, পেশা-চাকুরী, সংগ্রহকাল : ২৭-১২-২০০৪।

[১১৭] অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, (ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি), কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ৫৭৮।

[১১৮] নিজস্ব সংগ্রহ: হযরত খাজা মহসিন আলী আল চিশতির নিকট থেকে প্রাপ্ত, পূর্বোক্ত।

[১১৯] সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, *বাংলা দেহ তত্ত্বের গান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯।

[১২০] বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, *বাউল গান ও দুদ্দু শাহ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৩৭১), পৃ. ৩৯।

[১২১] ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত *বাউল কবি ফুলবাস উদ্দীন ও নসরুদ্দীনের পদাবলী*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৮৮), পৃ. ১৬।

[১২২] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক - মোঃ জহুরুল ইসলাম, পিতা- মৃত জোনাব আলী প্রামানিক, গ্রাম-দেবত্তর বিনোদপুর, পোঃ-মনিগ্রাম, থানা-বাঘা, সংগ্রহকাল: ১৫-১২-২০০৪।

[১২৩] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক - গোরাম মোস্তাফা, পিতা-মোঃ উমাজ উদ্দিন মোল্লা, গ্রাম-মনিগ্রাম দক্ষিণপাড়া, পোঃ-মনিগ্রাম, থানা-বাঘা, বয়স-৫৫, পেশা-কৃষি, সংগ্রহকাল: ২৫-১২-২০০৪।

[১২৪] কথক - মোঃ হযরত আলী, বাস টিকিট মাস্টার, গ্রাম-মনিগ্রাম, পোঃ- মনিগ্রাম, থানা- বাঘা, বয়স-৬০, পেশা-চাকুরী, সংগ্রহকাল: ২৬-১২-২০০৪।

[১২৫] নিজস্ব সংগ্রহ: হযরত খাজা মহসিন আলী আল চিশতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত, স্থান -নিজ বাস ভবন, গ্রাম-লিহার, পোঃ-মনিগ্রাম, থানা-বাঘা, সংগ্রহকাল: ২০-১১-২০০৪।

[১২৬] শ্রীশচন্দ্র দাস, *সাহিত্য দর্শন*, মুহম্মদ মফিজুল ইসলাম (সম্পাদিত) বাংলাদেশ সংস্করণ, এম. এ. চৌধুরী প্রকাশিত, মনীর হোসেন লেন ঢাকা: ১৯৫৪, পৃ. ২০৩।

[১২৭] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক-কবির দৌহিত্র গোলাম রব্বানী, পিতা-মোকবুল হোসেন চিশতি, গ্রাম-চকছাতারী, পোঃ- ও থানা-বাঘা, জেলা-রাজশাহী, সংগ্রহকাল : ২৪-১১-২০০৪।

[১২৮] অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, লোক সাহিত্যে লালন গীতি, খোন্দকার রিয়াজুল হক সম্পাদিত, *লালন সাহিত্য ও দর্শন* (ঢাকা: মুক্তধারা ১৯৭৬), পৃ. ৭৬।

[১২৯] গোপিকারঞ্জন চক্রবর্তী, *ভবাপাগলার জীবন ও গান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৯৫), পৃ. ৬০।

[১৩০] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক - মোঃ আবদুল লতিফ, পিতা-হাজী মোঃ আবেদ আলী প্রামানিক, গ্রাম-চকছাতারী, পোঃ-বাঘা, থানা-বাঘা, জেলা-রাজশাহী।

[১৩১] নিজস্ব সংগ্রহ: কবির কনিষ্ঠ পুত্র মোঃ নুরুল হুদা চিশতি, অধ্যক্ষ (অবসরপ্রাপ), শাহদৌলা ডিগ্রী কলেজ, পোঃ- বাঘা, থানা-বাঘা, সংগ্রহকাল: ২৩-১১-২০০৪।

[১৩২] সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, *বাংলা দেহ তত্ত্বের গান*, কলকাতা, ১৯৯০,পৃ. ৫১।

[১৩৩] বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, *বাউল গান ও দুদ্দুশাহ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৩৭১), পৃ. ১২১।

[১৩৪] সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, *বাংলা দেহ তত্ত্বের গান*, কলকাতা, ১৯৯০,পৃ. ৩৩-৩৪।

[১৩৫] ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক, *মরমী কবি পাঞ্জু শাহ: জীবন ও কাব্য* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৯০), পৃ. ৫০৭।

[১৩৬] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক- কবির দৌহিত্র গোলাম রব্বানী, পিতা- মোঃ মোকবুল হোসেন চিশতি, পোঃ ও থানা-বাঘা, রাজশাহী।

[১৩৭] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক-কবির কনিষ্ঠ কন্যা জহুরা বেগম, গ্রাম-চকছাতারী, পোঃ ও থানা-বাঘা।

---

[১৩৮] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক–মোঃ ওহিদুর রহমান, পিতা–মৃত ওসমান খলিফা, গ্রাম–চকছাতারী, পোঃ ও থানা–বাঘা।

[১৩৯] মোঃ আব্দুল আলিম ফকির, *আলিম গীতি*, রাজশাহী জুন, ২০০৪, পৃ. ১৮।

[১৪০] মোঃ আব্দুল আলিম ফকির, *আলিম গীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।

[১৪১] পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮।

[১৪২] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯।

[১৪৩] নিজস্ব সংগ্রহ: মোঃ আমির আলী, পিতা–তামির আলী, গ্রাম–শিলপুর, পোঃ–বাগধানী, থানা–তানোর, বয়স–৬৯, পেশা–কৃষি, সংগ্রহকাল: ২-৯-২০০৪।

[১৪৪] মোঃ আব্দুল আলিম ফকির, *আলিম গীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭।

[১৪৫] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক–তুজির উদ্দিন খান, পিতা–জাহাঙ্গীর খান, গ্রাম–বাগধানী, পোঃ– বাগধানী, থানা–পবা, বয়স–৬৯, পেশা–কৃষি, সংগ্রহকাল: ৩-৯-২০০৪।

[১৪৬] হযরত খাজা খলিলুর রহমান চিশতি, *তৌহিদের আলো*, রাজশাহী, নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৪৪।

[১৪৭] হযরত খাজা খলিলুর রহমান চিশতি, *তৌহিদের আলো*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।

[১৪৮] হযরত খাজা খলিলুর রহমান চিশতি, *তৌহিদের আলো*, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৫।

[১৪৯] মুহম্মদ আবু তালিব, লালন শাহ ও লালন গীতিকা, (প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৯।

[১৫০] অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, (কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি ১৩৭৮), পৃ. ৯১৪।

[১৫১] ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত *বাউল কবি ফুলবাস উদ্দীন ও নসরুদ্দীনের পদাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮।

[১৫২] হযরত খাজা খলিলুর রহমান চিশতি, *তৌহিদের আলো*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৭।

[১৫৩] হযরত খাজা খলিলুর রহমান চিশতি, *তৌহিদের আলো*, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৪।

[১৫৪] নিজস্ব সংগ্রহ: কবির নিকট থেকে সংগৃহীত, সংগ্রহকাল: ১৪-৯-২০০৪।

[১৫৫] তদেব।

[১৫৬] হযরত খাজা খলিলুর রহমান চিশতি, *তৌহিদের আলো*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮।

[১৫৭] হযরত খাজা খলিলুর রহমান চিশতি, *তৌহিদের আলো*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬।

[১৫৮] হযরত খাজা খলিলুর রহমান চিশতি, *তৌহিদের আলো*, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৪।

[১৫৯] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক–মোঃ আতাউর ভাণ্ডারী, পিতা–মৃত সলেমান মণ্ডল, গ্রাম–বড় বনগ্রাম পাঁচআনীপাড়া, পোঃ–সপুরা, থানা–শাহমখদুম, জেলা–রাজশাহী, বয়স–৪৫, পেশা–কৃষি, সংগ্রহকাল: ২-২-২০০৫।

[১৬০] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক–মোঃ আলিম উদ্দীন ভাণ্ডারী, গ্রাম–উজির পুকুর, পোঃ– খড়খড়ি, থানা–বোয়ালিয়া, বয়স–৫৫, পেশা–কৃষি, সংগ্রহকাল: ২-২-২০০৫।

[১৬১] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক – মোঃ কেতাব আলী, পিতা- মোঃ জুব্বার মণ্ডল, গ্রাম–বড় বনগ্রাম পাঁচআনী পাড়া, পোঃ– সপুরা, থানা– শাহমখদুম, বয়স–৫৬, পেশা– কৃষি, সংগ্রহকাল: ০৩.০২.২০০৫।

[১৬২] মুহম্মদ আবুতালিব, *লালন শাহ ও লালন গীতিকা* (প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮২।

[১৬৩] বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, *বাউল গান ও দুদ্দুশাহ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৭১), পৃ. ২৭।

[১৬৪] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক–মোঃ আলিম উদ্দীন ভাণ্ডারী, গ্রাম–উজির পুকুর, পোঃ–খড়খড়ি, থানা–বোয়ালিয়া, বয়স–৫৫, পেশা–কৃষি, সংগ্রহকাল: ৩-২-২০০৫।

[১৬৫] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক–মোঃ আতাউর ভাণ্ডারী, পিতা–মৃত সলেমান মণ্ডল, গ্রাম–বড় বনগ্রাম পাঁচআনীপাড়া, পোঃ–সপুরা, থানা–শাহমখদুম, জেলা–রাজশাহী, বয়স–৪৫, পেশা–কৃষি, সংগ্রহকাল: ২-২-২০০৫।

[১৬৬] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক–মোঃ আলিম উদ্দীন ভাণ্ডারী, গ্রাম–উজির পুকুর, পূর্বোক্ত।

[১৬৭] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক–মোঃ আজগর আলী ভাণ্ডারীর নিকট থেকে সংগৃহীত, স্থান –নিজবাস বাস ভবন, গ্রাম–বড় বনগ্রাম পাঁচআনীপাড়া, পোঃ– সপুরা, থানা শাহমখদুম, বয়স–৩২, পেশা–ব্যবসা, সংগ্রহকাল: ২-২-২০০৫।

[১৬৮] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক– মোঃ শরীফুল ইসলাম, পিতা–মোঃ আবুল কাশেম সরদার, গ্রাম–মোক্তারপুর, পোঃ–মোক্তারপুর, থানা–চারঘাট, বয়স–৪০, পেশা–ব্যবসা, সংগ্রহকাল: ২৬-১১-২০০৪।

[১৬৯] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক– সৈয়দ আমজাদ হোসেন হায়দারীর ছেলে আবদুল্লাহ আল্ মামুনুর রশীদ, গ্রাম–শাদীপুর, ইউনিয়ন– ঝিকড়া, থানা–চারঘাট, বয়স–৩২, পেশা–ব্যবসা, সংগ্রহকাল : ২৬-১১-২০০৪।

[১৭০] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক– আইয়ুব আলী: পিতা–আজের প্রামানিক, গ্রাম–বথুয়া, ইউনিয়ন–শলুয়া,, থানা–চারঘাট, বয়স–৪০, পেশা–কৃষি, সংগ্রহকাল: ২৭-১১-২০০৪।

[১৭১] অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান* (কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি ১৩৭৮), পৃ. ৬৩৯-৬৪০।

[১৭২] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক–মোঃ মোনায়েম আলী, পিতা–মোঃ হারেজ আলী, গ্রাম–মোক্তারপুর, পোঃ–মোক্তারপুর, থানা–চারঘাট, বয়স–৪০, পেশা–কৃষি, সংগ্রহকাল: ২৮-১১-২০০৪।

[১৭৩] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক–মোঃ কোবাদ আলী, গ্রাম–খুঁটিপাড়া, পোঃ– বানেশ্বর, থানা–পুঠিয়া, বয়স–৫০, পেশা–ব্যবসা, সংগ্রহকাল: ২৮-১১-২০০৪।

[১৭৪] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক মোঃ আবদুল ওহাব, পিতা–আব্দুল জব্বার, গ্রাম–মোক্তারপুর, পোঃ–মোক্তারপুর, থানা–চারঘাট, বয়স–৪২, পেশা–ব্যবসা, সংগ্রহকাল: ২৮-১১-২০০৪।

[১৭৫] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক– মোঃ আবু তাহের, পিতা–আজের প্রামানিক, গ্রাম–জাফরপুর, ইউনিয়ন–শলুয়া, থানা–চারঘাট, সংগ্রহকাল: ২৮-১১-২০০৪।

[১৭৬] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক– মোঃ শরীফুল ইসলাম, গ্রাম–মোক্তারপুর, পোঃ–মোক্তারপুর, থানা–চারঘাট, বয়স–৪০, সংগ্রহকাল: ২৮-১১-২০০৪।

[১৭৭] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক–আইয়ুব আলী: পিতা–আজের প্রামানিক, গ্রাম–বথুয়া, ইউনিয়ন–শলুয়া,, থানা–চারঘাট, সংগ্রহকাল: ২৯-১১-২০০৪।

[১৭৮] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক–কবির সন্তান খাবীর আবদুল্লাহ আল জামাল, গ্রাম–কেশরহাট, পোঃ–কেশরহাট, থানা–মোহনপুর, জেলা–রাজশাহী, সংগ্রহকাল: ১৫,১-১১-২০০৪।

[১৭৯] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক– কবির সন্তান খাবীর আবদুল্লাহ আল জামাল, গ্রাম–কেশরহাট, পূর্বোক্ত।

[১৮০] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক–কবির সন্তান খালিকুজ্জামান শওকত, গ্রাম–কেশরহাট, পোঃ– কেশরহাট, থানা–মোহনপুর, সংগ্রহকাল : ২০-১-২০০৫।

[১৮১] ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক, *মরমি কবি রকীব শাহ: জীবন ও সঙ্গীত* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ২০০১), পৃ. ১৩৬।

[১৮২] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক–কবির সন্তান খালিকুজ্জামান শওকত, গ্রাম–কেশরহাট, পূর্বোক্ত।

[১৮৩] নিজস্ব সংগ্রহ: কবির মেয়ে কামরুন নেছা দিলআরা, গ্রাম–কেশরহাট, পূর্বোক্ত।

[১৮৪] তদেব।

[১৮৫] তদেব।

[১৮৬] নিজস্ব সংগ্রহ: কবির ছেলে খায়রুল্লাহ মোস্তফা কামাল, গ্রাম–কেশরহাট, পূর্বোক্ত।

[১৮৭] নিজস্ব সংগ্রহ: কবির মেয়ে কামরুন নেছা দিলখুশ, গ্রাম–কেশরহাট, পূর্বোক্ত।

[১৮৮] মোঃ আবদুর রহিম সরদার, বাংলা বাহিনীর খুন যখমের কবিতা, বাগমারা, রাজশাহী, ২০০৫, পৃ. ২-৪।

[১৮৯] মোঃ আবদুর রহিম সরদার, বাংলা বাহিনীর খুন যখমের কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃ.৩।

[১৯০] মোঃ আবদুর রহিম সরদার, বাংলা বাহিনীর খুন যখমের কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪-৫।

[১৯১] মোঃ আবদুর রহিম সরদার, বাংলা বাহিনীর খুন যখমের কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬।

[১৯২] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক-সলেমান, পিতা-আছিরুদ্দিন, গ্রাম-সূর্যপুর, পোঃ- বড়গাছি, থানা-পবা, বয়স-৫০, পেশা-কৃষি, সংগ্রহকাল: ২২-১১-২০০৪।

[১৯৩] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক-মোঃ শরিফ মণ্ডল, পিতা-রাজু মণ্ডল, গ্রাম-সবসার, পোঃ- বড়গাছি, থানা-পবা, বয়স-৭৫, পেশা-কৃষি, সংগ্রহকাল: ২০-১১-২০০৪।

[১৯৪] ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত *বাউল কবি ফুলবাস উদ্দীন ও নসরুদ্দীনের পদাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭।

[১৯৫] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক-মোঃ অড়ঙ্গ জেব, পিতা-সলেমান সরকার, গ্রাম-সবসার, পোঃ- বড়গাছি, থানা-পবা, বয়স-৩৪, পেশা-কৃষি, সংগ্রহকাল: ২০-১১-২০০৪।

[১৯৬] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক-মনসুর আলী, পিতা-শমসের আলী, গ্রাম-সূর্যপুর, পোঃ- বড়গাছি, থানা-পবা, বয়স-৩৬, পেশা-কৃষি, সংগ্রহকাল: ২১-১১-২০০৪।

[১৯৭] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক-আবদুস সালাম, পিতা-ময়েজ উদ্দিন, গ্রাম -সূর্যপুর, পোঃ- বড়গাছি, থানা-পবা, বয়স-৫০, পেশা-কৃষি, সংগ্রহকাল: ২১-১১-২০০৪।

[১৯৮] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক-সলেমান, পিতা-আছিরুদ্দিন, গ্রাম-সূর্যপুর, পোঃ- বড়গাছি, থানা-পবা, বয়স-৫০, পেশা-কৃষি, সংগ্রহকাল: ২১-১১-২০০৪।

[১৯৯] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক-মনসুর আলী, পিতা-শমসের আলী, গ্রাম -সূর্যপুর, পোঃ- বড়গাছি, থানা-পবা, বয়স-৩৬, পেশা-কৃষি, সংগ্রহকাল: ২১-১১-২০০৪।

[২০০] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক-আবদুস সালাম, পিতা-ময়েজ উদ্দিন, গ্রাম -সূর্যপুর, পূর্বোক্ত।

[২০১] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক-সলেমান, পিতা-আছিরুদ্দিন, গ্রাম -সূর্যপুর, পূর্বোক্ত।

[২০২] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক-শরিফ মণ্ডল, পিতা-বাজু মণ্ডল, গ্রাম-সবসার, পোঃ- বড়গাছি, থানা-পবা, বয়স- ৭৫, পেশা-কৃষি, সংগ্রহকাল: ২০-১১-২০০৪।

[২০৩] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক-শাহ মোঃ নদের আলী, পিতা-মোঃ হুরু শাহ গ্রাম-বেলগড়িয়া, ইউনিয়ন-পানানগর, থানা-দুর্গাপুর, বয়স-৬৫, পেশা-ফকিরী, সংগ্রহকাল: ২৪-৪-২০০৫।

[২০৪] নিজস্ব সংগ্রহ: ডাক্তার মাহবুবুর রহমান, পিতা-আবদুস সামাদ সরকার, গ্রাম-লক্ষীপুর, ইউনিয়ন কিসমত গণকৈড়, থানা-দুর্গাপুর, বয়স-৬৫, পেশা-পল্লী চিকিৎসা, সংগ্রহকাল: ২৫-৫-২০০৫।

[২০৫] অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান* (কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি ১৩৭৮), পৃ. ১০২২।

[২০৬] ড. আবুল আহসান চৌধুরী, সম্পাদিত *মহিন শাহের পদাবলী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৯৩), পৃ. ১৯।

[২০৭] আতাউর রহমান, পিতা-আরাজুল্লাহ শেখ, গ্রাম-উজালখলসী, থানা-দুর্গাপুর, বয়স-৫০, পেশা-ব্যবসা, সংগ্রহকাল: ২৬-৫-২০০৫।

[২০৮] শাহ আবদুর রহমান, *শরফুল ইনসান*, হামিদুর রহমান (সম্পাদিত), পুনর্মুদ্রণ প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪।

[২০৯] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক-সিদ্দিকুর রহমান, পিতা-সিরাজ শেখ, গ্রাম-উজাল খলসী, থানা-দুর্গাপুর, বয়স-৫০, পেশা-ব্যবসা, সংগ্রহকাল: ২৬-৫-২০০৫।

[২১০] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক-মোঃ আবদুস সাত্তার, পিতা-কিতাবুদ্দিন শেখ, গ্রাম- উজাল খলসী, থানা-দুর্গাপুর, বয়স-৫৫, পেশা-কৃষি, সংগ্রহকাল: ২৭-৫-২০০৫।

[২১১] নিজস্ব সংগ্রহ: কথক-আল হেলাল, গ্রাম-বোসপাড়া, পোঃ-ঘোড়ামারা, জেলা-রাজশাহী, বয়স-৫০, পেশা-ব্যবসা, সংগ্রহকাল : ২৭-৫-২০০৫।

[২১২] মোঃ খয়ের উদ্দিন, গ্রাম-নারায়ণপুর, পোঃ- পানানগর, থানা-দুর্গাপুর, বয়স-৫৫, পেশা-কৃষি, সংগ্রহকাল: ২৮-৫-২০০৫।

[২১৩] লাল মোহাম্মদ, গ্রাম-নারায়ণপুর, পোঃ-পানানগর, থানা-দুর্গাপুর, বয়স-৫৬, পেশা-দলিল লেখক, সংগ্রহকাল: ২৮-৫-২০০৫।

[২১৪] মোঃ হাতেম আলী, পিতা-মোঃ মল্লিকা, গ্রাম-উজালখলসী, থানা-দুর্গাপুর, বয়স-৩৫, পেশা-কৃষি, সংগ্রহকাল: ২৮-৫-২০০৫।

[২১৫] মোঃ আবদুল মান্নান, গ্রাম-দীঘলকান্দি, পোঃ-বানেশ্বর, থানা-পুঠিয়া, বয়স-৪৫, পেশা-ব্যবসা, সংগ্রহকাল: ২৯-৫-২০০৫।

[২১৬] আতাউর রহমান, পিতা-আরাজুল্লাহ শেখ, গ্রাম-উজালখলসী, থানা-দুর্গাপুর, বয়স-৫০, পেশা-ব্যবসা, সংগ্রহকাল: ২৬-৫-২০০৫।

[২১৭] কবি গোলাম জিয়ারত এর নিকট থেকে সংগৃহীত, স্থান -নিজ বাস ভবন, গ্রাম- উজালখলসী, থানা-দুর্গাপুর, সংগ্রহকাল-২৫-৫-২০০৫।

[২১৮] তদেব।

[২১৯] নিজস্ব সংগ্রহ: সিদ্দিকুর রহমান, পিতা-সিরাজ শেখ, গ্রাম ও পোঃ-উজালখলসী, থানা-দুর্গাপুর, বয়স-৫০, পেশা-কৃষি, সংগ্রহকাল: ২৬-৫-২০০৫।

[২২০] নিজস্ব সংগ্রহ: মোঃ আবদুস সাত্তার, পিতা-কিতাবুদ্দিন শেখ, গ্রাম ও পোঃ-উজালখলসী, থানা-দুর্গাপুর, বয়স-৫৫, পেশা-ব্যবসা, সংগ্রহকাল : ২৭-৫-২০০৫।

উপসংহার

সাধারণভাবে লোকসঙ্গীত লোকসাধারণের মানবিক ও আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশের বাহন। এছাড়া এটি লোকবিনোদনেরও অন্যতম প্রধান মাধ্যম। লোকসঙ্গীত অবশ্যই জীবনাশ্রয়ী। জীবনাশ্রয়ী বলেই এতে লোককবিদের সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া এবং ব্যথা-বেদনা প্রকাশিত হয়। সাধারণ মানুষের পরিবর্তনশীল জীবন এই লোকসঙ্গীতচর্চা ও পরিবেশনকেও নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করেছে। রাজশাহী অঞ্চলে জনমননন্দিত লোকসঙ্গীত তার নিজস্ব উদ্দীপক কিংবা বিনোদনমূলক চরিত্র ধারণ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা রাজশাহীর ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিবরণ দিয়েছি। পদ্মা, মহানন্দা, বড়াল, শিব ও বারনই বিধৌত পলিলালিত এবং পুণ্যাত্মা সাধক হযরত শাহ্মখদুম (রহঃ) ও হযরত শাহ্দৌলা (রহঃ) এর পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত রাজশাহী জেলা ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ একটি বিশিষ্ট জনপদ। এখানে আছে লোকসাহিত্যের সমৃদ্ধ সব উপাদান। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাজশাহীর প্রধান প্রধান লোককবির জীবনকথা তুলে ধরা হয়েছে। এ অঞ্চলের লোককবির নিজস্ব চিন্তাভাবনা, মতামত, তাঁদের জীবন যাত্রার মান, সামাজিক অবস্থান এবং আর্থিক সংকট-সমস্যার ব্যাপারটিও তুলে ধরা হয়েছে। দু' একজন ব্যতীত অধিকাংশ লোককবি দারিদ্র্যতাড়িত। অভাব অনটন জনজীবনের সীমাহীন দুর্ভোগ রাজশাহীর লোককবিদের প্রতিভা বিকাশের প্রধান অন্তরায়। পদ্মা বিধৌত রাজশাহী অঞ্চল বাংলাদেশের অন্যান্য সমতল ভূমি থেকে স্বতন্ত্র। যুগে যুগে নদী ভাঙ্গন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ফসলহানির কারণে পর্যুদস্ত এ অঞ্চলের বেশিরভাগ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে লোককবিরাও ক্রমশ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। তার পরেও সহজ জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত মানুষ গানের সুরতরঙ্গে জীবনকে উপভোগ করেন।

লোককবিদের সঙ্গীতচর্চা কিংবা গূহ্য আধ্যাত্মিক সাধনা এখন নানা কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন উদ্ভাবন, উন্নতি আমাদের জীবন যাপন পদ্ধতিতে এনেছে মৌলিক রূপান্তর। বস্তু ও ভোগবাদী চেতনার প্রচণ্ড আঘাতে ভাববাদের ভিত দিয়েছে নড়িয়ে। তার ওপরে আছে ক্রমবর্ধমান মৌলবাদী শক্তির প্রভাব। লোককবিরা মৌলবাদী কাঠ মোল্লাদের হাতে নিগৃহীত

হচ্ছে প্রতিনিয়ত। লোককবি বা সমজাতীয় সাধক সম্প্রদায়ের জন্য এ বড় দুঃসময়, ক্রান্তিকাল। বিপন্ন হয়ে উঠেছে তাঁদের অস্তিত্ব। তাঁদের গান অনেকের বিনোদনের উপকরণ হলেও তাঁদের জীবনের ক্লেশ ও দৈন্য বিষয়ে বৃহত্তর সমাজ উদাসীন। তবুও রাজশাহীর এই বৃহৎ লোকসাধনার ধারা থেমে নেই। লোককবিরা সঙ্গীত সম্প্রদায় গড়ে তুলেছে তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে। পীর-মুরিদি ব্যবসার আদলে লোককবিদের মধ্যে গুরুগিরি ব্যবসা চালু আছে। প্রতিকূল সময়ে হাজারো প্রতিবন্ধক ও অন্তরায় সত্ত্বেও লোককবিদের সাধনার ধারা আজও বহমান।

তৃতীয় অধ্যায়ে লোককবিদের সাহিত্যকর্মের নিদর্শন ও মূল্যায়ন বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে; এবং পরিশিষ্টে সংগৃহীত লোকসঙ্গীতগুলোর মধ্য থেকে বাছাইকৃত ভাব ও তত্ত্বমূলক দুইশ সঙ্গীত স্থান পেয়েছে। এগুলো বাঙলার একটি প্রধান লৌকিক ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাধন সঙ্গীত। বিশুদ্ধ শিল্প প্রেরণার বশে নয়, বিশেষ উদ্দেশ্যমগ্ন হয়েই লোককবিরা এ গান সৃষ্টি করেন। মরমিবাদী লোককবিরা মনে করেন– মানুষের মুক্তির পথই হল মানব সেবা। মানবভজন বা গুরু ভজনের মাধ্যমে মানুষের আত্মা মুক্তি পাবে, খোদার দিদার লাভ করবে। তাঁরা গুরুকে পরমসত্তা বা মনের মানুষ হিসাবে মনে করেন। তাঁদের মতে মানুষের বাস এই দেহের মধ্যে। তাঁরা মানব জীবন ও মানব দেহকে পরম সম্পদ বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন, 'যা আছে এই ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে মানব ভাণ্ডে। তাঁদের সাধানার মূল দেহকে অটল করা বা দীর্ঘায়ু লাভের চেষ্টা করা। তাঁরা সাধনালব্ধ বিষয়ের নির্যাসে সঙ্গীত রচনা করেন। এবং এ সঙ্গীতের মাধ্যমে তাঁরা সে মনের মানুষকে ধরার চেষ্টা করেন। মানব দেহের মধ্যেই সাঁই লুকিয়ে আছেন। নিগূঢ় দেহ সাধনার মাধ্যমে পরমাত্মাকে পাওয়া সম্ভব।

সমুন্নত কল্পনা, বিপুল আবেগের সংহত গভীরতা ও প্রকাশের অনবদ্য কৌশল লোককবিদের সঙ্গীতে আমরা লক্ষ্য করেছি। লোকসঙ্গীতগুলো বর্তমান যুগের আলোকপ্রাপ্ত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের রচনা নয়। যাঁরা বর্তমান যুগের অনুপাতে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত তাঁরা এ গানের রচয়িতা। এ সব সরল বিশ্বাসপ্রবণ, ধর্মপথের যাত্রী পল্লীবাসীদের রচনায় ভাব ও ভাষা সুবিন্যস্ত নয়, শৈলীগত পরিমার্জনারও সচেতন প্রচেষ্টা নেই। তাঁদের ভাবানুভূতি স্বতোসারিত। এই রচনায় উপমা বা রূপকের বিষয়গুলো তাঁদের চারপাশে দেখা প্রত্যক্ষ বস্তু হতে সংগৃহীত। নিতান্ত

আটপৌরে এবং আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় তাঁদের হৃদয়ের আনন্দ ও আর্তির অকপট রূপায়ণ ঘটেছে। প্রকৃতির নিজস্ব সম্পদের মতো এ রচনা স্বাভাবিক, সহজ, সরল ও অযত্নবর্ধিত।

বিষয়বস্তুর সীমাবদ্ধতার জন্য লোকসঙ্গীতে একটি একঘেঁয়েমি বর্তমান আছে। একই বিষয় নিয়ে সকলেই গান রচনা করেছেন। মূলে তত্ত্ব ও সাধনার ঐক্য থাকার জন্য বক্তব্য প্রায় একই রকম। কেবল ভাষা ও উপস্থাপনের মধ্যে প্রভেদ; তার দ্বারাই একের গান হতে অন্যের গানের যা-কিছু পার্থক্য সূচিত হয়। এখানে কবির ব্যক্তি মানসের স্বাধীন অভিব্যক্তির স্থান নেই। তাই দেখা যায় গুরুতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, পারাপার তত্ত্বের সঙ্গীতের ভাব ও তত্ত্বের দিক হতে মূলত প্রায় সবই সমান। ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনা হলেও ভাব-কল্পনার পার্থক্য, নতুনত্ব বা দৃষ্টি-ভঙ্গীর মৌলিকত্ব বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু বিষয়বস্তুর সীমাবদ্ধতা, ধর্মতত্ত্ব ও সাধনপ্রণালী বর্ণনার শুষ্কতা সত্ত্বেও গানগুলির মধ্যে সহজ কবিত্ব শক্তির ও সাহিত্যরস পরিবেশনের চেষ্টা আছে।

রাজশাহী অঞ্চলের লোককবিদের মার্জিত-অমার্জিত ভাষায় রচিত সঙ্গীতগুলোতে এখানকার লোকচরিত্র ও আধ্যাত্মিক সাধনার পরিচয় বিধৃত হয়েছে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ সব লোককবি একটি গৌরবময় আসনের অধিকারী, এতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষাভাষী জনসাধারণ চিরদিন তাঁদের কবি-কর্ম, তত্ত্বভাবনা ও মানবিকতা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। এ জেলার প্রতিটি থানার প্রত্যেকটি ইউনিয়নের পথে-প্রান্তরে দীন দরিদ্রের কুটিরে গৃহস্থের আঙিনায় আমরা লোককবিদেরকে অনুসন্ধান করেছি। অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে সশ্রম অনুসন্ধানে যা কিছু সংগৃহীত হয়েছে তার আলোকে এ জেলার লোককবিদের জীবনালোখ্যের একটা রূপরেখা পরিস্ফুট হবে। আলোকিত হবে তাঁদের মানবিক ও মরমিসাধনার মর্মকথা এবং উম্মোচিত হবে রাজশাহী অঞ্চলের লোকমানসের রহস্যাবরণ।

পরিশিষ্ট

ক. সংগৃহীত লোকসঙ্গীতগুলোর নির্বাচিত সংকলন

১. মোঃ মকসেদ আলীর গান

১.

মানব দেহ গুপ্ত কাবা
শোনরে মন তোরে বলি
সেথায় যারা হজ করিল
তারাইতো কুতুব ওলি ॥

কত হাজির আনা গোনা
সেই কাবার ভেদ কেউ পেলনা
থাকতে আঁখি হোসনে কানা
অন্ধের কথায় ভুলি ॥

মন যদি তুই সেথায় যাবি
ছয় রিপুকে জয় করিবি
মুর্শিদ মওলার বয়াত নিবি
জ্ঞান কপাট যাবে খুলি ॥

এই পৃথিবীর মাঝখানেতে
কাবার ঘর সেই জাগাতে
চেতন গুরুর সঙ্গ নিতে
তাই তোকে এসব বলি ॥

ঐ কাবাতে যায়রে যারা
জিন্দা থাকতে মরছে তারা
শাহ্ গণী কয় মালী নেড়া
না বুঝে তুই পড়ে রলি ॥

২.

ভজলে মানুষ ওরে বেহুঁস
আখেরে তরাবি
মানুষ ছেড়ে ভজলে নিরূপ
ত্রিকূল হারাবি ॥

মানুষে সাঁই গাঁথা
মিথ্যা নয় সত্য কথা
জানগা তুই মানুষ ধরে
হিসাব নিকাশি ॥

মুর্শিদ মওলা ওরাও মানুষ
বুঝে দেখ ওরে বেহুঁশ

ধরবি যেদিন মুর্শিদের হাত
সেদিন বুঝবি ॥

কর্তার কর্ম করণ গুণে
দৈব বাণী কর্ণে শুণে
মালী ঠসা বুদ্ধি নাসা
হীন, বে-লেহাজি ॥

৩.

অটল কামে এত মধু
জানতাম না আগে।
কামেতে পীর নাম জপিলে
শমন্‌দার দূরে ভাগে ॥

কামের ঘরে মেরে তালা
প্রেম সাগরে কর খেলা
রঙ্গীন ঐ সাগরের পানি
রাঙ্গাবে রঙ্গিন রাগে ॥

ঘন ঘোর মেঘের ফাঁকে
বজ্র নিনাদ লুকিয়ে থাকে
মিলন নদীর বাঁকে ধরবি
বিজলী বান অনুরাগে ॥

যুগল নদীর মিলন কালে
ঢেউয়ের পাহাড় সমান তালে
সাঁই গণী মালীকে নিয়ে
চলে ঢেউয়ের আগে আগে ॥

৪.
যে দেহের ভাণ্ড রক্ষা করে
সেই তোর পুর্ণ মানুষ
পরোপকারী হবে সে জন
মহী মতে সু পুরুষ ॥

ধর্মের টান মন আকর্ষণ
চুম্বকের কাম লোহকর্ষণ
দীন দুনিয়ার ধর্মকর্ম
শিখতে কাম কর হুঁস ॥

অভাব যার রয় চিরকাল
তারাইতো এ দীনের কাঙ্গাল
অলস জীবন দুঃখের ভারে
অধর্মের সে খায় ঘুষ ॥

গণী শাহ্ কয় মালীরে তোর
দুঃখের নিশি হবে যে ভোর
নির্ভয়ে তুই কাম করে যা
পাবিরে ঝর্ণা পীযুষ ॥

৫.

ঝিনুকেতে মুক্তা মিলে
সে থাকে ঐ সিন্ধু জলে
পাড়ে বসে ঢেউ গুনিলে
তার ভাগ্যে কি সে ধন মিলে ॥

জানি কমলে কণ্টক আছে
ভয়ে যে জন না যায় কাছে
কেমন করে পাইবে সে
না যদি সে নামে ঐ জলে ॥

পঞ্চ রসের রসিক যারা
ডবুরী হইয়াছে তারা
তাদের কাছে দিচ্ছে ধরা
সত্যি সে ধন তারা তোলে ॥

ভবে যে জন প্রেম ডবুরী
জিন্দা থাকতে গেছে মরি
ভরে নিচ্ছে আট কুঠুরী
জয় গুরু জয় গুরু বলে ॥

গণী শা কয় মালী একটি
কর সাধনা এটে নেংটি
ঝোলা মালা চিমটা কলকি
যাবে যে তোর সব বিফলে ॥

৬.

কি আজব এই মানব জনম
গড়েছেন ঐ মালেক সাঁই।
সৃষ্টির সেরা মানব গড়ে
তার ভিতর নিজে লুকায় ॥

জ্ঞান বিজ্ঞানের চিত্ত মাঝে
স্বরূপে সাঁই রূপ বিরাজে
তাই ফেরেস্তা সিজদা দিল
আজাজিল তা বুঝে নাই ॥

আরাধ্যের এক ঘর গড়িল
আজাজিল তাও না মানিল

সেই হতে সে ইবলিশ হয়ে
সৃষ্টিতে ঘুরে বেড়ায় ॥

গণী শাহ কয় মালী হাবা
ঐ ঘরের নিদর্শন কাবা
পীর জ্ঞানে ঐ ঘরে যাবা
নইলে যে তোর মুক্তি নাই ॥

৭.

মানব জনম শ্রেষ্ঠ জনম
এ জনম আর পাবেনা
চার চিজে চার মিলে যাবে
আত্মার মরণ হবে না।

জীব আত্মার মুক্তির তরে
আসে যায় বারে বারে
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে
ঘুরেও মুক্তি মিলে না ॥

বাহিরেতে ধর্ম আচার
জাতি ভেদের কর বিচার
বদ্ধ জ্ঞানে মুক্তির আধার
বহির্বিশ্বেও পাবে না ॥

গণী শাহ কয় মূল তত্ত্ব
মালীরে তোর মনুষ্যত্ব
অসুর রূপে হয়ে মত্ত
আত্মাকে তুই চিনলিনা ॥

৮.

সুভাব ছাড়া অধরাকে
ধরা নাহি যায়।
অচেনা সেই অধর পাখি
চেনা বিষম দায় ॥

বিশ্বব্যাপী এক তরঙ্গে
খেলছে খেলা রঙ্গে ঢঙ্গে
মিশে ভাবুকের সঙ্গে
নিজে পথ দেখায় ॥

অধরাকে ধরবি যদি
রূপসাধন কর নিরবধি
নিঝুম নিঃশব্দ আদি
বসবি নিরালায় ॥

অধরা ফাঁদ তোর মুর্শিদ
সে যদি না দেয় তার ভেদ
গণী কয় শোনরে মালী
তার জীবন বৃথায় ॥

৯.

মনরে আমার দীন কানা
হোল না তোর বেচা কেনা
লাভ করতে হলি দেনা ॥

পুঁজি ছিল তোর ষোল আনা
ময়ূর পঙ্খি তরী খানা
মাঝি এক ছজন দাঁড়ী
তারই মধ্যে কারখানা ॥

বৈদেশের বাণিজ্যে এসে
রাজশাহীর হাটে বসে
দস্তা পিতল কিনলি শেষে
চিনলিনা আসল সোনা ॥

পুঁজি শেষ হয়েই গেল
বেচা কেনাও বন্ধ হল
ফেরার পথে ঘরে যেতে
আসল পুঁজি থাকল না ॥

শাহ গণী কয় চিন্তা করি
কেমনে মালী যাবি বাড়ি
ছজন দাঁড়ী করে আড়ি
পারে যেতে পারবিনা ॥

১০.

এ বিশ্ব বাজারে মহাজন দ্বারে
আসে কত খরিদ্দার
কেউ কিনে রাং শিসা আবার
কেউবা স্বর্ণ অলঙ্কার ॥

কেউবা আসে মূল জহুরী
মুক্তা মাণিক করতে চুরি
কেউ কষ্টিতে পরখ করি
ভব সিন্ধু হয় যে পার ॥
কেউ আসে এই প্রেম নগরে
আসল নকল চিনিবারে
ছয় চোরের পাল্লাতে পড়ে
মূলধন করে সাবাড় ॥

গণী কয় মালী গাঁওয়ালী
না বুঝে তুই সব খুয়ালি
ছেঁড়া ঝোলায় দিয়ে তালি
ভরলে তোর যা দরকার ॥

১১.

মণি হারা ফনীর মতো
ঘুরবিরে তুই কতকাল
মুর্শিদ মাওলায় বায়াত নিলে
পাবিরে তোর হারানোমাল ॥
মুর্শিদ কাব্য না করে হেলা
কাম করে যা তিন বেলা
অরূপ মণির মীন খেলা
খেলবি তুই কালাকাল ॥
মুর্শিদ যে তোর কর্ম দিশা
করলে কাম পুরবে আশা
সবার পাবি ভালবাসা
সুখ পাবি অনন্তকাল ॥
বিশ্বাস নাই মুর্শিদে যার
ধর্ম কর্ম হবে না তার
শাহ্ গণী কয় মন্ত্রণার ভার
বইবি মালী চিরকাল ॥

১২.

যে গঙ্গা পার হয়ে এলাম
সেই গঙ্গা সামনে দেখি
আমার উপায় কি
পঞ্চ ভূতের অতনু ভাব
দিন রাত্রি কৈতব স্বভাব
তাই মনে ভয় ভর করেছে
তোমার দয়া আর পাব কি ॥
রিপু ছয় জন জোট বেঁধেছে
রুষ্ট রোষে সং সেজেছে
সদায় তাদের বিরান ফন্দি
কোন সময় করেই বা কি ॥
ঘোর অন্ধকার অকূল পাথার
চৌদিকেতে না দেখি কিনার
তোমার আশায় তীর্থে এসে
দেখছে মালী কীর্তি একি ॥

১৩.

যেথায় ভাংগে আয়ুর চর
মোহের বশে মাটির মানুষ
সেথায় বাঁধে ঘর ॥

বোকায় চাঁদ দেখে জলে
ঝাঁপ দেয় চাঁদ ধরব বলে
স্রোতের টানে যায় গভীরে
হারায় আপন নর ॥
কাল সায়রের নাবিক যেজন
তরণী তার চলে দ্বিগুণ
সপ্ত সায়র পাড়ি দিতে
ও সে থাকে হুঁশিয়ার ॥
গণী শাহ্ মালীকে বলে
তরণী বেয়ে যাবে চলে
দেখবি সেথায় ঈন্দ্র পুরী
আজব সুখ শহর ॥

১৪.
যে পথ দিয়ে এলি ভবে
সেই পথ দিয়ে চল,
সাধের জীবন পুর্ণ হবে
তুই পাবিরে সুফল ॥
সুদ্ধ শুচি জীবন গেহ
বেসাত ভরা হবেরে দেহ
বিজলী বাতি উঠবে জ্বলে
পথ করবে উজ্জ্বল ॥
মাসে মাস ভরা ভাদর
ভেসে আসে সোহাগ আদর
পথ সরণির মোড়ে মোড়ে
মায়ার যাদু কল ॥
শাহ্ গণী কয় ওরে মালী
পরের কথায় পথ হারালী
ঐ পথ ছাড়া নাই কোন পথ
নাই কোন সম্বল ॥

১৫.
ত্রিবেণী তীর্থ পথে যাবি যদি আয়
শুক্লা তিথির ষোল কলায়
পুলক পূর্ণিমায় ॥
গুরু বাক্য মাথায় নিয়ে
চলবি তুই অপলিদ হয়ে
শিতাংশুর সেমুষি পথে
সুর মায়া জড়ায় ॥
ধী-শক্তি প্রেম নিষ্ঠা বিনে
কার সাধ্য সেই এরেম চিনে
কৈবাল্যের ভাব নিদর্শনে
থাকবি সর্বদায় ॥
ভাব বিনিময় সেথায় হবে

প্রাকাশ্যতায় মুগ্ধ রবে
শাহ্ গণী কয় দেখবি মালী
মিলন মোহনায় ॥

১৬.

কাম কেলির পাক বিন্দু সাগর
উছলে উঠলে ত্রিধারায়
দাওহে পাড়ি নবীন নাগর
ত্রিবেনীর ফণীর ফণায় ॥
ফণীর ফণায় কেলী করণ
আসবে তোমার মরণ শমন
কৌশলে বশ কইর তারে
যেন শমন ফেরৎ যায় ॥
সেই নদীর ঐ জোয়ারেতে ঢেউয়ে খেলায় পানি
তারই মাঝে ঝিলিক মারে
খোদ শক্তি আসমানী
ঐ সময়ে সেই মাবুদ মাওলা
কেলি করে শোন পাগেলা
দেখলে না বলিস মালী
দশের মাঝে নিজ ভাষায় ॥

২. মোঃ আবদুল খালেকের গান

১৭.

সহস্র 'কাবা' হতে একটি হৃদয় মূল্যবান।
খোদে-খোদা 'হৃৎ কাবাতে' আছে বর্তমান ॥

কাদা মাটি ইষ্টক পাথর
ইবরাহীমের বানানো ঘর,
দেহ মক্কা আরব শহর
খোদা বিরাজমান ॥

'হৃৎ কাবা' খোদ 'নুরে' গঠন
বসত করে খোদ-নিরঞ্জন
স্বরূপে রূপ করে দর্শন
হাজী আশেকান ॥

এতিবর কয় খালেকেরে
'নফ্স যে চিনতে পারে
সে নামাজ পড়ে কাবার ঘরে,
হাকিকতে হাজী নাম ॥

১৮.

মুরর্শিদের বীজ মন্ত্র যার কানে রয়।

রতি রণে জিতে সাধক হওয়া সহজ হয় ॥

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপর
মানব দেহ আজব শহর
সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ির খবর
আগে করতে হয় ॥

চৌদ্দ নাড়ি প্রধান তাহার
উৎপত্তি হয় মুলাধার
ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না যার
আদ্যমূল গোড়া হয় ॥

ইড়া পিঙ্গলা দুই নাশাতে
সুষুম্না বয় মাঝখানেতে
ছয় ঋতু চব্বিশ ঘণ্টাতে
সদা পরিবর্তন হয় ॥

পঞ্চ বায়ু সুষুম্নারে
মন মহাজন বাধ্য করে
প্রাণ অপানযোগের ঘরে
যুক্ত কর খালেক কয় ॥

১৯.

আমি কোন্ সাধনে প্রেমের দেশে যাই।
'কাম নদীর' তরঙ্গ ভারী পারে যাওয়ার সাধ্য নাই ॥

'প্রেমামৃত' করিতে পান
ঝরার ঘাটে বাঁধ বাঁধিলাম
কাম নদীর এক বেজায় তুফান
ভাঙ্গিলরে সে বাঁধাই ॥

'কামের সঙ্গে প্রেমের ধারা'
একই সাথে বয় তাহারা
কি প্রকারে যায়গো ধরা
কামে-প্রেমে যোগ সদাই ॥

'কামছাড়া প্রেম' কেমনে করি
প্রেমে মিলে 'পয়গম্বরী'
কত মহাজনের ডুবলো তরী
ভাব না জেনে খালেকও তাই ॥

২০.

'কামের গাছে প্রেমের ফল মরি কি বাহার।
সে 'ফল' যে খাইয়াছে ধন্য হইছে জিন্দেগি তাহার

‘প্রেম’ বাগিচার সদর দ্বারে,
গাছের গোড়ায় ‘মূলাধারে’
দুলিতেছে অনির্বার॥

দুমুখে সে দংশন করে
যে সেথা যায় ফিরে নারে
যোগী ঋষি যাচ্ছে মরে
‘মদন’ জ্বালায় বেহুশিয়ার ॥

উর্ধ্ব তালা রূপ নিহারো
প্রেমের বাণে সর্প মারো
যদি মহারণে জিততে পারো
পাবি ফলের অধিকার ॥

‘মুদিত কমলে’ সে ‘ফল’
‘প্রেম শৃঙ্গারে’ কর সফল
এতিবর কয় খালেক সামাল
কি দশা দ্যাখ্ আদম হাওয়ার’ ॥

২১.

কাম না থাকলে ‘রাম’ থাকে কোথায়।
‘আধ্যাত্মিক’ শক্তির বলে ধরে যখন ‘জীবাত্মায়’ ॥

আধ্যাত্মিক মধ্যাকর্ষণ
অনন্ত ব্যাপী বাহু বন্ধন
সে কামনায়ে হয় নিমজ্জন
কামনায় সাধনা হয় ॥

স্রোতস্বিনী যায় বহিয়া
মহা সাগর বক্ষে ডুবিয়া
সৌরবিশ্ব চন্দ্র সূর্যাদি নিয়া
হারকিউলিসে গতিময় ॥

অন্তিমে সাধনা যেমন
আকৃতি করিবে ধারণ
খালেক কয় চরিত্র কেমন
আমরণ যোগ তপস্যায় ॥

২২.

ভক্তি-রসের বাদাম দিয়া।
‘কাম-নদীতে প্রেমের তরী উজানে যাও বাহিয়া ॥

উদয় ‘রতি-কাম নদীতে’
‘রসের’ আগম তারি সাথে
‘অচিন-মানুষরস রতিতে
খেলছে খেলা নাচিয়া ॥

সেই 'রসের রসিক' যারা,
'রসের কারণ জানে তারা,
অরসিক সব যাচ্ছে মারা
কু বাতাসে পাল তুলিয়া ॥

অভক্ত কি জানে খবর
'কাম'নদীতে প্রেমের নহরঃ
পান করে যে হয় সে অমর
খালেক মইল জল সেচিয়া ॥

২৩.

'শরিয়তের গাছে ফলে' মারিফাতের ফল।
'মুর্শিদ' ধরে খবর করে জেনে নাও ভেদ এ সকল ॥

'আদম নগর আহমদ পুর'
জ্বলছে বাতি'নুর আলা নুর'
গাছের গোড়া 'বায়তুল মামুর'
'মুহাম্মদ' গাছের বাকল ॥

বারো মাসে ফুটে 'ফুল'
আশেক ভ্রমর রসে আকুল
চিনো গিয়া সেই ফুলের মূল
প্রেমরসে ফল টলমল ॥

'হাকিকতের' মই লাগাইয়া,
তরিকতের ডালে বইয়া
'মোরাকাবায় ফল পাড়িয়া
খালেক কর কাম সফল ॥

২৪.

পানির মাঝে আছে 'মামুর' 'বায়তুল মসজিদ ঘর'।
সেই ঘরে কে পড়ছে নামাজ জাননি খবর ॥

চারদিকে রয় চারটি সাগর
চারটি ধারা বয় নিরন্তর
'মাসে মাসে' হয় সরোবর,
'তিনদিন' বয় উজান জোয়ারে ॥

কোন সাগরের কিবা নাম হয়
উৎপত্তি কাহারো কোথায়
কি রঙ্গেতে কোন ধারা বয়
মিশছে গিয়া কোন সাগর ॥

'এ কেমন আজব কুদরতি,
জলের মাঝে ঘর বানাই করছে বসতি;

খালেক কয় 'মসজিদের' মূলটি
জানলে হয় নামাজের খবর ॥

২৫.

'হাকিকতের কাবাতুল্লায়কে যাবিরে আয়।
'মুর্শিদ-ইমাম' খাড়া কর মারিফতের 'মুছাল্লায় ॥

'বিছমিল্লাহের' নকশা ধর
আবে কাওছার পান কর
'আলিফে ধাক্কা মার
'মিমের নুক্তা' কর টল ॥

'হুআল্লা-হুদোমের ঘরে'
তালা মারো শক্ত করে,
'বাকা-বিল্লার' রশি ধরে
উঠ মোকাম 'সাত' তলায় ॥

নাই ইহ পর পতন উত্থান
চির শান্তি শান আবাদান
আবে হায়াত-লা মাকান'
খালেক কয় সেদুরে নয় ॥

২৬.

কেমনে দিবি পাড়ি, মন তুই কেমনে দিবি পাড়ি।
জীর্ণতরী শীর্ণদেহ মাল্লা ছয়জন হয় আনাড়ি ॥

"অথৈ সাগর ঢেউ এর বছর তুফান বইছে ভারী
তার উপরে বিজলী হানে কালো মেঘে করছে আড়ি ॥

ডাকছে নদীর ভীষন বান
ভয়েতে কেঁপে উঠে প্রাণ
নিম্নগতি স্রোতেরই টান
ঢেউয়ে ঢেউয়ে আড়ি।

হু-হুংকারে ভেঙ্গে পড়ে দুই ধারেরো পাড়ি;
কু বাতাসে বাদাম ফাঁসে তরী করে গড়াগড়ি ॥
ঝলকে ঝল্‌ক উঠে পানি
ঘুর্ণি পাকে লইছে টানি
লোনা জলে দেয় উস্কানি
হাল ছেড়ে দেয় দাঁড়ি।

মাল্লা ছ'জন যুক্তি কইরা মূলধন নিল কাড়ি;
কে তোরে উদ্ধার করিবে তীরে নাইকো বসত বাড়ি ॥

কঠিন পাড়ি ভাব-দরিয়ার
পারে যাওয়ার সাধ্য কাহার,
না গেলেও পাবি না পার
'লা-মোকাম' তোর বাড়ি।

এতিবর কয় মুর্শিদকে দাও নৌকার চড়নদারী;
খালেক আনন্দে পার হইয়া যাবি 'সপ্ত সাগর' তাড়াতাড়ি ॥

২৭.

দিন থাকিতে চিনে নাও 'আপন জনা'।
'আহমদের-মিমের' তালা খুলে ঘরে ঢুকনা-ঢুকনা ॥

আওয়ালে প্রেম ধনাগারে'
'যাতে' নিরাকার পারোয়ারে
মাহবুবের মহব্বতে দিওয়ানা।
আশেকে বিভোর হইয়া
'মহর নবুয়ত ধরিয়া
হু হুংকারের গর্ভে গিয়া
মিলন হইল তৎক্ষণা ॥

তাতে হইল মুহাম্মদ
আব-আতশ খাক-বাদ
আবুদিয়াত নুরেরই গঠনা।
পুতুলে ফুঁকিল দোম
নুরেতে হইল রৌশন
আল-হাম্‌দু বলে আদম
খাড়া হইল তৎক্ষনা ॥

আদমে মিলে আহাদ
হাওয়াতে রয় আহ্মদ
যুগ যুগান্তর এইতো প্রেমের খেলা।
আদম-আর আদমি মিলে
মুহাম্মদি খেলনা খেলে
'মিমের' তালার অন্তরালে
খালেক কয় মন দেখনা ॥

২৮.

আয় খাজা আয় দেরে দিদার।
তু-ছেওয়া ম্যাঁয় হুঁ বেকারার ॥
তু-হ্যায় মাবুদ্ তু-হ্যায় মাকছুদ,
তু-হ্যায় মাতলুব্ তু-হ্যায় মাওজুদ,
তু-হ্যায় মেরে খোদ বে-খোদা,
আয় মাহবুব মেরে পেয়ার ॥

তু-মেরে মাদিনে ওয়ালা,
তু-হ্যায় মেরে কামলিওয়ালা,
তু-হ্যায় মেরে দিলওয়ালা,
তু-হ্যায় মেরে সাক্বী কাওছার ॥
দেরে দেখা দে আশেকে,
ফরিয়াদ লে, শাহী পাকে,
ফয়েজ দিদার দে খালেককে
আয় খাজা হযরত এতিবর ॥

২৯.

মুর্শিদ আমার মানুষ নয়রে
সে দ্বীনের কাঙ্গাল পরম : মানুষ রূপে চলে ফিরে
যে তারে জেনেছে যেমন,
তার কাছে সে দেখায় তেমন,
আমি দেখি খাছ নিরঞ্জন
ফেরেস্তার রূপে আমার ঘরে ॥
উম্মিগণে দীক্ষা দিতে
পাপী তাপী উদ্ধারিতে
তৌহিদের বাণী ঠোঁটে
বেড়ায় মুছাফিরী বেশটি ধরে ॥
আরব হইতে বোগ্‌দাদেতে,
বোগদাদ্‌ হইতে পাঞ্জাবেতে,
পাঞ্জাবে হইতে মুর্শিদাবাদে
রঙ্গে রঙ্গে গৌরীপুরী ॥

'তৌহিদ সাগর' কে দিবি পাড়ি
খালেক বলে আয় তাড়াতাড়ি
হযরত এতিবরের দাউন ধরি
কালুহাটি মাটির ঘরে ॥

৩০.

মানুষ ছাড়া খোদা কি আছে
মানুষ ধর মানুষ চিন খোদার বিধান হয় মানুষে ॥
সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পুরে
এল সে নুর রঙ্গে রঙ্গে
আত্মারূপে প্রতি ঘটে
যেমন স্বরবর্ণ ব্যঞ্জণ বর্ণে মিশে ॥

যেমন ধুঁয়াতে মেঘে মেঘে জল
পুষ্পে মধু তাতেই ফল
সেরূপ আদমে আলেফ লুকাল
দাল মিমে আসন করেছে ॥

এতিবর কয় ধাপে ধাপে
খালেক মজে বলি কতই আশে
কলি যুগে মানুষ রূপে
কে নাম প্রকাশে ॥

৩১.

কায়েম কর দায়েমী ছালাত্
আচ্ছালাতো মুশাহেদ এছমে আহ্মদ ॥
সাম্নে ছালাত কর খাড়া
যাতে আল্লা দিবে সাড়া
হরদমে চাই নামাজ পড়া
চব্বিশ ঘন্টা দিনে রাত ॥

আহাদ নামের সাথে
নামাজ পড় বেলায়াতে
আয়নাল একিন হতে তাতে
রাজী হবে পাক জাত্ ॥

ছালাতের ভেদ রয় মেরাজে,
চক্ষু ঠাণ্ডা হয় নামাজে,
খালেক মিছে লোক সমাজে
লম্বা কথায় মারে শাঠ ॥

৩২.

কারে শুধাই এসব কথা কে বলবে আমায়।
মক্কর করে হক্কর মেরে পুলছেরাত পার হইতে চায়।
লম্বা জামা দাড়ি টুপি তছবি আর চুলে,
ঠক্ ঠকা ঠক্ সেজদা দিলে খোদা কি ভুলে
তবে কেন আয়াত দিলে পাক কালাম মাউন-ছুরায়
আল ইন্সানু সিররিহি ওয়া আনা সিররুহু
মান আরাফা নাফ্ছাহু ফাকাদ্ আরাফা রাব্বাহু
আন্তা' বুদু লা কায়ান্না কাতারাহু
হাদীছ কুদ্ছী রাছুল কয় ॥
খোদার ভেদ মানুষ, আর মানুষের ভেদ খোদা কয়,
রব্কে চিনিবার আগে নফ্ছকে তাই চিন্তে হয়:
এতিবর কয় খালেক নিরালায় কর আত্মার পরিচয় ॥

৩৩.

পড় বিছ্মিল্লাহের রাহ্মানের রাহিম।
বিছ্মিল্লাহ্র অমৃত সুধা পান কর ভাই আশেকীন ॥
বিছমিল্লাহ্র মিম হইতে,
পানির নহর বইছে তাতে
অটল খেলা আবহাওয়াতে
দেখনা মন রাত্র-দিন ॥

দুধ-দধি-ছানা-মাখন
দুধেতে রয় সংমিশ্রণ
আল্লাহর 'হে' কার মৈথন
দুধের পেয়ালা চিন্ ॥
"আররাহ্ মান" মিম যেটা,
সারাবান তোহুরা সেটা
পান কর অমৃত সুধা
হয়ে যাও খাঁটি মোমিন ॥
বিছ্মিল্লাহ্র অর্থ কর
সবই পাবে তার ভিতর
মধুর পিয়ালা ধর
নিররাহিমের শেষের মিম ॥
আরও একটি পিয়ালা আছে
খোজ কর মুর্শিদের কাছে
হযরত এতিবর কয় সময় আছে
খালেক মুর্শিদ কাছে হও তালকীন ॥

৩৪.

কোরআন্ খুলে দেখরে-মন- ইন্সান।
মক্কায় গিয়া হজ করিলে কয়না তারে মোসলমান ॥
হাজী হইয়া হয় মোনাফিক্
মন তোর নিজের কাবাই হ'ল না ঠিক্
তুই মাটির কাবা করলি তাহ্কিক্—
আদমের খলিলের বানান ॥
আপন দিলকে আবাদ করা
তাতে আক্বরী হজ সবার সেরা
হাজার কাবার চেয়েও সেরা
খুশি করা একটি প্রাণ ॥
মিজাজী কাবায় হজ করিয়া
হাজী খেতাব লাভ করিয়া
মাথায় একটি টুপি দিয়া
তছবি টান ছুবে' শাম ॥
অন্ধ হইয়া মরিও না
অন্ধের দোযখ ঠিকানা
আহমদ নগরে যাওনা
হাকিকি কাবার কর সন্ধান ॥
মিমের পর্দা কর উত্থান
আহাদ সেথায় রয় বর্তমান
দিলের কাবায় দিন গুজরান
জুল জালালে ওয়াল একরাম ॥
এতিবর কয় খালেক মূঢ়
যদি হজ করিতে বাঞ্ছা কর
মুর্শিদের পায়রুবি কর
চব্বিশেই হজের নিশান ॥

৩৫.

অনুমানে নামাজ হবে না।
নামাজ মানে স্মরণ করা, মাথা টিপায় ফল হবে না ॥
"আচ্ছালাতো মিরাজুল মোমেনিন্"
হাদীছ কুদ্ছী নবীর বচন
নামাজেতে আল্লাহর দর্শন;
পাইছ কি ভাই সব জনা ॥
জায়নামাজকে ভাব এমন
পায়ের নীচে পুলছেরাত
নড়া-চড়া করলে হঠাৎ
নীচে দোযখ হাবিয়া খানা ॥
নামাজে নব্বই হাজার কালাম পাবে
রাছুলুল্লার দিদার হবে
এতিবর কয় খালেক তবে
ঘুচ্‌ল না তোর দীন-কানা ॥

৩৬.

আল্লাহর আশেক যেবা কাবাতে তার কি দরকার।
সে জন দিন-দুনিয়া তরক করে মাওলার এস্কে বেকারার ॥
আপন কাবার খবর হয়না
চলে যাও মক্কা মদীনা
পাইয়াছ কি ও ভাই মনা
মাওলাজির দিদার ॥
মশনবী শরীফ দেখিবা
খলিলের বানানো কাবা
সেথায় গেলে কি ধন পাবা
তৈয়ারী মাটি কাদার ॥
যে কাবাতে খোদা মিলে
সে কাবার খোঁজ না করিলে
(খোদা) জাতি নুর তাহাতে দিলে
নিজ হাতে করে তৈয়ার ॥
নিজকে নিজ চেনাতে
আপন এস্কে আপনি মাতে
এতিবর কয় সেই কাবাতে
ডুব খালেক যাবে বিকার।

৩৭.

আদমকে চিনরে ইনসান
আদমকে চিনিলে পরে মিলিবে খোদার সন্ধান ॥
আরশ-কুরছি লওহ্ মাহ্‌ফুজ
রূহু সিংগা বার বুরুজ
বেহেস্ত দোযখ চন্দ্র সুরুজ
তাজিম করে হুর গেলেমান্ ॥

জ্বিন ইনসান ফেরেস্তারা,
আচ্ছামায়ে নুর সেতারা
আলমে আরওয়াহয়ারা
আদমের করিল ধ্যান ॥
এতিবর কয় খালেকেরে
আমানত্ দেয় আদমেরে
আদমের পায়রুবি করে
সমগ্র জমিন আসমান ॥

৩৮.

কও দেখিরে মুছল্লী সমাজ ?
পাঁচ নবীর পাঁচ পাঞ্জেগানা আমার নবীর কোন্ নামাজ
নবী মিরাজেতে যায়; পাঁচ নবীর পাঁচ পাঞ্জেগানা
আল্লাহ্ ভেজিলেন তাহায়।
রোজা-নামাজ্ চার কলেমা জাকাত আর হজ ॥
হেরা পর্বতের গুহায়,
মসজিদ ছেড়ে নুর নবী কেন ধ্যানে মগ্ন হয়,
খোদা সেই খানেতে ওহী করে
মসজিদে কি হয় নারাজ ॥
জিব্রাইলে ওহী করে
তবু কেন পাক দরবারে উঠাইয়া লয় হাবীবেরে;
কেন জিব্রাইলকে ফাঁকে রেখে করে মিরাজ।
কেন ২৭ বছর আয়ু ক্ষয়?
খালেক বলে কোন্ নামাজে খোদা রাজী হয়;
সত্য করে কও মুছল্লি, আমার দ্বীনের নবীর কিবা কাজ?

৩৯.

বেহেস্তের দরজার কাছে আবেহায়াতের নহর।
সেই নহরে বান ডেকে যায় প্রতি মাস-অন্তর ॥
যে জন ঘরের বাসিন্দা হয়,
বান ডাকিলে জানিতে পায়,
হইলে সুযোগ্য সময়
সেই নহরে দেয় সাঁতার ॥
পান করে অমৃত সুধা
থাকে না আর তৃষ্ণা ক্ষুধা
আনন্দে পান করে সদা
বেহেস্তি কাওছার ॥
খুল্লে তালা আজিমুশ্বান
দলে দলে হুর গেলেমান,
আত্মায় আত্মায় প্রেমালিঙ্গন
করে সেই ঘরের ভিতরে ॥
আয় কে জান্নাতে যাবি
চক্ষু শীতল সেই করিবি

ছালাত হয় জান্নাতের চাবি
খালেককে কয় এতিবর ॥

৪০.

আপনারে চিন্‌লে পরে অচিন্‌ চেনা যায়।
আপ ছুরাতে আদমপুরে হেকমাতে করে আশ্রয়।
প্রতিটি শ্বাস্‌ প্রশ্বাসে
অচিন মানুষ যায় আর আসে
খোদ খোদা আছে মিশে
খুদিতে তার পরিচয় ॥
লাহুত-নাছুত্‌-মাল্‌কুত্‌ জাব্‌রুত্‌
পঞ্চমেতে মোকাম হাহুত্‌
"নুর আলা নুর" এল্‌মে অজুদ্‌
মীম মোকামে ঝলক দেয় ॥
যেথায় নুরের আওনা-যাওনা
অচিনের সেথায় ঠিকানা
এতিবর কয় খালেক কানা।
আসমান্‌-জমিন্‌ খুঁজে বেড়ায় ॥

৪১.

মাহ্‌মুদা নগরে রে
রূপের বালা রূপে ঝলক্‌ মারে।
সেই রূপ যেই দেখেছে সেই মজেছে
পেয়েছে স্বরূপ-ধরে ॥
(নগরের) সাম্‌নে একটি বাগান আছে
(পিছনে) দুই পাশে দুই পাহাড় আছে
সুড়ঙ্গ একপথ রয়েছে
দুই পাহাড়ের মাঝেরে ॥
(দেখ) ঘর একখানা রয় উজালা
(তাতে) লাল ইয়াকুতের দুটি পাল্লা
খুল্লে তালা রূপের 'গুলা'
ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়েরে ॥
(হযরত) এতিবর কয় সেই ঘরেতে
শ্বেত বর্ণের এক গম্বুজ ত'াতে
দেখ্‌না খালেক তার কাছেতে
রূপের জ্যোতি ছড়ায় রে ॥

৪২.

তারে ধরবি যদি মনরে আমার
ফাঁদ পাত ত্রিবেণীর ঘাটে।
হয়তো ফাঁদে পড়তে পারে
যদি থাকে তোর ললাটে ॥
ভক্তি রশি পাকাইয়া

ফাঁদ পাত মজবুত করিয়া
এস্কের আধার তাতে দিয়া
তুমি থাক ত্রিবেনী তটে ॥
শুনরে মন কই তোমারে
থেক সদা হুঁশিয়ারে
নইলে দুর্বিপাকে পড়বি ফেরে
ফাঁদ পাতার সাধ যাবে ছুটে ॥
"আল্ ওয়াদুদু" নামটি তাহার
অধরা অচেনা জনার
খালেক বলে সেযে আমার
এতিবর শাহ্ কালু হাটে।

৪৩.

ফানা ফিল্লার ঘাটে গিয়ে চালাও তরী এছমে জাতে।
নইলে ঘুর্ণিপাকে দূর্বিপাকে তরী মারা যাবে ঘাটে ॥
চাইওনা কাম নদীর জলে
হাঙ্গর কুম্ভীর দলে দলে
বৈঠা মার তালে তালে
লক্ষ্য রাইখ হাইল কাঁটাতে ॥
বিজলী চমক্ দিবে যখন
হুঁশিয়ার থাকিও তখন
ভাটির পাড়ি না দাও সুজন
বাইয়া চল উজানেতে ॥
দম কষে দম কর ফানা
বাধ্য কর ঐ ছয় জনা
চলবে তরী আর ঠেকবে না
লাগাও রশি এছবাতেতে ॥
হযরত এতিবর কয় খালেকেরে
ভাব না জেনে হঠাৎ করে
যাইও না নদীর কিনারে
নইলে ডুবে মরবি কাম নদীতে ॥

৪৪.

ধারা চিনে ধর পাড়ি সুল্তানুন্ নাছিরাতে
নাছুত্-দরিয়ার উর্ধ্বদিকে নিঃশব্দেতে
বাইয়া চল আস্তে আস্তে
তে-মোহনায় বেজায় তুফান
কুটা পড়লে অমনি তিন খান
ক্ষণপ্রভা নয় তার সমান
অতি-উজ্জ্বল চাঁদ হইতে ॥
জ্যোতির্ময় রূপ প্রেম-প্রতীমা
দেখলে তারে জ্ঞান থাকে না
পাগল-সাধু দরবেশ কত জনা

দেখবি সে রূপ ত্রি-ধারাতে ॥
ঐ রূপেতে মত্ত হইয়া
চালাও তরী নিরখিয়া
দ্বাদশী-যুবতী চাইয়া
দেখ খালেক সেই জা'গাতে ॥
এতিবর কয় সেই দেশেতে
(এখন) যদি বাঞ্ছা কর যাইতে,
বাঁধাল দেওগে ঝরার ঘাটে
নইলে ডুবে মরবি পলকেতে ॥

৪৫.

সপ্ত রংগে সপ্তধারায় বইতেছে সপ্ত সাগর।
(এই) সপ্ত সাগর পাড়ি দিলে- মাহমুদা নগর ॥
মাসে সাত্ দিন উজানে বয়
একশত আটষট্টি ঘন্টায়
তিন দিন বয় অমাবশ্যায়
নৌকা তোমার রাইখ নোঙ্গর ॥
সপ্তদিনের শেষ দিনেতে
লক্ষ্য কর সামনেতে
মাহমুদা নগর হইতে
বইতেছে একটি নহর ॥
ঐ নগরের সম্মুখেতে তিন কোণার একদিঘি রয়
(সেথা হ'তে) শ্বেত বর্ণের এক ধারা বইয়া (ভব)
সাগরে মিশায়
খালেক সেইধারাতে নৌকা চালাও
পাবিরে কিনার ॥

৪৬.
হাকিকতি কাবার নীচে পাবি নুরের ঠিকানা।
এই কাবাতে হজ করিলে, মনের বিকার থাকে না ॥
কাবাতুল্লার নিম্ন অংশে
মীমের এক দরিয়া রয় ॥
শ্বেত বর্ণের পানি তা'তে
ভব সাগরে মিশায়।
পান করে যেই আশেক জনা শমনের ভয় থাকে না ॥
ডানে "হেজ্ রাতুল্ আছ্ওয়াদ্"
বামে মোকাম এবরাহিম;
কৃষ্ণ বর্ণের দুইটি পাথর
দেখ ছালেহ্ মোত্তাকীন্ ।
পঞ্চ বর্ণের পাথর দ্বারা
বানাইল ঘর ছয় কোনা ॥
"মোরা কাবা-মোশাহেদায়"
বসে আছে ছয় জনা।
লাল ইয়াকুতের দুইটি-পাল্লা

দেখরে খালেক দ্বীন কানা।
এতিবর কয় মিথ্যা নয়
দেখলে আর শুনতে হয় না ॥

৪৭.

হাউজে কাওছারের খবর জান মুসলমান।
সপ্তম আসমানের উর্দ্ধে একটি নহর প্রবাহমান ॥
মতি হিরা ইয়াকুতের বাংলো, কুঠি রয় সেথায়
জলাশয়ের মধ্যে সুন্দর পাখী রয়।
যারা ভোগ করবে সেই পাখীগুলি
অতি ভাগ্যবান ॥
সু-সজ্জিত স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র রয় তাহার পাশে;
হিরা-মাণিক মণি মুক্তার কাঁকর বিছান তলদেশে ॥
দুগ্ধ হইতে অধিক সাদা
নবীজীর ফরমান ॥
কস্তুরী অপেক্ষা অধিক সুগন্ধ "আবে-কাওছার"
মধু হইতে অধিক মিষ্টি বোখারী হাদীছ প্রচার
হযরত আনাছ হইতে হয় বর্ণিত—
খালেক কর তত্ত্ব সন্ধান ॥

৪৮.

আমি সর্ব ভূতে বিরাজমান।
মায়া মুক্ত শুদ্ধ-বুদ্ধ সরল শান্ত শ্রী ভগবান ॥

'কুম্ভকে' দোম আটকাইয়া
'বৈরাগ্য' রূপ অস্ত্র দিয়া
'মায়ার বন্ধন' লই কাটিয়া
আমি পরব্রহ্ম-জ্যোতিস্মান ॥

'নিগুন' ও 'সগুন' আমি
'দৈব-শক্তি অন্তর্যামী'
'পুরুষোত্তম ঈশ্বর আমি'
'আমি বিশ্বরূপে বিদ্যমান ॥'

'কর্মযোগী আমিত্ব' নাশ
পটে পরব্রহ্মের প্রকাশ
খালেক বলে 'সাধু সন্ন্যাসে'
কর্ম বন্ধন মুক্ত প্রাণ ॥

৪৯.

কর মুর্শিদ ধরে সাদেকি প্রেম সাধনা।
'ইশকে ইলাহী' হাছিল কর যত মোমিন-মোমিনা ॥

প্রেমেতে হয়ে মত্ত,
চিত্ত কর প্রজ্জ্বলিত
লাভ কর 'অমরত্ব'
যাত ছিপাতে হও ফানা ॥

"ফানাফিশ শায়েখুল্লাহ"
'ফানা-ফির রাছুলুল্লাহ'
'ছিবগাতিল্লা-ফানাফিল্লাহ
দিদারে পাক রাব্বানা।
প্রেমেতে হইয়া অটল
লাভ কর জান্নাতি ফল
তবেই খালেক হবে সফল
"বাকাবিল্লাহ্" মূল ঠিকানা ॥

৫০.

মাওলার অপার লীলা কে বুঝতে পারে।
"ডিমের ভিতরে মিমের নুক্তা-লাম-আ'লিফ তার ভিতরে ॥"

খুনে রাঙ্গা লোহিত সাগর
সরোবর হয় ফিমাস অন্তর,
লালে লাল রয় চব্বিশ প্রহর
চাঁদের মুখে রাহু ধরে ॥

'ষোলকলা পুর্ণ হলে
'চাঁদ দেখা যায় অগাধজলে'
দ্যাখো জ্ঞানের নয়ন খুলে
'ডিম ভাসে চাঁদের' উপরে ॥
পঞ্চ রং সেই ডিমের বরণ
'রাজ হংসের' ভাব করে ধারণ
কর খালেক ডিম্ব' হরণ
দ্যাখো সাঁই নিরঞ্জন' খেলা করে ॥

৫১.

কোরাআনেরই মূল রহস্য আছে লাওহে মাহফুজে।
তরিকতে দাখিল হয়ে জানতে পারো মুর্শিদ ভজে ॥

অদৃশ্য লিপি লিখিত
উম্মুল কিতাবে নিহিত
গৌরবময় সুরক্ষিত
'রাছুল রাছেখ' তারাই বুঝে ॥

আত্ম-শুদ্ধি সাধন যাহার
সেইতো বুঝে কোরানের ভার
কাঠ মোল্লা কি মৌলবী তার
আসল তত্ত্ব পায়না খুঁজে ॥

পাক কোরান কালামুল্লাহ্
পৃথক নহে রাছুলুল্লাহ্
পরমাত্মা হয় রূহুল্লাহ্
খালেক কয় তাইতো আলেম পীর পূজে ॥

৫২.

'তরিকতের পথে যেতে দ্বিধা আছে যার'
সে কভু কি যেতে পারে 'তৌহিদ সাগর' পার ॥

'তৌহিদ সাগর' কঠিন পাড়ি
বেলা আছে দণ্ড চারি,
দ্বিধা সংকোচ সকল ছাড়ি
'মুর্শিদ করগা সার ॥

দরিয়ার অতল গভীরে,
হাঙ্গর কুম্ভির ঘুরে ফিরে
সুযোগ বুঝে কোন ফিকিরে
জানে মালে করে সংহার ॥

মুর্শিদকে তরী বানাইয়া,
মাল্লা ছয়জন বশ করিয়া
হাকিকতের বৈঠা নিয়া
তুমি হওগে কর্ণধার ॥
এতিবর কয় খালেকেরে
হারাইয়া পারের সম্বল নদীর কিনারে
বসে কাঁদিলে আর কি হবেরে
তরী কিনারে লাগবেনা আর ॥

৫৩.

'মুহাম্মদি নুরের গাছে ফুল ফুটেছে
'আহমদ' সেই ফুলের আকার।
মুর্শিদ ধরে খবর করে লেনা জেনে
যাবে মনের ঘোর অন্ধকার ॥

'পাঁচ পাঞ্জাতন' 'ফুলে মিলন কি মনোরম' পঞ্চ কলি ফুলের বাহার,
'লাই—লাহাতে' পাঁচ কলিতে আকারেতে 'নফি' হলে হয় নিরাকার ॥

'ইছবাতে' 'ফল কি অবিকল' ইল্লাল্লাতে কর বিচার।
'মিম' হরফকে 'নফি' করে দেখনা ওরে' 'আহাদরূপ' ধরেছে এবার ॥

'পাঞ্জাতন' নুরে মিশে যায় 'আরশে' অবশেষে হয় নিরাকার'।
এতিবর কয় খালেকেরে মক্কাতে আবদুল্লার ঘরে
যেজন 'ফুল' চিনে 'ফল' ধরতে পারে ফলের মাঝে একুল সংসার ॥

৫৪.

ঘরে ঢুকে দেখনা তোরা।
চুনি মতি লাল জোয়াহের চার রঙ্গে বার্নিশ করা ॥
জলের মাঝে 'শুকনা জমিন' বায়তুল্লার ঘর' খাড়া।
উর্ধ্বে ধারা বয় চার রঙ্গে গভীরে বয় তিনটি ধারা ॥

আরব সাগর লোহিত সাগর,
অমৃত ভূমধ্য সাগর
চার দরিয়ার মাঝখানে ঘর
উপরে সাজারা।

ত্রিধারার যোগো বসে হু-গলী নদীর ধারা।
উপরে দুই খাম্বার পরে রয়েছে ব্রীজ হাওড়া ॥

শূন্য ভরে দুটি পাষাণ
ঝুলানো রয়েছে মিজান
যার নিক্তির কাঁটা আছে সমান
ঢুকতে পারে তারা

এতিবর কয় কেমন করে যাবি মুর্শিদ ছাড়া।
ঢুকতে পারলে দেখতে পাবি 'বারো বুরুজ' 'সাত সিতারা' ॥
ঢুকে দেখনা তোরা
ঘরে ঢুকে দেখনা তোরা ॥

৫৫.

কাম নদীতে প্রেমের' জোয়ার।
কাম ছাড়া কি প্রেম আগমন, কামে প্রেমে একাকার ॥

পান করবো 'প্রেম নদীর বারি'
কাম নদীর তরঙ্গ ভারী
'পরম গুরু' পারের তরী
কাম গুরু হয় কর্ণধার ॥

কামে প্রেমে যুক্ত কর
যোগে বোসে মৈথন কর
দোমের ঘরে আসন কর
নইলে জীবের নাই উদ্ধার ॥

পরম সঙ্গ চরম প্রীতি
'সর্ব ঘটে একই নীতি
'কাম-রসে' হয় 'প্রেমের স্থিতি'
খালেককে কয় এতিবর ॥

৫৬.

কালু হাটির মাঠে ঘাটে সেরূপের ঝলক দিতেছে।
সেরূপ যে সেধেছে সেই পেয়েছে, জ্ঞান অন্ধরা পায়না দিশে ॥

সেই রূপের পরশ পাইয়া
ত্রিভুবন উঠিল গাইয়া
দ্বীন কানারা না বুঝিয়া,
আঘাতের পর আঘাত দিচ্ছে ॥

হেদায়েত নছিব যাহার
রূপ সাগরে দিচ্ছে সাঁতার
'মূলাহেদ কাফের' জনার
দেলে মহর মারা আছে ॥

মুহাম্মদি পর্দার মাঝে
আহমদে আহাদ বিরাজে
এই মানুষে সেই মানুষ আছে
খালেক সেরূপেতে মজিয়াছে ॥

৩. মোঃ ময়েজ উদ্দীন সা'র গান

৫৭.

পাকিস্তানের গান (১৩৫৫)

শুনেন যত মুসলমান ভাগ্যগুণে পেলাম পাকিস্তান
একবার ধন্যমনে বদন ভরে বল আল্লা নবীর নাম ॥
ভাগ্যগুণে পেলাম পাকিস্তান।

ছিল নবাবের বাদশাহী আমরা কানে শুনতে পাই
ইংরেজ এলে কেড়ে নিল তার রাজত্ব নাই
ইংরেজ যিশু খ্রিস্ট ভজন করে আমরা বলি খ্রিস্টান
ভাগ্যগুণে পেলাম পাকিস্তান।

আমরা পেলাম পাকিস্তান দেশের হিন্দুরা তামান
কখন বা কি ঘটায় বিধি ভয়ে কম্পমান
উরা মনে মনে জমি কিনে চলে যাচ্ছে হিন্দুস্তান
শুনেন যত মুসলমান ভাগ্যগুণে পেলাম পাকিস্তান ॥
শুনেন ওদের জীবনে খুব ভয়
ভাইরে ওরা মেয়ে লোক সামলায়
পুরুষ লোকে দুই বেলাতে ভাত রাঁধিয়া খায়
শুধালে বলে মেয়ে লোক সব চলে গেছে বাবার ধাম
ভাগ্যগুণে পেলাম পাকিস্তান।

ভাইরে নারায়ণপুর হতে কয়েকজনা গিয়াছে
ঘোস পাড়ার ঐ অর্ধেক ভিটা খালি হইয়াছে
গেল রাধা কৃষ্ট দিল কষ্ট রাম চন্দ্র তার গদিয়ান
ভাগ্যগুণে পেলাম পাকিস্তান।

ছিল ললিত কর্মকার ব্যারাম ছুটতোনা তার
সুরেশের ঐ ঝুলে নকুল বেচল বাড়ি ঘর
আবার কালু দাদা বলছে গাধা
না জেনে সব বেচলি ক্যান
ভাগ্যগুণে পেলাম পাকিস্তান।

ভাইয়ে সুরেন চৌধুরী সদায় বেড়াচ্ছে ঘুরি
ও তার জানলা কপাট ভিটা মাটি করল বিক্রি
উহার বাবার বিষয় সবই খুয়ায় গাঁজার কলকায় মেরে টান।
ভাগ্যগুণে পেলাম পাকিস্তান ॥

বেচছে খাট আর চৌকি কিনে মুসলমানে নিল
তোষক পেরে শুচ্ছে আল্লাহুয়াকবর বলি,
তোমরা মাটির উপর তোষক পেরে শুয়ে কর হরির নাম
ভাগ্যগুণে পেলাম পাকিস্তান।

বেচছে আলমারী চকাট, ভাইরে জালনা আর কপাট;
হিন্দুস্তানে মিলবে না ভাই এমন মজার কাঠ;
তোমরা রাধা কৃষ্ট পাবে কষ্ট ভুলে যাবে বাঁশীর গান
ভাগ্যগুণে পেলাম পাকিস্তান।

তোমার টাকায় করবে কি ও নাম পড়বে রিফুজি
মিরগঞ্জের ঘাটে পার হবে ভাই সোলজারকে ঘুসদি
তোমার মাথায় দেখছি ক্যাথার বুঝা
রিফুজি তোর পড়বে নাম
ভাগ্যগুণে পেলাম পাকিস্তান ॥

ভাইরে বানেশ্বর হাটে বহু ধান চাল জোটে
পুব দেশের ঐ গাড়ি ঘোড়া আর মাথা মুটে
উরা রেশন কার্ডে লিচ্ছে বটে এক গাড়িতে দুই মণ ধান
ভাগ্যগুণে পেলাম পাকিস্তান ॥

যে জন কার্ড করে দেয় নাই, বলে পয়সা তোমার কই
যার কাছে যা লিতে পারে, ব্যবসা তাদের ঐ
করে ফাসুর ফুসুর লাগিবে ঘুষ ছাড়বেনা তিন টাকার কম
ভাগ্যগুণে পেলাম পাকিস্তান।

ধান চাল খরিদ করে, ভাইরে টমটমে চড়ে
পেট্রোল পাটি ধরল এঁটে প্রথমে মুড়ে
বলে এত ধান ক্যান চল গোডাউন ছেড়ে তো দিব না হাম
ভাগ্যগুণে পেলাম পাকিস্তান।

ভাইরে চারঘাট হবে পার, সেখানে আজাহার সরকার
সেই থি দেখো হলো আবার
ঘাটের ইজারাদার
মানুষ হেটে যাবে পয়সা লিবে রাখবে না সনমান
ভাগ্যগুণে পেলাম পাকিস্তান।

উহার কপালের খুব জোর ভাইরে লায়ের উপর
পার করিবে পয়সা লিবে পশ্চিমা চাকর
উহার বনু যায়ে পরিচয় দেয় বলেতো চিনিনা হাম।
ভাগ্যগুণে পেলাম পাকিস্তান।

উহার ঘাটেরো উপর ভাইরে আছে একখানা ঘর
পয়সা পাবে লিযায় থুবে হাড়ির ভিতর
হাড়ির মুখে কাদা আছে ল্যাপা পয়সা যাওয়ার ছিদ্রখান।
ভাগ্যগুণে পেলাম পাকিস্তান।

ঘাটের উপরে উঠে ধরল পেট্রোল পার্টিতে
থানা বলে লি যায় ঠেলে গাড়োয়ান শুদ্ধে
দারোগা বলে ক্যান আসিলে ধার ধারিনা ও সব কাম
ভাগ্যগুণে গেলাম পাকিস্তান ॥

বাবু গাড়ি ছেড়ে দেয় গাড়ি রাস্তা দিয়ে যায়
সামনে হলো মিরগঞ্জের মোড় সেখানে ভীষণ ভয়
আবার পকেট খরচা দিয়ে সেখান থেকে বেঁচে যান ॥
ভাগ্যগুণে পেলাম পাকিস্তান।
রাস্তায় যত গাড়ি যায় ময়েজ তা চোখে দেখতে পায়
বৈদ্যনাথ বাবুর দয়ের পড়ে গড়াগড়ি যায়
কুদালে কাটি, যাচ্ছে উঠি উল্টে পড়ে অনেকখান ॥
ভাগ্যগুণে পেলাম পাকিস্তান।

ভেবে কালিপদ কয় ও তুই শোনরে ধনুঞ্জয়
দাঁড়ি পাল্লা লিয়ে শুধু হাটে যেতে হয়
পাইকারী দরে পেলে পরে হতে পারে আজকার কাম।
ভাগ্যগুণে পেলাম পাকিস্তান।
ভেবে গোষ্ট কাকা কয় রাজিন করিস নাকো ভয়
কিছু দিন পর মাথা মুটে বন্ধ পড়ে যায়
উরা বর্ষা আলে যাবে চলে, বিলে যায়ে কাটবে ধান।
ভাগ্যগুণে পেলাম পাকিস্তান ॥

৫৮.

বাংগালীর গান

দ্যাখ বাঙ্গালীর কি দুর্দশা,
তোদের সোনার বাংলা খড়ের বাসা ॥

তোদের পয়সা অন্যদেশে
শ্বেত পাথরের রাস্তা বাধা,
তাদের শরীর স্বাস্থ্য থাকবে বলে
তার উপরে রবাট কষা ॥

তোদের পয়সা, তোদের রাস্তা
তোদের লিয়ে দ্যায় মাটি কাটা,
সব সময় সাইকেল চলেনা
বেধে থাকে জল আর কাদা ॥

কুষ্টার আবাদ বৃদ্ধি করে
করাচ্ছ সব মশার বাসা,
ঐ মশাতে কামড়াইলে
ব্যাধি ঘটে ম্যালেরিয়ার ॥

কুষ্টা যখন ধও গো জলে
রক্ত খায় তার হাবড়ি জুকে,
উনি ফাঁকি দিয়ে খরিদ করে
হয় নাকো খরচের টাকা ॥

কুষ্টার আবাদ দাওগা ছাড়ে
হাব্‌ড়ি মশা যাবে উড়ে,
ম্যালেরিয়া আর হবে না
মিটে যাক ডাক্তারের আশা ॥

যার "মা" থাকে উপবাসী
তার পদবী হুজুর ভাষা,
তোদের ক্ষেতে থাকতে ধান্য
নাম কেন তোর পলো চাষা ॥

ময়েজউদ্দি নাইকো বুদ্ধি
শমন এলে যেতে হবে
এই ভবে দুদিনের আশা ॥

৫৯.

কন্ট্রোলের গান (১৩৫৫)

বল কন্ট্রোলের আইন কেন হলো
কন্ট্রোলের আইন হয়ে বিপদ ঘটে গেলো
মোদের মান পজিশন গেলো ॥

তেল, লবণ, কাপড়, চিনি, চিরদিন খায় কিনি
মুদির দোকানে পাওয়া গেলো
হাট ও বাজারে গেলে টাকা দিলে বহু মিলে
এখন আমরা পাই না কেন বলো ॥

বাড়ি বাড়ি মানুষ গুনি তেল লবণ কাপড় চিনি
যার যা লাগবে ভাংনি করে লিলো
কাগজেতে লিখাইয়া নিজের নাম সই করাইয়া
কাগজের নামে রেশন কাট পেলো।
বল কন্ট্রোলের আইন কেন হলো ॥

ত্যাল লবণ আসে যখন রেশন কাট লিয়ে তখন
কন্ট্রোলের দোকানে যেতে হলো
যা লেখা আছে রেশন কাটে বলে তা দিবেনা বটে
সারির গুনাক ধমকায়ে খ্যাদালো
বল, কন্ট্রোলের আইন কেন হলো ॥

বড় লোকের রাত্রি হলে হেরিকেল লম্প জ্বলে
গরীবের কি দুর্দশা বলো
তিন ছটাক ত্যাল পাবে, রাঁধে বাড়ে খাওয়া হবে
অন্ধকারে বিছিন পাড়ে শুইল ॥
গরীবের বিপদ হলে খ্যাড়ের নুড়ো জ্বেলে
ভাল ত্যালের সলতে ধরাইলো
মনে খুব বিরক্ত হয়, কত মেয়ে গালি দেয়
বারচুদা কন্ট্রোল কোথায় ছিলো ॥
চিনি চালে পরে চোখ গরম করে বলে
তোমার লাগে চিনি কি বানাবো
বড় লোক বাবু যারা চিনিগুলো পাচ্ছে তারা
মুণ্ডা মিঠাই চা খেতে লিলো ॥

ফুড কমিটির সেক্রেটারির গুণের কথা বলবো কি
ডিলারের সাথে যোগ দিল ডিলারেতে ভাগ করে লিলো
কাপড় আইলো আশি জোড়া এবার পাবে বিধবারা
তোমাদের সব ফিরে যাওয়াই ভালো ॥

কাপড় আইলো বার খান, পাই মোরা দুইখান
আর দশখান কাপড় কোথায় গেলো
এত কাপড় ঘরে রইলো আমারে ফিরায়ে দিলো
কেবল একখান হ্যাবলের মা পাইলো ॥

বড় লোকের ঝি নারী, রংবেরং এর পড়ছে শাড়ি
গরীব লোক তাই পায়না কেন তাই বলো
গরীব লোকে কাপড় চায়, জুংলী ছিট বাচকানা দেয়
বছর অন্তর একখানা কাপড় পাইলো ॥

কাপড় লিয়ে বাড়িতে আলে মেয়ে লোক সব মন্দ বলে
এ কাপড় কে আনতে বলিল
বড় লোকের ঝি নারী রংবেরং এর পড়ছে শাড়ি
হুকমা মিনসী কোথা দাড়া ছিলো ॥

ভিলেজের সেক্রেটারি যারা ফর্দ করে এনে তারা
পাবলিককে মিটিং এর সংবাদ দিলো
একখানা কাপড়ের রশিদ দিবে দুই টাকা কমিশন লিবে
কাপড়ের দাম হিসাব করে লিলো ॥

যেদিন কন্ট্রোল বন্ধ হবে ঐ দুই টাকা কেবা দিবে
কাহার উপর করবি নালিশ বলো
রশিদ খানা লিয়ে হাতে গুদ মারায়ো পথে পথে
ঐ দুই টাকা গহিন জলে পলো ॥

কন্ট্রোল ছাড়া লবণ নাই এই কথা শুনতে পাই
পাঁচ আনা সের হাটে পাওয়া গেল
মনে ভারী সন্দেহ হয় উরা লবণ কোথায় পায়
লক করে কন্ট্রোল আলা দিলো ॥

এক ব্যাটা ক্যারানী লবণ বেচিল শুনি
আরাক দোকানদার খরিদ করে লিলো
লক করে লিয়ে যাতে হোমগার্ডে ধরিল পথে
একশ টাকা ঘুষ দিয়ে বাঁচিল ॥

দেশের যত কারিগর তাহার কপালের জোর
আল্লাতায়ালা এতদিনে দিলো
তারা রাস্তা দিয়ে চলে যায় স্যান্ডেল আরও মুজা পায়
জনে জনে সাইকেল গাড়ি লিলো ॥

সেক্রেটারির কাছে যায় বিধবারা কাপড় চায়
বলে ঝাট কামায়ে কাপড় কি বানাবো?
সদ্য যদি কাপড় চাও, কাছে একরাত থা'কা যাও
কাল সকালে কাপড় দিবো ভাল।
বল কন্ট্রোলের আইন কেন হলো ॥

দেশের ধন মহাজন ভাবছে তারা সর্বক্ষণ
আমাদের ঐ ব্যবসা মারা গেলো -
লাইসেনে কিনিলে মাল রাস্তায় করে চৌদ্দ হাল
ঘুষ দিতে লাভের অংশ গেলো।

অধীন ময়েজ উদ্দীন বলে ম্যাসটেটদের বাস্ত পেলে
পাবলিক তোদের হতো ভাইরে ভালো
পুরানো যা ত্যানা ছিল পরে এতদিন গেলো
এখন দেখছি বেইজ্জত হলো।

৬০.

সাবেক বাঘার গান

ভাইরে দেখ বাঘা সাবেক জাগা, আবার যে হলো
দেখিনি চোখে বলে লোকে

তিনশষাট ঘর আয়মাদার ছিল ॥

এখন রইস্ হুজুর থাকে রামপুর
সৈয়দ মি- মারা গেল, হামিদ মি রইল
নাজির মিঞা ছিল দেওয়ান, কিয়াম্‌ত যাত্রাগমন
ঐ চাঁদ মিঞার ভাই জঙ্গলে ভাল ॥

পয়লা জমি লিল কিনে কালীচরণ কর্মকার
লাঙ্গল গাড়ি নাই তার বাড়ি, কাজ করে সোনা রুপার,
ঐ যে মুশিদপুরে বাগান করে বাঘার বিলে আবাদ তার
ঘোড়ামারাত ঝাড়।
কত জনাক দিচ্ছে ভাগে আর কত পতিত থাকে
শুধু ভাই তার খাজনাটাসার ॥

নারায়ণপুর বাড়ি করে কালদাসখালির যত ধনী
তারা বাঘা দেশে নিচ্ছে চষে ঝাড় জঙ্গল পতিতজমি
টাকার জোরে খরিদ করে, বাগ বাগান সব ল্যায় কিনি
ওগো পীরজাদার জমি।
গকুল চাচার সাহস ভাল, প্রাচীর দখল করিল
পিয়াজ রোসন পুনকার শাগ বুনি ॥

বিপিনবাবু, নরেশবাবু, রমেশবাবু তিন ভাইতারা
দিঘির পাড়ে জঙ্গল ঝুড়ে থুলনা মেঠেল গাড়া
বিলের জমি নিচ্ছে কিনি কিষিনেরা করছে চাষ
বুনেছে ছাচি পাট।
আর ফাগুন মাসে বুনেছিল ভাদ্দুরে ধুয়েলিল
আবাদে ভাই করল ভারী যশ ॥

গোষ্ঠ খুব করছে কষ্ট দিচ্ছে জমি জংঙ্গল মেরে
লাঙ্গল গাড়ি আছে বাড়ি, দুই লাঙ্গল আবাদ করে
পাইট চাকরে কাজ কর্ম করে নারায়ণপুরের হাটের পর
আছে দোকান ঘর।
মুদিখানার ব্যাচাকিনা, দুই বেলাই হাট ছাড়ে না
ত্যাল লবণ লি চড়ে গাড়ির পর ॥

হরিপদ বাবু রোদে কাবু ভদ্র লোকের ছেলে উনি
টাকার জোরে আবাদ করে কিনছে বহু জমি।
পাইট চাকরে কাজ করে সময় বাবু দেখতে যায়
ছাতি জামা গায়।
দুইপর হলে সবকাম ফেলে বাড়ি যায় চলে,
চাঁন্দ করিয়ে খায়ে যে ঘুমায়।
চারু বাবু অমুল্য বাবু ওরাই-দুই ভাই যুক্তি করে
উহার অন্ত বোঝা বিষম মজা, থাকে ভারী গম্ভীরে
নিজের নামে জমি কিনে দৈনিক বহুত পাইট খাটায়
সময় দেখতে যায়।

রমজান লিত্তি লি-খায় ভাজা ময়েজ সা সকল মজা
খানের ঘরে বসে দেখতে পায় ॥

তারা বাবুর অসীম বুদ্ধি উহার অন্ত পাওয়া দায়।
কাচারী ঘরে সদায় ঘুরে তামাকটা খুব বেশি খায়
বাড়ি ছাঁন্দা লিচ্ছে ফাঁন্দা ন্যাং সাহেবের আস্তানা
এদিক ওদিক সীমানা।
লষ্ট করল রমত পালান ওবাবুর কলার বাগান
ইচ্ছা করলে উপড়ায়ে ফেলায় ॥

ভাইরে মোটামুটি বল্লাম যত আর আমি নাম বলব কত
শিকরাম আর কদমপুর ভাই পাকড়া দেশের গিরস্থ
তারা বেনে পাড়ার পুকুর গাড়া ঝাড় জঙ্গল
থুলনাকো সব আবাদ হলো।
করছে কেউ বাতান বাড়ি, দুই বেলায় গরুর গাড়ি
যাওয়া আসার হয় ভারী কষ্ট ॥

ভাইরে এই না বাঘা ধর্মের জাগা, পীর লোকের গোরস্থান,
দৈনিক ও তা লাগতো বাজার ছিল ভাই বহু দোকান
ওগো বিরান হলো উঠে গেল জঙ্গলেরও ঘর তামাম
ছিল শুধুই নাম।
চেরুমণ্ডল যুক্তি করে বলে লগেন বাবুরে
ফের বাঘাতে বসাব দোকান ॥
ঝাড় জঙ্গল ফরসা করে পয়লাতে বসাল কাচারী
তার পরে তুললো হাট চালা।
উদপুর, কদমপুর, পাকড়া, কাদিরপুর, পানি কামড়া
দোকানদার মেলা।
আর আড়ানীর ঐ মহাজনে চাল আনে বহু জনে
তেলের দোকান দেয় ঘেতু ভুলা ॥

আয়েন সরকার তারাবাবু এরাই হল ধনীলোক
মছরত হাজী, বিপিন বাবু এরাই শুদ্ধি দিলযোগ
বাদশা হলো রইস হুজুর তারতো বাঘা দখল ভোগ
সে তো দিলযোগ।
মওলানার ভাই দোওয়া কবুল বাঘাতে হল স্কুল তার
পাজরে হয় গভর্মেন্টের বোর্ড ॥

দেখলাম বটে বাঘা বোর্ড হয়েছে সরকারী ঘর
দেখতে পাকা দিব্যু বাঁকা বার্নিশ করা টিনের পর
রাজশাহী হতে হাকিম এসে খুশী হয় মেম্বরের পর
দেখে বিচার ঘর ॥

যার যখন নথি উঠে হাজির হয় বলে ডাকে,
রাজশাহী কোর্টের মত হয় তাহাদের বিচার
খোশ্ হলো দেখে বোর্ড।

হাকিমে তুল্লো ফটো যতলোক ছিল ঐ সভায় ॥

বাঘা বোর্ডে প্রেসিডেন্ট ভাই আগে ছিল খোকা মিঞা
ওসে পাগল হল বন্ধ রলো আর তো বিচার চলে না
রমেশ বাবু বিদ্যান ভাল আইন তার আছে জানা
ওসে মন্দো লোক ও না।
চারজনাতে যুক্তি করে মহিম সরকারের চকে
দেলজান সরকার আর রশীদ মিঞা
ছয়মাস যায়রে খাজরা গুড়ে, বাঘার হাটে আমদানী
কিনচে ফড়ে চাকি করে, আড়তদার দেশের ধনী
তারা কিনছে বটে নৌকার ঘাটে, পূবদেশে ঐ খরিদ্দার
ঢাকার জেলায় ঘর।
বিকাল বেলায় যেয়ে হাটে আড়ৎদার কিনছে বটে
বেচছে ফড়ে করে উচিত দর ॥

রাম চন্দর আর কিষ্ট ডাক্তার খিতিষ মেণ্ড চারি ভাই
যখন নারায়ণপুরে দোকান করে বসত মোকাম কারো নাই
চকের ভিতর গাহক পত্তর গুড়ের দাদন দেনা দেয়।
খাতায় লিখে থয়।
পড়ে গেল বিলাত বাকী শেষেতে পলো ফাকি
বহু টাকার তবিলমারা যায় ॥
দুই তিন সনে এসে বানে ডুবল দেশের ধান আর পাট
গেল ধনীর ফুর্তিকমি, গিরস্থের নাই পেটে ভাত
এবার সুযোগ বোনে কুষ্টা দরের দিগ আছে ভাল
ধান কিছু পালো।
নারায়ণপুরের কালাচাঁদ ঘোষ, উহার ভাই নাই
কোন দোষ।
ধান দিয়ে লোক রসোগুল্লা খেল ॥

ধন্য দিলাম আয়েন সরকার বিপিন বাবু দুইজনাক
পাঁচ আনির রাজা, রইস হুজুর, দুই রাজার এধর্মের জয়
তাদের হুকুম মতে একঘাটেতে বাঘ ছাগলে পানি খায়
চোক্ষে দেখা যায়।
দুইজনা তো যোগ করে বাঘা আর নারায়ণপুরে
শহর যে বানায় ॥

৬১.

ফকিরের গান

দ্যাকগা রাধা কৃষ্টপুরে এক ফকির এসে মুরিদ করে
ও এক ফকির এসে মুরীদ করে ॥

এসেছে এক মহেস ফকির বাড়ি তাহার মথুরাপুরে
জটুর বাড়ি আখড়া করে মেয়ে মরদ মুরিদ করে ॥

ফকিরের এক ব্যবসা ভাল সব ব্যাধি চিকিৎসা করে
নাভীর গোড়ে মাটি ঘসে তার নিচে ইনজেকশন করে ॥
হিন্দু আর ঐ মুসলমানে দুই পীরেতে মুরিদ করে
মধ্যে শুয়ায় পড়ায় কালাম, যখন যাহার দিকে ঘুরে ॥
ফকিরের ঐ গুপ্ত কালাম বুঝব আমরা ক্যামন করে
শিষ্যদের দিচ্ছে শিক্ষা বাবজি বলে ডেকো মোরে ॥

ফকিরের বাড়ি পদ্মাপারে অনেক গা আসে পাচ করে
কোন গায়ে স্থান পাবেনা, ঐ গায়ে যাই জিগির ছাড়ে ॥
পদ্মাপারের মেয়ে শিষ্য টুটকা দি লেয় বাহির করে
গঙ্গা পার হয়ে কাজ সারে, সেবাদাসী বলে তারে ॥
নয়াণ বলে পরান হারান তুরা মুরিদ হসনাকোরে
খেড়ু ভাদুময়েনুদ্দি হচেন থাকে ঈমানেক ধরে ॥
কলাবাড়ির ছিল ঝড়ি, ভাব দিখি সে গেল সরি
আব্বাস রস্‌কি যাবে ফসকি, মসারত সা গ্যাছে মরে ॥

ফকির যেদিন যাবে দেশে পাড়ার লোক সব ঘিরে বসে
মেয়ে লোক সব আশে পাশে ইশারাতে ভক্তি সারে ॥
ফকির যেদিন যাবে বাড়ি খই চিড়ির খাওয়া পাড়াপাড়ি
খেজরাগুড় আর গমের রুটি বেঁধে দেয় সব বুকচা ভরে ॥
এমনও অশিক্ষ্যত গাঁ আলেম মুনসী নাই একজনা
মুরদা মলে হয় জানাজা মুল্লার বাড়ি মনারপুরে ॥

যে উস্তাদে গান বাঁধছে, ফকির কি তার অন্যায় করে
মুনসী বলে ময়েজ সা-র কি দোষ ভাই গাঁয়ের ভেদিত লষ্ট করে ॥

৬২.

ডাক্তারের গান

ছাড়া নাই কারো এবার, ব্যারাম সকল ঘরে,
বৈদ্য যারা ভাবছে তারা, ঔষধ দেয় দোকানদারে ॥

যেমন চাপিয়াছে বর্ষা রুগীর নাই বাঁচার আশা
পিত্তির ব্যাধি যৎ সামান্য, শুধুই শেলেস্মা ॥
এবার যেমন লোকের জ্বর, এমনি কবিরাজ রামেশ্বর
ভ্যাটের সত্ব, হাতে পিপল জড় মারল আদার
উনি পানের স্বত্ব আদামধু তুলসীর পাতায় জ্বর সারে ॥
নতুন মানিক সা বুড়িই, উহার নাই চুনের গুড়ি
কুনিয়ানের বোতল নিয়ে ব্যাড়ায় দৌড় পাড়ি
উহার রুগি দেখা যেমন তেমন নুন ব্যাচাতে কাম সারে ॥

কবিরাজ দাদা ঘোষ কুশী, উহার কাজ দেখে হাসী
আরাম রুগি পালে পারে, বড়ই হয় খুশী
উহার আদারীতে নাইকো ঔষধ মন বড়ি তৈয়ার করে ॥
আছে এক রাম কৃষ্টদারী, বলে কবিরাজি করি।

ঠকাস-ঠকাস করে ধাউত বুঝতে না পারি
আর সাপা ব্যাঁঙ্গা দুদিক ভাঙ্গা মিল পড়েনা শাস্ত্রেরে ॥
কবিরাজ ছিল প্রফুল্ল, ও তার বহুৎ মূল্য
সরকারী এক ডাক্তার এসে হল বাহুল্য
ওকে ডাকে না, উনি দেশ ছাড়ে ॥
ডাক্তার এল সরকারী, ওতার চাই বলিহারী
কত পিনকা-পিলা যায় পচড়া দিতেছে সারি
আবার ন্যাংড়া অতুর কানা খোড়া গরীব কাঙ্গাল দেয় সারা ॥

পানিকামড়াতে রমেশ, উহার চিকিৎসাটা বেশ
কেননা চোখ টিপাটিপ গেলনা তার এমনি বদভ্যাস
উনি নিজে দুষ্টু করে লষ্ট-ঠসার জন্য যায় সারে ॥
ডাক্তার পণ্ডিত ভগবান, শুনেন তার চিকিৎসার প্রমাণ
ডাক্তারী চিকিৎসা করে মানে গুন মান,
উহার রুগির আড়ং বাড়ির কাছে থাকে সে স্কুল ঘরে ॥
অধিক বলবো আর কত, ফাজিল পড়ায় ঐ মত
ডাক্তারী চিকিৎসা করে, কার্য্যতে পোক্ত
আবার বক্সিমের গুন বলব কি ভাই বসে আছে পাশ করে ॥
ডাক্তার হ'ল খিতিষ পাঁড়ে, ও কার ভাগ্যে কি করে
কেননা রোগ চিনেনা, ধাউত বোঝেনা রুগির হাত ধরে
আবার কোন রোগের কোন ঔষধ দিয়ে কোন রুগির দিবে কাম সারে ॥

ডাক্তার আছে দামুদর, উহার করি প্রশংসার
এক মুখেতে সুখ্যাতি আর করব কত তার
উহার রুগি দেখা যেমন তেমন ইনজেকশনে কাম সারে ॥
ডাক্তার গোলাম রহমান, শুনেন তার চিকিৎসার প্রমাণ
রুগির কথা শুনলে পারে, কৃমির দেয় প্রমাণ
আবার চোখে না দেখিয়ে রুগিক শুধুই কিড়নীর দোষ ধরে ॥
ডাক্তার আছে ভাই লালপুর, ওসে এমনি বাহাদুর
গর্মির রুগি পালে পারে সন্তোষ হয় তার পরে
এমন করে, ঔষধ করে, রুগি আর যাবেনা তার দ্বারে ॥
ডাক্তার আছে বিলমাড়ি, ওসে বেড়ায় না দৌড়ি,
পুয়াতী রুগি গেলে পারে, উপকার হয় তারই,
সাত দিনকার প্রসব বেদনা, সাত মিনিটে দেয় সারে ॥

কবিরাজ ফয়েজো সরকার, রুগির ছুটায় যে বেমার
নাইকো উহার চুনের গুড়ি কৌটার ভিতর
উহার রুগি দেখা যেমন তেমন ভাসান গানে কাম সারে ॥
কবিরাজ সংসারের নন্দী, দাদপুর আছে এক বিন্দি
রাজাপুরে বসত করে নাম সুমরা বিন্দি
ওসে অন্য রোগের ধার ধারে না একশিরা ভাল করে ॥
কবিরাজ ছিল ভাই ষষ্টি, ওতার গিয়াছে ফ্রষ্টি
গড়গড়িতে ডাক্তার মিঞা মিলকির গুষ্ঠী
কেবল আছে মণির ভারী গম্ভীর কুনিয়ানে কাম সারে ॥
ডাক্তার আছে আর একজন, দাদপুর লাপিত হরিমন

খুর কেচির ধার চিনে ভালো-রুগির চিনে ধন
উহার রুগি দেখা যেমন তেমন চুল কাটতে কাম সারে ॥

ডাক্তার আছে ভাই পুলিন, উহার মনটা খুব মলিন
অন্যান্য ডাক্তার আজ-কাল হয়েছে কুলিন
পুলিন মলিন বেশে থাকে বসে, ফেল্ রুগির আরাম করে ॥
ডাক্তার আছে ভাই কিষ্ট, ওসে রুগিক দেয় কষ্ট
ইনজেকশন সে জানেনাকো ছুঁচ ভাঙ্গায় ফাষ্ট
বিলমাড়ির ঐ ডাক্তার এসে সেই ছুঁচ বের করে ॥

বাবু বলছে বৈদ্যনাথ, তোমরা ডাক্তার জুনাজাত
অন্য লোকের যাহোক তাহোক নিমাই সারা চায়
অন্য লোকে গেলে মারা ময়েজ সা কি ভান করে ॥

৪. মুহাম্মদ কলিম উদ্দীন মিঞার গান

৬৩.

তোরা দেখে যারে পদ্মা তীরে
'বাঘাতে এসে একবার
শাহ্ আব্বাস, শের আলী, হামিদ
শাহ্ দৌলার মাজার
হেথা আছেরে ভাই শাহী মসজিদ
অপূর্ব তার কারুকাজ,
নিপুন হাতে গড়া সেতো
নানা রংয়ের নানা সাজ
ও তার পুবদিকেতে প্রকাণ্ড দিঘি
চৌদিকে শোভা ভাণ্ডার
বাঘায় বিয়াল্লিশ মৌজার ভূমিদান
করেছিলেন শাহজাহান
গৌড় বাদশা নুস্রত শাহ্র
মসজিদ আর দিঘির নির্মাণ
সবইতো ভাই আউলিয়াদের
গুন প্রকাশের হয় কারবার ॥

৬৪.

বড় কষ্ট সাধ্যে আল্লা মিলে
বড় কষ্ট সাধ্যে রাসুল মিলে
তারে এ ভবে না পাইলেরে মন
এ জনম যাবে বিফলে ॥

যেমন পাতিলে দুধ জ্বাল করিলে
ভেসে উঠে স্বর,
সেই স্বর মাড়িলে ননী মিলে

হইয়া রূপান্তর
আবার সেই ননী ঘি হয় তখনি
যখনি তাপ দেয় অনলে ॥

হালাল খানায় যে রক্ত মাংস শোধন করে দিনে দিনে
যার লোভ লালসা হিংসা ঈর্ষা থাকেনা মনে প্রাণে

আরাম বিরাম হারাম করে
করিলে সাধন
কামেল পীরে দিবে তারে
অমূল্য রতন
হায়রে তবেইতো অপরূপ আল্লাহ
আসন লয় মানব দিলে ॥

৬৫.

ভবে মানব জনম সোনার জনম
এমন জনম আর হবেনা,
তুমি আত্মাতে পরমাত্মার মন
করবে যোগ সাধনা ॥

তুমি যতই হও মন টাইটেল ধারী
ভবে আলেম ফাজেল হাফেজ ক্বারী
তবু হবেনা হায় মোকাম জারী
কামেল পীর স্মরণ বিনা ॥

ভবে গাউস কুতুব আব্দাল মাখদুম অলিকুল সকলে
তারা স্বসীমেতে পরমাত্মায় অসীম নিয়ে খেলে

দেখ চার মোকামের নুরী তাঁরা
কভু সহজে মন দেয়না ধরা
হায়রে সুপথের সাধনা ছাড়া
যায়না রে তাঁদের চিনা ॥

৬৬.

চলরে মন গুরুর বাজারে
ভবে গুরুর বাজার এমন মজার
মরা গাছে ফুল ধরে ॥

যত আওলিয়া পীর ঋষি মণি
হইলো ঐ বাজারেই ধনের ধনী
দেখ সকল জ্ঞানের তাঁরাই গুণী
ত্রি ভূবনের মাঝারে ॥

দেখ ঐ বাজারে প্রেম করে যারা কভু দেয়নাতো ধরা
ওরা বড়ই চতুর বাজার চোরা জিন্দাতে মরা।

তাঁরা ডুব দিয়ে হায় প্রেম দরিয়ায়
কত হীরা মণি লুটছে সদায়
হায়রে দিবা নিশি মহানন্দে
প্রেমের সুধা পান করে ॥

৬৭.

তোরা কে যাবি আয় প্রেম সাধনায়
নিগুম প্রেমের দরিয়ায়,
সেথা খোদা রাসুল পাঁচ পাঞ্জাতন
সাধন মূলে পাওয়া যায় ॥

প্রেমের অনুরাগে ঐ সাগরে
তরী বাইলে পালে হাওয়া লাগে
চল পাল তুলিয়া হাল ধরিয়া
অনন্ত প্রেম দেশে যাই ॥
ওমন প্রেমের সাগর পাড়ি দিলে অপরূপের ঘরে
কত অমূল্য ধন মৌজুদ আছে চাঁদের হাট-বাজারে।

সেথা প্রেম মহাজন বিলায় সে ধন,
যদি পাইরে প্রেমিক মনের মতন
কত হীরা কাঞ্চণ মাণিক রতন,
কোন কিছুর অভাব নাই ॥

৬৮.

সাধন ভজন না জেনে মন
সাধুর কেন বেশ ধর,
তুমি না জেনে শরিয়ত বিধান
মারিফাত কেন খোঁজ কর ॥

আগে আপনি ফানা নিজকে জানা
তার পরে হয় মন উপাসনা
তবে কেন আইন মাননা
শিরেকী কেন পাপ কর ॥

যেমন অমাবস্যার চাঁদের আলো কভু দেখা যায়না,
তেমন পাপ কালিমার আঁধার ঘরে হয়না তো সাধনা।

যদি মুছবি রে মন সে ঘোর আঁধার
তবে গুরুর চরণ করগে রে-সার
গুরু দিবে খবর মূল সাধনার
যদি সুপথে চলতে পার ॥

৬৯.

ভবে সিদ্ধ গুরু কামেল বিনা
হবেনা প্রেম রসনা
হবেনারে আত্মশুদ্ধি শুভ বুদ্ধি
খোদা প্রাপ্তি সাধনা ॥

ভবে বেতরিকার সাধক যারা
কেউ বোঝেনা সাধন ধারা
পীর আওলিয়া সাধক ছাড়া
সেই সাধনা জানেনা ॥

তুমি অনল জ্বালে চলন সোনা যতই পোড়াও মন
ফুরায় শুধু কাষ্ঠ কয়লা খাদকি যায় কখন ?

দেখ স্বর্ণকারে এসিড দিলে
খাদ পুড়ে যায় তিলে তিলে
তার পরে তো নিখাদ হলে
বানায় কত গহনা ॥

৭০.

ঐ যুগল চরণ সাধন সিদ্ধির মুল
ভবে মুর্শিদ সদয় হলে।
ওসে মনের ময়লা ছাপ করিয়া
দিলের আয়না দেয় খুলে ॥

যে কইরাছে গুরু সাধন
পেয়েছে সে অমূল্য ধন,
ওসে ধনের ধনী গুণ মণি
খেলে খোদার খাস মহলে ॥

আমি পাপী জনম কানা
শিখাও গুরু সেই সাধনা
হায় মনের ক্ষেদে বেড়াই কেঁদে
ভাসিরে নয়ন জলে ॥

৭১.

তোরা কে যাবি আয় নুর মঞ্জিলে
কে যাবি আয়
আবার কে যাবি আয় নুর মঞ্জিলে,
খেলিতে নুরের খেলা ॥

নুরী বাবা বসাইছে নুরের মেলা
হাবিবুল্লাহ বসাইছে চাঁদের মেলা

আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির হইতাছে মন সর্বদায়
আঠার হাজার মখলুকাত সেই জিকিরে শির লুটায়,
আশেক জনে মাশুক পেয়ে
হইতাছে ফানাফিল্লা ॥
মরার আগে মইরা যে জন
আইলোরে বাবার দরবারে
রূপ সাগরে ডুব দিয়া সে
পাইলোরে প্রেমের বাজার
সেই বাজারে প্রেম করিয়া
দিল হল তার উজালা ॥

৭২.

চলরে মন মওলাজীর ঐ
প্রেম বাজারে যাই ॥
মওলার প্রেম বাজারে গেলে বহু
অমূল্য ধন পাওয়া যায় ॥

মওলার প্রেম বাজারের এমন ধারা
ওমন যে যায় সে হয় আপন হারা
আশেকে পায় মাসুক তারা
সুধা পান করে দিল অন্তরায় ॥

যারা ঐ বাজারের প্রেম সন্ধানী
ওরা যোগ সাধনায় দিন রজনী
কত লুটছে মজা চুনি মণি
হায়রে ডুব দিয়ে রূপ দরিয়ায় ॥

৫. হযরত খাজা মহসিন আলী আল চিশতির গান

৭৩.

মানুষ ভজো হও পবিত্র, ঠিক রাখিও জ্ঞান নয়ন
মানুষ তত্ত্ব না জানিলে সাধন ভজন অকারণ ॥
মানুষ ভজন করল যারা, খোদার দিদার পাইল তারা
ভজো মানুষের চরণ
মানুষই হয় সৃষ্টির সেরা, সবার উপর হয় আসন ॥
মানুষ কভু নয়রে খোদা, খোদা ছাড়া নয়রে জুদা
তাই ফেরেস্তা করলো সেজদা, খুশি হলো নিরঞ্জন
মানুষ গুরুর হওরে দাসী, কাটো ভবে মায়ার ফাঁসি
উদয় হবে রবি শশি দেখবিরে আলোর কিরণ
মহসিনে ভেবে বলে মানুষেতে খোদা মিলে
পড়ে থাকো চরণ তলে সিদ্ধি হবে সাধন ভজন ॥

৭৪.

আদমি হলে যায়রে ভবে আদমকে চিনা,
চিনবি যদি আল্লা আদম শ্রীরূপে হওগা ফানা ॥

আল্লা আদম না হইলে পাপ হইত সেজদা দিলে
দেখবে মনচক্ষু খুলে, আদমই গোপন রাব্বানা ॥

ঘিতো যেমন দুধে বিলীন, আদমে রয় আল্লাজির চিন
এমনি মত করবে একীন, পাবি তাহার নমুনা ॥

মুর্শিদ রূপে যে মজেছে, সাঁই বিরাজমান তারই কাছে,
মনছুর যেমন হক নাম ধরে, হক নামেই হল ফানা ॥

মহসিন তাই কয় কান্দিয়া, রইলি কেন নিজকে ভুলিয়া
দেখো না মন উতরিয়া, মায়া রূপে সাঁই রাব্বানা ॥

৭৫.

না ধরিলে নবীর তরিক ভব পারে উপায় নাই
ধরো তরিক বান্ধে নিরিখ থাকবে না আর কোন ভয় ॥

ভব নদীর তুফান ভারি, ধারা চিনে ধরো পাড়ি
করতে গেলে মাঝিগিরী, নিরিখ রেখো সুধারায় ॥

যখন নদীর তুফান দেখে, মাঝি যারা সজাগ থাকে
মরে না তারা পলেও পাকে, ঢেও কাটিয়া চলে যায় ॥

দিবে যদি ভব পাড়ি গুরুকে করো কাণ্ডারী
তবে চলবে তোমার অচল তরী, থাকলে গুরুর ভরসায় ॥

গুরু ভব পারের কাণ্ডারী, না চিনিয়া কেমনে ধরবো পাড়ি,
মহসিন কয় ত্বরা করি, ধরো গিয়া গুরুর পায় ॥

৭৬.

অচিন পাখি ধরবি যদি, দমের সাধন করো,
দেহের মাঝে আট কুঠরা, দেখো মহল থরে থর ॥

হাওয়াতে যে উঠে বসে চুপ করে রয় কালারবেশে,
কালাকে ভজলে বাঁচবি শেষে, বুঝো কেবা আপন কেবা পর ॥

মণিপুর হয় মদন জ্বালা, হায়রে মুর্শিদ রূপের খেলা,
খেললে দেখবি নুরের আলা, জমে তোরে করবে পর ॥

বুঝে দেখো ভবের ঘরে, এই দমেতে যে উঠে পড়ে
আলেপ হে আর মিম দালেতে রূপের গুণ দেখায় তার ॥

যে ডুবেছে এই রূপের শানে, অন্য কথা আর কি মানে
মহসিন কয় এই ভুবনে, দমের ধারা বুঝা ভার ॥

৭৭.

নিরঞ্জন গোপনের গোপন
ঘর ছাড়া বাইরে খুজলে পাবি না তার দর্শন ॥

বানাইয়া রং মহল সদায় করে চলাচল
পাখি রূপে ঘুরেফিরে ধরবি কিসে বল
ঘরের বস্তু খুঁজছে ঘরে মিলবেরে রতন ॥

বাইতুল মামুরে গিয়া আদম রূপে প্রকাশ হইয়া
লাহুত, নাছুত, মালকুত, জাবরুত করল সেথায় স্থুল
আবার হাহুতের ঘরে বসিয়া করছে নিরূপণ ॥

যখন ছিল আলেফ আকার ছিল বিন্দু তাহার মাঝার
বিন্দু ছুটি ডিম্ব আকার, সেই নুরে হয় নবীর গঠন
মহসিনের জনম বৃথা কি করতে কি করি এখন ॥

৭৮.

বরজক বিহনে খোদা কভু পাবি না
সাজ সরঞ্জাম লয়েরে মন যতই সাজনা ॥
হইবে যদি খোদা প্রাপ্ত, খুঁজো আগে আপ তত্ত্ব
না বুঝে মন হলি মত্ত মনে জ্ঞানে চেয়ে দেখনা ॥
খোদার নাম এই দুনিয়াতে, মুহম্মদ রয় তারই সাথে,
চলে যাও দেল মদিনাতে, দেলকাবা কর ঠিকানা ॥
আঠার চিজের দ্বারা, আঠার মোকামে জোরা
তার ভিতরে আছে খাড়া, করো রূপের ঠিকানা ॥
মহসিন বলছে রে মন, খুঁজো তারে সারা জনম,
ঠিক না করলে গুরুর আসন, পাবিনা তার নমুনা ॥

৭৯.

শুনো বলি নামাজের কথা
একিন দেলে পড়লে নামাজ, নামাজেই হইবে দেখা ॥
বিশ্বাসেতে বস্তু মিলে, তর্কে আঁধার হয় যে দেলে
দেল কাবার ভেদ না জানিলে, শুধু সেজদা মাথা ঠুকা ॥
লাহুত নাছুত মালকুতের ঘরে, দেলকাবা দেখ নড়ে চড়ে,
গুরুর চরণ না সাধিলে, দেলের আধার থাকবে সেথা ॥
আলেফ আকার তার চেহারা, মুর্শিদ রূপে লাগাও পারা,
মহসিন হল কর্ম হারা, ভবে রইল সে যে সর্বহারা ॥

৮০.

নক্‌শা ছাড়া হয় না নামাজ মুনা ভাই
নক্‌শা বিনে নামাজ পড়লে সমাজ রক্ষা তাতে হয় ॥

নক্‌শা যাহার নাইকো দেলে, নামাজ তাহার যায় বিফলে
দেখো না মন কুরআন খুলে, আকিমুচ্ছালাত কয় ॥

নামাজেতে হইলে খাড়া, মন বেড়ায় যে পাড়া পাড়া
পীর মুর্শিদের কদম ছাড়া, নক্‌শা তুমি নাহি পাবা ॥

মুর্শিদ পদে যে মজেছে, দিব্য গুণি সে হয়েছে
কুবৃক্ষে সুফল ফলেছে, অন্য কিছু নাহি চায় ॥

মহসিন কেন্দে বলে সাধের জনম যায় বিফলে
মুর্শিদ পদে না ডুবিলে, মানব জনম যায় বিফলে।

৮১.

মনে মন মিশাইল যারা পাইল সে রতন
মণিমুক্তা ঝিকিমিকি দেয় আলোর কিরণ
এক মনের দুইটি ধারা সুজন কুজন দেয় পাহারা
সুজনেরই ভাবুক যারা, তারা হবে মরণ হারা
মন মিশায়ে মনছুর হাল্লাজ, খুলে ফেলে শরারই তাজ
ওমর কাজী পাইয়া লাজ করে আত্মসমর্পন
একটি দমের তিনটি ধারা, বুঝে ভাই রসিক যারা
তিনটি ধারা যে দেয় পাহারা সে পায় মওলার দর্শন
মহসিন হয়ে দিন কানা পাইল না সুপথের ঠিকানা
ভেবে বলে পাগল মনা তোর গতি কি হবে এখন ॥

৮২.

প্রেমিক দিলে ভাবের তালা খুলা বড় দায়
আল্লা রাসুল বসে আছে প্রেমের বাগিচায়
প্রেম প্রীতি আর ভালোবাসায়, জ্ঞান নয়ন হয় খোলাসা
কামেতে মিটায় পিপাসা, অন্ধকারে পড়ে রয় ॥
যে মরিবে ভাবের মরা, কামের ঘরে তার তালামারা
আইনাতে লাগায়ে পারা, গুরু রূপে মিশে রয় ॥
স্বরূপে যারা সাধন করে, তার মরণ নাই ভবের পরে
মনছুর হাল্লাজ প্রমাণ করে, মহসিন বলে তাই ॥

৬. হযরত খাজা খোরশেদ আলী চিশতির গান

৮৩.

মানুষ মক্কা বয়তুল্লার ঘর আজব কারখানা
রাব্বা হাজাল বায়তেল্লাজি ফরমান ফোরকানা ॥

১. আকিমুচ্ছালাত আয়াত আসে বারেবার ফালইয়াবুদু বানী বলেন পরোয়ার
তাইতো পাঁচ মোকামে পাঁচ মুছল্লি জপতেছে নাম রাব্বানা ॥

২. আসমান জমিন ১৪ ভুবন ১৪ সেজদা কেতাবে গনন
করল সেজদা জ্বীন ফেরেস্তা তাতে মওলা খুশী হলনা করল আদম ছফিনা ॥

৩. নীর ক্ষীর আর দধি দুগ্ধ সুরা সর্পিজল সপ্ত সিন্ধু
সাত সাগরের সুধা সন্ধান রসিক ছাড়া জানেনা ॥

৪. হেরেম বিচে ছয় কূপ রয়েছে তার পানিতে যে অজু যাচে
উহার কিঞ্চিত পানি পান করিলে অমর হয় জীব মরেনা ॥

৫. অষ্টাদশে হয় মক্কার স্থিতি মদীনার তায় ছয়টি মতি
দিয়ে মায়ের অর্ধরতি বয়তুল্লার হয় রচনা ॥

৬. আলেফ বেতে আবজাদ ধরি দুই ঝর্ণাতে আবে নুরী
ধরম নুরী ধরা দিতে ধরায় এসে করে ছলনা ॥

৭. মনঘোলা তোর ওরে আলী অন্ধ হয়ে কেন মশাল নিলি
পথ দেখতে পথ হারালি তোর বচন বিকার গেল না ॥

৮৪.

রূপ সাগরে রূপের তুফান বইতাছে
দুই ধারার যুগল মিলনে নুর নিরঞ্জন খেলতাছে ॥

কেলি দেখতে যার বাসনা গুরুর লওরে উপাসনা দিবে নিশানা
ভেদ না জেনে যেওনা সেথা শমন চক্র ঘুরতাছে ॥

জল শোধনে বিজলী খুলে গরল মজিলে সুধা মিলে দ্বিদল কমলে
দীনের কানা পায়না দিশা ফকির দরবেশ লুটতাছে ॥

চারে চারে পাঁচে দ্বিগুণ সমযোগে কর স্থাপন করিয়ে শোধন
দেখতে পাবি রূপের মানুষ নূরের ঝলক দিতাছে ॥

জব্বার সাক্কারী নূর তহুরা পঞ্চভাণ্ড আছে ভরা সাকি মা জহুরা
মদন মাতালের নয়রে খোরাক ভ্রমে গরল খাইতাছে ॥

৮৫.

রূপের ঘরে নেহার করে বাবা সাধন করতে হয়
আপনারে চিনলে পরে মনের মানুষ পাওয়া যায় ॥

কাবার ঘর তো নয়কো দুরে আছে সবার হৃৎ মাঝারে
এই দেহে-হেরেম রেখেছে ঘিরে অতি দৃঢ়তায় খোদা তাহার মধ্যে রয় ॥

খাদেম খোদা আর রাছুলুল্লা ভিন্ন নহে
একই কাল্লা খেলিছে প্রেমের খেলা মানব রূপ হয়
আমি বলব কিরে হায়রে হায় পাছে শরিয়তের ভয় ॥

মুর্শিদ গুরু যারে বলে তার রূপেতে নয়ন দিলে
মনের বিকার যায়গো চলে খোদ খোদার দিদার হয় ॥

অধীন আলী কয় বেহালে আহম্মদজীর চরণ তলে মুর্শিদ থেকনা ভুলে
ত্বরাইয়া নিও গুরু অন্তিম সময় ॥

৮৬.

তোরা কে যাবি নবীর দেশে আয়রে শীঘ্র আয় চলে
দেখতে পাবি দীনের রবি দিন করেছে দীনের মশাল জ্বেলে ॥

(১) আল্লা ওয়ালা কামলিওয়ালা খোদ একলা জান্নাতিশান ভুতলে
অংশী নাই তার বংশ জোরা খেলছে হর রং মহলে ॥

(২) চির বসন্ত সেথা প্রবর্ত্ত সত্য বস্তু মফত মিলে
যেজন যা অভিলাষে পায় আয়াসে ব্যথা পায়না বিফলে ॥

(৩) সে শহরে ভেস্ত খানায় সেবায় রত হুর গেলেমান সকলে
বিচার মূলে আচার করে সবাই দিন কাটায় হাসি কল্লোলে ॥

(৪) বৃথা দিন গেল আশরাফ শীঘ্র চল ঐ নবী মনজিলে
আলী বলিছে নিদান কালে স্থান পাবে নবীর চরণ কমলে ॥

৮৭.

তোয়াফ কর মন কাবাখানা যার কারিগর সাঁই রাব্বানা
মানব জনম সফল হইবে পূর্ণ হবে মনস্কামনা ॥

(১) কাবাকে পাযাণ ভেবনা কেবলা জান সর্বক্ষণ
ফল্গু নদীর উপরে শুকনা নিচে নহর বইছে অনুক্ষণ
কররে মন ভজন সাধন কেবলা কাবায় করে নিশানা ॥

(২) ১৪ ভুবনের নকশা আটা ঘরের বিচিত্র গঠন
১৮ হাজার আলমে করে ব্যবসা আচরণ
শুক সারি গাইছে সদা কারিগরের বন্দনা ॥

(৩) ভক্তের আশা পুরাইতে কাবার হইল প্রত্তন
খুশি হালে কাবাকুলে বিরাজ করেন নিরঞ্জন
ঘরের মাঝে আসওয়াদ পাথর চুমা দিলে পাপ থাকেনা ॥

(৪) চুড়াতে রেখেছে বারি কহিনুরের রৌশন
সেই আলোতে দেখা যায়রে বিধুর বদন
আলী বলিছে ওরে আশরাফ কেন আলো জ্বেলে ওমুখ দেখলি না ॥

৮৮.

দম কলেতে শুমার ধরে দেখনা মানুষ নীরের ঘরে
মতির খাটে আসন পেতে দিচ্ছে কিরণ ভুবন জুরে ॥

(১) অটল গতি ধনকুবের খাড়া প্রহরী আছে দ্বারে
রতি পতি না হইলে সেথা যেতে নাহি পারে ॥

(২) উপর তালায় কোট কাচারী নিচ তালাতে রায় প্রচারে
মধ্য তালায় কাম আচারী এনাম দেয় রূপ নজরে ॥

(৩) বরন নিতি শুন্যে ঝুলে ফকির দরবেশ দেখতে পারে
মক্কায় গিয়ে ধাক্কা খেয়ে কত হাজি যায়রে মরে ॥

(৪) কুল ধর্ম মর্ম স্থলে পাক মাদানী শহরে
হাওয়া কারে আসা যাওয়া স্বরূপ দেখায় হৃৎমন্দিরে ॥

৮৯.

দম থাকতে ওমন দেহের সন্ধান করলিনা
দম ফুরালে দেল দরদী পাবিনা ॥

(১) অটল মানুষের সঙ্গ কর দমের ঘরে শুমার ধর
কামনদে পড়িবে ভাটা খরধারা আর বইবে না ॥

(২) লাহুত, নাছুত, মলকুত, জবরুত হাহুতে হাক্কুল মজুদ
বারহুতে লাদুন্নি ময়া জাগায়ে কর সাধনা ॥

(৩) লাল, জরদ, ছিয়া, ছফেদা, নীল, কমলা আর হলুদা
সাত রঙ্গের বিচিত্র খেলা সাত দরিয়ায় খুজনা ॥

(৪) ফানা ফেল্লা যাহারে বলে লহু দরিয়ায় সাধিলে মিলে
প্রেম হিল্লোলে উপচে বিন্দু সিন্ধু মাঝে তার স্থাপনা ॥

(৫) আলীশা বিচারী বলে স্বরূপ সাধিলে সে ধন মিলে
অমাপা অমাজা চিজে মুর্শিদ ভজতে ভুলনা ॥

৯০.

মদিনা মক্কা আজব শহর আরব দেশের সেরা
মেওয়া মিলে বেহেস্তি সেথা সেবা করে হুরেরা ॥

জান্নাতে বাকায় শরাব তহুরা আছে ভাণ্ড ভরা
ভাগ্যবানে পান করিয়ে হয়রে জিন্দামরা ॥

খানা ইব্রাহিম জমজম কুয়া পাথরেতে গড়া
বায়তুল মামুরে সাধন খানা দেখতে পায়না টেরা ॥

কথাতে মন নেচে উঠে কর্মে দিশে হারা
নিকটেতে আরশি নগর পড়শি খুজি পাড়া পাড়া ॥

আলীর হলনা নিশানা ঠিক তুই আশরাফ বেয়ারা
আখি মাক্কি বিনা যোগেতে শিকার যায় না মারা ॥

৯১.

এই দেহে বিদেহ আছে দেখলে জনম সফল হয়
গুরু রঞ্জন লাগাও নয়নে নুরীতন সামনে পাবে ॥

(১) সেতো রূপের খনি সর্ব যিনি পাপীয়ার পরান বল্লভ
দেখিলে মহুয়া মুখ দূরেতে যাইবে দুখ কামনা পুরবে ॥

(২) হাহুতে ঘন্টা বাজিল মলকুতে সাড়া পড়িল সময় ফুরাল
পর করনা ঘরের মানুষ কোন সময় ফেলে যাবে ॥

(৩) আরাফাতে নিশান উড়িল শীঘ্র চল হজ ললাটে ঘটবে
মদীনা জিয়ারতে হজ পূর্ণ আসলেতে লাব্বায়কা দেলেতে পড়বে ॥

(৪) পর পিরীতে দিন গেল আশরাফ আপন দেখবি কবে
আলী বলে নিদান কালে পরকাল হয়ে কাটবে ॥

৯২.

একি আজব লীলা সাঁইয়ের গোপন বেশে
নয়ন জুড়ায় কি শোভাময় সদা ভ্রমিছে পাশে ॥

(১) মেরাজ দেখতে চাও শূন্যাকাশে যাও তারে যোগে পাবে ব্রহ্মাদেশে
নয়ন মেলে লওরে দিশে আছে যুগল বেশে ॥

(২) দ্বিদল পদ্মে যার বসতি দিচ্ছে কিরণ দিবারাতি
ঘিরে রেখেছে অন্ধ পাতি তারে দেখবে কিসে ॥

(৩) কোরান পাকে এরশাদ প্রচারে ছায়ের কর আছমান জমিন উপরে
লীলা দেখবে নিজ বিচারে আমার যুগল রাশে ॥

(৪) আলীশা বিচারী বলে দোজখ খানায় বেহেস্ত মিলে
পাপের রাজ্যে পূণ্য খেলে আশরাফ দেখবে হুসে ॥

৯৩.

দিনে দিনে মোর দিন ফুরাল
আমার দিন গেলরে বয়ে ॥

(১) হলনা সুদিন আমার কুদিন হল সার রাহু মণিলালে মোর নিল খেয়ে
হারায়ে লাল বিহারী কেঁদে ফিরি কেউ শুনেনা সদয় হয়ে ॥

(২) উপরের ধবলগিরি নিচে মণিলাল ধ্যানে বসে আছে
তারে দেখব আশায় গেলাম সেথায় দেখা হয়না ভাগ্য দোষে
সহসা সাগর বুকে জোয়ার ডাকে সেই ডাকে এলাম ধেয়ে ॥

(৩) ক্ষীর সাগরের মণি কঙ্কণ ঘাটে লালের ভক্ত বৃন্দ জুটে
বিয়োগ ব্যথায় ছটফটিয়ে তারা মরণ পথে ছুটে
আমি ব্রহ্মা নাসে হলাম পাপী সেই দুখে ফাটে হিয়ে ॥

(৪) আলীর ছন্নছাড়া মতি চিনলাম না সে রতি
আপন দোষে লাল হারায়ে আমার হল অধঃগতি
মুর্শিদ তরাও মোরে ডাকি কাতরে বাঁচাও কিঞ্চিত কৃপা দিয়ে ॥

৯৪.

দেল কাবাতে নজর করে দেখরে কে সেথা বিরাজ করে
একদিনও তারে দেখলিনা মন কেন রলি ঘুমের ঘোরে ॥

(১) কুল আলম যারে পায়না ধ্যানে সাধন বলে সেধন পায় মমিনে, দলিল তা প্রমাণে
আলে ডালে আর ঘুরিসনা মন খোঁজ তারে আপন ঘরে ॥

(২) বরজখ রূপেতে রাব্বুল আলা দেলকাবা করে উজালা জাহেরিতে মানবলীলা
তাইতো আমার দিন দয়াময় মুর্শিদ আকারে ঘুরে ফিরে ॥

(৩) লা-মোকামে কারের স্থিতি হাহুতে জ্বালায় বাতি, বাতি জ্বলে দিবারাতি
ঈসরাফিল যার সঙ্গের সাথী সে সদাভ্রমে দীপ্তাকারে ॥

(৪) অধীন আলীর নয় ভাষাভাষি কাছেম আলী হৃদয় বসি বলছে সম্ভাষী
বেলায়েতে হয় খোদা প্রাপ্তি শোনরে আশরাফ কই তোরে ॥

৯৫.

নারী বিনে কুল পাবিনা মন ভোলা
নারী তোর জাতক গুরু কল্পতরু তারে ভুলে কোন পাগেলা ॥

(১) নয় বাবা তোর মাটির জাতী হাওয়া মার পাইয়ে জ্যোতি
তাইতো সাজে জগৎ পতি ফেরেস্তার সেজদা পাইলা ॥

(২) পুরুষ তনকে ফেরেশতা গড়ে নারীতন কেবা গড়ে
সরকারী বাত বানায় হাড়ে অন্ধ দেখায় রূপের মেলা ॥

(৩) নারী কায়াতে সবি কায়া পায় গাছ বিনে কি ফল স্বরূপ পায়
নারী ছাড়া কর না মিলিত ধারা, নারী অম্বুতে শম্ভুর খেলা ॥

(৪) ব্রহ্মার জনম নারীপটে বিষ্ণু তার চরণে লুটে
নারীর পতি শম্ভু বটে মুক্তি দিল নারীর চরণ ভেলা ॥

(৫) পাক পাঞ্জাতন যারে বলে চারতন ঝুলে নারীর গলে
মিছে দোষো নারী দেখিলে শুচি কর স্বভাব ঘোলা ॥

৯৬.

ঘুম শহরে ঘোমটা এটে চেতন মানুষ বিরাজ করে
ঘুম মরণে যে মরেছে সেই তারে দেখতে পারে ॥

(১) কি বলব তাহার রূপের বাহার নাই তুলন ভুবন মাঝার
লাজে মরে কোটি দিবাকর ১৪ ভুবন আলো নুরে ॥

(২) ঘুমকে ভেবনা বৈরী ঘুম বিধাতার বিধান চাতুরী
মোরাকাবায় ঘুম হয় কাণ্ডারী মোশাহেদায় রাজ প্রচারে ॥

(৩) ঘুমে দেখে ইউসুফের ছবি পাগলিনী জোলেখা বিবি
করব বলে তার পায়রবি আশায় বুক বেঁধে আসে মিশরে ॥

(৪) ইউসুফ স্বপন দেখিল ঘুমের ঘোরে চাঁদ সুরুজ তারে সেজদা করে
ভাই বিরোধী ফেলে কহরে তার স্বপন সফল হয় মেছেরে ॥

(৫) প্রাণ থাকিতে যেজন মরে ঘুমের মরা বলে তাহারে
নবী জেন্দা মরা যবে আচারে তখন মা আয়শা কাঁপে ডরে

(৬) জাহেলের বন্দেগী করণ আবেদের ঘুম সম আহরণ
আলী বলে ঘুমের ধরণ শিখিবে মুর্শিদের চরণ ধরে ॥

৯৭.

ঘরের মাঝে আজব ঘর বেঁধেছে চৌদ্দ ভুবন জোড়া
ঘরামির চাই বাহাদুরী কারিগরি শূন্যে তার রেখেছে খাড়া ॥

(১) আশেক হয়ে দেওয়ানা আলমপনা বানায় খানা মনহরা
হাওয়াতে ভ্রমিছে বারী কি চাতুরী ধরতে গেলে দেয়না ধরা ॥

(২) এক ময়ুরীর ছিনা পরে রেখে ঘরে চালায় সারথী বিশ্ব চোরা
থাকে সে চলন্ত ঘরে দেখতে নারে মরণ নাহি তার জেন্দামরা ॥

(৩) মায়ের কোলে ছেলে দুলে ক্ষুধা হলে মাতা পিলায় পীযুষ ধারা
মা জননী পাগলিনী ছেলে ভুলানী ঠোঁটে জপে মালার ছড়া ॥

(৪) ফায়াকুনেতে ঘর রচনা কেউ জানেনা ঘর বিহনী শিখি ছড়া
আদিতে এলাহি পতি ময়ুরী রয় চির সতী আলী মাতারী সৃষ্টি স্রষ্টার গোড়া ॥

৯৮.

জিন্দা ঘরে লাগাও চাবি যদি অধর পুরে যাবি
চাঁদ সুরুজ কে করে বন্দী ঘরে আলো জালাবি ॥

(১) নবছিদ্রে বইছে হাওয়া অন্ধকারে তার আসা যাওয়া
ফানাফিল্লা কর আল্লাতে দম গেলে মূল হারাবি ॥

(২) তিনশ ষাট রাগ লহরী তারা ভীষণ খাড়া প্রহরী
লাগাও তাদের শক্ত বেড়ী তবেরে তুই সাধ পুরাবি ॥

(৩) ছয় হাজার ছশ ছেষট্টি বাক রাব্বানী বিনা হরফি ছেরাজ মণি
ভেদ জানে তার রাছুলে আলা ভজন পথে প্রকাশ পাবি ॥

(৪) মুখের কথায় না বস্তু মিলে কর্ম যোগী না হইলে
যোগ ধর্ম সাধরে আশরাফ আলী বলে বিধান ভাবি ॥

৯৯.

আপন তন পরিচয় করে তনু দেখতে হয়
চিনলে আপন, আপন মিলে মন মনরায় তারে কয় ॥

(১) মৃদুল বায়ে বাজে বাঁশি ঈসরাফিলের নাকে ফাঁসি
মসী নাশি উজল শশী প্রদীপ্তমান আঙ্গিনায় ॥

(২) ভেদ না জেনে ধর্ম করা অন্ধ যেমন দৃষ্টি হবে
হাতিয়ে হাতিয়ে তিতিয়ে মরে আসল পথের সন্ধান নাহি পায় ॥

(৩) বেদ বেদাতির বিধান ছাড় হায়ার আয়নায় নজর কর
পরম চাঁদের পাবি ধরা আত্ম শুদ্ধির সাধনায় ॥

(৪) আল্লা নবীর মিলন মেরাজ যারে বলে দায়েমী নামাজ
করবে ও নামাজ কায়েম মরদ আওরত মওলার রায় ॥

(৫) আহম্মদজি কয় ওরে আলী হকের হাদিছ তোরে বলি
মুর্শিদ মওলার বোরাকে কায়েম জাহের বোরাক ছফিনায় ॥

১০০.

আপন ঘরের খবর না জেনে পরের ঘরের তালাসী লয়
নীতি হারা বেদীন বটে বিধি বিরোধী তারে কয় ॥

(১) অজুদ মজুদ সাইয়ের যতেক কারখানা
আসমান জমিন খোঁজে মানব হয়ে ঘরকানা
মানেনা আইন কানুন ধরণ করণ তালেব সেজে কেবল বেড়ায় ॥

(২) আছেরে হরলাল করলাল মেঘলাল আর সুখলালি সুখধারা
চৌ বাহিনীর মুখে মহাস্থান সকল তীর্থের গোড়া
বছরে কুম্ভযোগে একদিন লোকে মহাবেলায় ভাগ্যবান হয় ॥

(৩) লাহুত নাছুত মলকুত জবরুত আর হাহুতি মোকামে
আদালত ফৌজদারী হাইকোট জজকোট মুনছফি বিচার হয় সেখানে
কাজ ফুরালে পাঁচজন কাজি মায়া করে চলিয়া যায় ॥

(৪) মন ঈমানে ঐক্য করে যে করণ করে খাঁটি
বার এলাহির বারাম দেখে স্বভাব হয় তার মাটি
থাকেনা রসিক ছাড়া মন ভ্রমরা শান্তরসে ক্লান্তি বিলায় ॥

(৫) আলী বলে আশরাফ রে তোর এখনও গেলনা ছেলেমি
নকল এবাদত নাবালকের কাজ ফরজে হবেনা কায়েমী
লবেনা কুল কুমারী অনাচারীর ভজন সাধন জমার খাতায় ॥

১০১.

এই ছুরাতে ছুরাত বন্দী নকশা বন্দী কাদিরার
মোজাম্মেলী গেলাপে বন্দী ভিতরে বয় নুর নহর ॥

আগমে নিগমে শুনি কাবা শিখরে তৌহিদ বাণী
মদীনায় বেলায়াতী ধ্বনি বেলাল আজান ফোকারে পঞ্চবার ॥

ঘরের মাঝে আজব ঘর রয়েছে ঘরের ছয় কোনে ছয় খনি আছে
পঞ্চসাকী একাকারে ষষ্ঠ খনিতে করে হক প্রচার ॥

ফানির হাস্তি ফানা যাহার আসল হাস্তি কায়েম তাহার
সে করেনা সেজদা গায়ের আল্লার আপনা সেজদায় আপনি ভোর ॥

অধীন আলী লা-আচারে আশরাফ মুর্শিদাকারে যাও বাঁকা শহরে
মনের ঘোলা তোর যাবে দূরে দেখবে রাব্বেকুল সাঁই আপন কার ॥

১০২.

ডুব জেনে ডুব দে আমার মন ক্ষীরোদ সাগরে
যারা ডুব জানেনা যেতে মানা গেলে ধনে-প্রাণে যাবে মরে ॥

সিন্ধুতে জম্বুর ভয় জ্যান্ত মানুষ গিলে খায়
পরিত্রাহি বলে ডাকিলে থাবা মেরে মুণ্ডু ছিড়ে ॥

নামী গামী ডুবারু যারা ঘোর বিপদে হয় দিশাহারা
স্বাগতম মাতারম বলে করুণা মাঙ্গে কাতরে ॥

অষ্ট বজ্র সঙ্গে লও বিজয়ী ডুবারু হও
পূর্ণ হবে তোর মনস্কামনা ভয় রবেনা কাল ডরে ॥

আলীশা দিতেছে পাতি প্রেমিক সুজন হও না পতি
গুরু ধরিয়ে করণ শিখ মরণ শমন জ্বালা যাবে দূরে ॥

১০৩.

তোরা আয়রে আয় আপন রূপ দেখবি যদি ঘরে আয়
রূপ আয়নাতে রূপ দেখিলে মনের বেদনা দূরে যায় ॥

ওরূপ পঞ্চ বাহিনী খ্যাতি পাকতনী

নামাজ রোজা হজ জাকাত কলমা সোবহানী
এরা সবাই মিলে এক যুগলে দেল মন্দিরে বারাম দেয় ॥

রূপের নিত্য নতুন ঢেউ দেখে ভয় করনা কেউ
রূপ সাগরের পিছল ঘাটে ধীরে চালাও পাও
সাগর জলে বিজলী খেলে সেই আলোয় রূপ দেখা যায় ॥

কাজলা দীঘির জলে নীল পদ্ম ফুটে
শতদল সহস্র দলে রূপের দুলাল দুলে
তারে দেখতে গেলে নিরবধি সরল হয়ে থাকতে হয় ॥

কালিমা রূপের বাজার আলীশা দরজা তাহার
সেই দরজায় নজর দিলে দেখা যায় বাহার
আপন বেশে মুর্শিদ বসে নিরঞ্জনী কিরণ দেয় ॥

আলী দিচ্ছে ভারতী শোনরে আশরাফ দূর্মতি
রূপ গঙ্গায় স্নান করিলে হয় অগতির গতি
নামিলে আইনহারী যায়গো মরি কাল-কুম্ভীরে ধরে খায় ॥

১০৪.

মরার আগে যে মরেছে জিন্দা মরা তারে কয়
মরগারে মরার আগে দেখবি যদি অমর কায় ॥

আত্মহত্যা মহাপাপ সর্বশাস্ত্র কয়
পর মারিয়া হয়না ধর্ম সাধু নীতি নয়,
স্বভাব মারায় অভাব ঘটে সেই মরণে গোল বাধায় ॥

দেহের ব্যথায় দেহী দাপায় বসত একাকারে
একের মরায় দুইজন মরে কেবা কার মারে,
কম্বলের লোম শূন্য হলে কম্বল স্থিতি রয় কোথায় ॥

কুল আলমের স্বভাব রুহু ইনছানেতে বাস
তাইতো মানব স্বরূপ হারায় ঘটল সর্বনাশ,
অভেদ আত্মার মিত্র বৈরী গরল ধারা সদা বহায় ॥

পথের জোরা পানির গোড়া অটল বৃক্ষের পাত
বার বুরুজ আর তের সেতারায় ভ্রমে দিবস রাত,
আত্মশুদ্ধির হেতু এরা কুদরতি লীলা খেলায় ॥

মুর্শিদ সত্য বর্ত্তায় যেজন আবর্তনে ঘোরে
মরার সঙ্গে সমাজ বেঁধে মরার আগে মরে,
আশরাফ পড়গারে মরার কাফন আলী যদি তরিক বাতায় ॥

১০৫.

মক্কার হজ কায়েম হবে মন গুনে
কাজী রাজি রয় যাহাতে তা বিফল হবে কেমনে ॥

লক্ষ লক্ষ মোমিন যথা কেঁদে ভজে বিশ্বপাতা
জয় আরশ আল্লা নয়কি আরেফ ময়দানে,
আল্লা নবীর যুগল ছবি জ্ঞান চোখেতে দেখতে পাবি
এক আল্লার স্বরূপ জাহের সেখানে ॥

আর একটি রাছুলের বেনা মোমিনের দেল মাবুদ খানা
মোমিনের মুখ দেখ মন একিনে,
মোমিন আদম হয় যেজনা তারে ভজেনা দ্বীন কানা
যুগল আল্লার মোমিনের মুখ বিধানে ॥

বায়তুল মামুর রাছুলে আলা তাই দেখে হয় কাবাতুল্লা
প্রতীক আদব করেনা কুজনে,
ধরায় এসে শান জাহেরিল কাজ সেরে পর্দায় শুইল
জান্নাতবাকী দেখ সেথা সন্ধানে ॥

যারে খোঁজ বাতেনের ঘরে তারা মদিনায় শুয়ে ভূধরে
জাহের ছেড়ে বাতেনে খোঁজ কোন জ্ঞানে
অঙ্গে মাখ তথাকার মাটি দেহ দেল হইবে খাঁটি
আপন সত্তার খুলবেরে রাজ নিজ তনে ॥

১০৬.

মুর্শিদ আমার নিদয় হইও না
আমার হৃদয় মাঝে বিরাজ করে জাগাও মনের চেতনা ॥

মুর্শিদ সত্য সনাতন মুর্শিদ সেবায় মিলে নিরঞ্জন
তাইতো বড় আশা রাখি দয়াল নিরাশ যেন কইর না ॥

আসা যাওয়ার যুগল পথে আলোয় আলোয় দেখা সাথে
মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বালায়ে আমায় বানালে দেওয়ানা ॥

ভুলিনাই ভুলেছ বুঝি আজল করার মনে রেখেছি
ভব মঞ্চে দেখা দিবে করার পুরা কি করবেনা ॥

আশায়ে রচিলাম বাসর আসবে বলে প্রাণের দোসর
ফুল শয্যা শুকায়ে গেল তোমার দেখা পাইলাম না ॥

আলী বলে ওমন রসনা মিছে কেন ভাবাগুনা
কাজ কি তোমার গুরুর দয়া মুর্শিদের চরণ সেবা ছাইড় না ॥

১০৭.

আমারে দেখাও মুর্শিদ আহম্মদী ঘর
যে ঘরেতে বিরাজ করেন আপে পরোয়ার ॥

সীমার মাঝেতে অসীম তিনি বাজায় বাঁশরী দিন রজনী
আমার মাঝেতে শুনি ধরণী চিনতে না পারি কে কাহার ॥

নুরে নীরেতে প্রেম বরিষণ শাফিরূপি মা জহুরন
১৮ হাজার আলম করে সৃজন মোহাম্মদ সাইফুল মোক্তার ॥

নুর মোহাম্মদ সৃষ্টিকর্তা নবুয়তে সে আইনকর্তা
বেলায়াতে হয়ে প্রবর্তা আহাদ, আহম্মদ খোদ প্রচার ॥

সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেন সবারে যোজ্ঞেশ্বরী মা রেখে গম্বুপরে
তুফান কহরে কে বাঁচাবে আর বিনে নবী নন্দীনি মূলাধার ॥

কালিমী গো আমি মণি তুমি আঁখি তোমার আয়নাতে নিজকে দেখি
এ আলীর জেন্দেগী ফাঁকী তুমি না রহিলে কর্ণধার ॥

১০৮.

আগে জানতে হয় আদমের ভেদ কি অপূর্ব লীলাময়
বিশ্ব কারির নক্সা দেখে আদমকার তৈয়ারী হয় ॥

আদমকে বানায়ে মওলা এক আজব তন করিল হাওলা
সেইত আমানতুল্লা ইল্লাল্লার ধ্বনি উঠায়
আহাদে আহম্মদ হাদি নিরাকারের কার গুপ্তভেদী
সেজদা লইল রাব্বি আদম ওছিলায় ॥

ভেবনা আদম আল্লা সে কেবল রুহুর হিল্লা
রুহুল্লাতে জহুরুল্লা স্বভাষণ জানায়
খাইয়া গন্দমীদানা ছফির দিব্য চোখ হইল কানা
আমানত অদৃশ্য আদম বেহেস্ত হারায় ॥

জাত নরকুল ছফিউল্লা, সাধলে সিদ্ধি আমানুল্লা
ওছিলা ধরিয়া ভাইরে কর ব্রতচিল্লা
পাইবে দাদার মান নইলে জনম হবে অকারণ
জ্যোতিকে ভেবনা পতি ঘেতি মতি কভু নয় ॥

১০৯.

পড়বে হাকিকী নামাজ জামাতে
তরিক মাফিক পড়লে নামাজ মাবুদ সাবুদ পাবে দেলেতে ॥
যে পথে রাছুলে আলা গেলেন আপে আরশ মওলা
বারী এলাহির বারাম দেখিতে,
সেই পথে চল নামাজি আল্লা কাজী হবে রাজি
মেরাজ পূর্ণ হবে রে তোর ছালাতে ॥

জানেন মাতা উম্মে হানি নবী মেরাজে যান যে রজনী
কোন বেশে কোন দেশে গেলেন কিবা হালাতে,
জানতে হয় বোরাকী বেনা ছাদরা মন্তা কেমন থানা
রফ্‌রফ্‌ কাহারে বলে তা মিলে কোন দায়রাতে ॥

বাঘ রূপে কেন শেরে খোদা নবীকে দিলো বাধা
কোন গরজে মেরাজ পথেতে

নামাজে সে বাধা বিধি ঘটে থাকে নিরবধি
ভেদ জেনে বাঁধ কাট সাবধানেতে ॥

কার বেকারে হয়না মিলন সন্দেহ ঘুচেনা মোমিন সুজন
নীতি ভুলনা ওরে আশরাফ ভ্রমেতে
অন্ধ পাতিতে কেউ যেওনা মনকানা আয়াতে বলেন রাব্বানা
কানার নাইক আপন দিশা আলী কয় কোরান ইঙ্গিতে ॥

৭. মোঃ আবদুল আলিম ফকিরের গান

১১০.

রাজশাহী বাসীর ভাগ্য আমরা ফিরে চাই ভাই
রাজশাহী বাসীর ভাগ্য আমরা ফিরে চাই ভাই।
রাজা বাদশার দেশ এটা রাজশাহী ভাই
একটি বেতার কেন্দ্র তবু ভাল কেন না হয়
সময় সময় বিদ্যুৎ থাকে না
টু-টু শব্দে শোনা যায় না।
১০০ কিলোমিটারের ট্যানেসমিটার চাই ॥

রাজশাহীর যত রাস্তা সব পাকা চাই,
তার মধ্যে তানোর বায়া রাস্তা আগে চাই।
গরুর গাড়ি রিক্সা টম্‌টম্‌ চলতে পারে না,
দুই একদিন চললে গাড়ির ধুরে থাকে না।
রাস্তা ভাঙ্গা চলা যায় না, বিজলী বাতি তাও থাকেনা,
অন্ধকারে চলতে গিয়ে পা ভাঙ্গিয়া যায়,
গরীবের আর্তনাদ আজ তোমাকে জানাই ॥

জিয়া ভাইয়ের কাছে আর একটা দাবী চাই,
রাজশাহীতে কলকারখানা আমরা আরো চাই।
আমরা কাজ করিতে ভালবাসি
কাজ না পেয়ে বেকার আছি
বৃদ্ধ বাপের ঘাড়ে বসে, আর কতকাল খাই,
যুবক ছেলেরা সবাই কাজ করিতে চাই ॥

১১১.

তানোর থানার জমির ধান
মোহনপুরের বরের পান
বাটা ভরা সুপারি আছে গো বন্ধু
খাইয়া যাও পান ॥
মোহনপুরের কেশরহাটে
ধনে মহুরি চুন যাউন আছে
মৌগাছির হাটে বন্ধু
সস্তাদামে মিলবে পান ॥

চারঘাটের চারকোনা খরে
খাইলে সবার মন ভরে
আমজাদ পাতি জরদা বন্ধু,
রাজশাহী থেকে এনে দেন
তানোর থানার জমির ধান ॥

১১২.

খট্ খট্ খট্ শব্দ করে
চলে টম্ টম্ গাড়ি
আমপুরা শহরে গেলে আসুন তাড়াতাড়ি
ভাইরে রাজশাহী বাজারত গেলে আসুন
তাড়াতাড়ি ভাইরে আসুন তাড়াতাড়ি ॥
নওহাটাতে চড়লাম গাড়িত
রেলগেটে নামবে সোয়ারি
সেখান থেকে ভাড়া পাইলে যাব গোদাগাড়ি ॥
কাঁঠাল বাইড়া, আলুপট্টি সামনে মাসকাটা দিঘি
সেখান থেকে ভাড়া পাইলে
যাব পারিলা খড়খড়ি ॥
ধোপাঘাটা দাওকান্দি
পান কিনি ভাই গাদির গাদি
বড় গাছির হাটে গিয়ে ফিরবো সবে বাড়ি ॥

১১৩.

তারার মা বারা বানে ঢিকিত পাহাড় দিয়া
পাঁচ সিকা মন ধান বানিয়া ষাইট টাকা জমাইয়া
মনের হাউসে তারার মা গরু কিনিছে
হঠাৎ করি ব্যারাম হইয়া গরুটা মরি গেলছে ॥
এবার মা-মুই মনে মনে নিয়াত করিছে
বারা বানার টাকা দিয়া ছাগল কিনিবে
ছাগল কিনি তারার মা পাগল হইয়াছে
যার তার আবাদ খাইয়া বেড়াগুলি ভাঙ্গি ফেলিছে ॥

পাড়ায় পাড়ায় কান্দে মা-মুই মাথায় হাত মারিয়া
ছুরা পুড়া কাঁদায় আরো কথার খুচা দিয়া
তবু বুকে পাষাণ বানধি সবুর করিছে
হঠাৎ করি ব্যারাম হয়ে গরুটা মরি গেলছে ॥

১১৪.

রাজার দেশে রাজশাহীতে বসাইছে মেলা
আল্লা নবীর খুইলা দোকান খেলাইছে খেলা
শাহ মখদুম খেলাইছে খেলা ॥
ফকির দরবেশ ওলি আউলিয়া, তাহার প্রেমে

মশগুল হইয়া
বেচা কেনা করে যাইয়া, মখদুমের দরগায়
বাবা মখদুমের মেলায় ॥
পাপী তাপী ভক্ত যারা আহার নিদ্রা তেজ্য কইরা
বাবার মাজার ঘুইরা ফিরা
জিয়ারত করে রোদন কইরা
রহমতের আশায় আল্লাহর রহমতের আশায়
মুক্তির আশায় তারা মুক্তির আশায়
তারে আপন যে কইরাছে আল্লা নবীর ভেদ পাইয়াছে
নিগুঢ় তত্ত্বের ভেদ জানিয়া মরার আগে সে মরিয়া
অমর হয় আশায়
সে অমর হয় আশায়

১১৫.

হাড়ের খাঁচায় অচিন পাখি
সদায় থাকে বিদ্যমান
মন মহাজন চিনলিনা সে অমূল্য রতন ॥
হিংসা ভরা হৃদয় নিয়ে
মানুষরূপী যারা দেল চক্ষু
অন্ধ করে, ঘুরে বেড়ায় তারা
সেই অন্ধকারে জ্বলবে আলো
করিলে সাধন ভজন ॥
ছায়া বিহীন কায়ারূপে, ঘুরে এ সংসারে,
সাধন ভজন সিদ্ধি হয় যার, সেই ধরিবে তারে
আলিম ফকির কান্দে পথে
পাবে কি তার দর্শন ॥

১১৬.

সুজন চিনা প্রেম কইরো মন
মরিবেনা সেই প্রেম করে
অসময়ে তরাইয়া লইবে তোরে ॥
চাঁদ সুরুজ যত তারা
প্রেমের দায়ে ঘুরছে তারা
প্রেম পিরিতের এমন ধারা
নইলে কি তারা ঘুরে ॥

প্রেম বাজারের প্রেমিক যারা
মরার আগে মরে তারা
সেই প্রেমেরি এমন ধারা
প্রেমিক ছাড়া কি সে প্রেম করে ॥

১১৭.

মন গুণে ধন দেয় নিরঞ্জন
ওরে খেপা মন ॥
নিজের মনে নিজে বড়
চিনলাম না মুর্শিদ কি ধন ॥
লাহুত নাসুত মালকুত জবরুত
মকামো মঞ্জিল হাহুত
লা শব্দে খুলছে তালা
দেখ ঐ সোনার মানুষ
সাধন ভজন সিদ্ধি হইলে
জ্ঞান চক্ষু যাবে খুলে
আয়ু থাকতে দুনিয়াতে
একটু ভেবে দেখ মন ॥

১১৮.

মোহাম্মদ আল্লা নয়, আল্লা থেকে মোহাম্মদ আলাদা নয়,
লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ
দিলে দিলে জিকির করে, হয়ে যাও ফানা ফিল্লা
দিল হুজুরে জিকির কর
প্রেম সাগরে তারে ধর
দেখ খেলা খেলে জগতময় ॥
মোহাম্মদ মোহাম্মদী যে হয় নবীর উম্মতি,
থাকবে নবীর হয়ে সাথী
জ্বালাইয়া প্রেমের বাতি
দিল-কাবাতে দেখতে পাবে
উম্মতি যে খাঁটি হবে
চিনে নিবে দেখে দয়াময় ॥

১১৯.

মুর্শিদ পার কইরো কঠিন বিচারের দিনে
তুমি বিনে পারের বেলায়
আসবেনা কেউ নিদানে ॥
মুর্শিদ নামের নাম ধরিয়া
ভবনদী যাইরে বাইয়া
শেষ বিচারে কঠিন দিনে
শান্তি দিও প্রাণে ॥

মুর্শিদ নামের বাতি জ্বেলে
দিলকাবাতে দাওরে জ্বেলে
বিনা তেলে বাতি জ্বলে
দেলেরও কোরানে ॥

৮. হযরত খাজা শাহ্ খলিলুর রহমান চিশতির গান

১২০.

যদি মানুষ হতে চাও, মানুষ চিনিয়া মানুষ ধর,
মানুষ সেবিয়া মানুষ ভজিয়া মানুষ ধারণ কর।

অছিলা ধরতে আল্লাহ বলেছেন কোরানে,
মানুষ বিশ্বাস না হলে মানুষ হবে কেমনে
এনকার করিয়া মানুষ আজাজিলের গতি তোমার।

নিজ সুরাতে আল্লাহ মানব গড়েছে
আপনার হতে রুহু কালেবে দিয়েছে
নফসের সাথে আছে মিশে আগে নফসের খবর কর।

অধীন খলিল বলে বার বার,
হযরত মনছুর চরণে সজুদ আমার,
যে দেয় ঘুচায়ে আঁধার তাহারই চরণ ধর।

১২১.

হাওয়া চিনি ধর পড়ি মোকাম নাছিরাতে
নাছুতের উর্ধ্ব দিকে নিঃশব্দেতে
বাইয়া চল আস্তে আস্তে।

ত্রি মোহনায় তীক্ষ্ণ তুফান,
কুটা পড়লে অমনি তিন খান
ক্ষণ প্রভা নয় তার সমান·
অতি উজ্জ্বল চাঁদ হতে।

অপরূপ সে প্রেম-প্রতিমা
দেখলে তারে জ্ঞান থাকে না,
ফকির দরবেশ কত জনা
দেখলো সে রূপ ত্রিধারাতে।

হযরত মনছুর বলে খলিলরে তুই
চাও যদি ঐ না দেশে যাইতে
বাঁধাল দাওগো ঝরার ঘাটে
নইলে ডুব্‌বি নিমিষেতে।

১২২.

এছমে জাতের চাবি দিয়ে
নয় দরজা বন্ধ করে
সদা থাক নিরখিয়ে
আপন ঘরে নিহার করে।

আলেফ, হে, মিম, দালের ঘরে
সবুর কর স্থির অন্তরে
দেখতে পাবে কয়দিন পরে।

দিন গেল তোর কাজে কামে
রাত গেল যে বিভোর ঘুমে
জীবন গেল মায়ার ভ্রমে
সে ঘরের খোঁজ রাখলিনা-রে।

ঘর খানা তোর আছে খোলা
দ্যাখ মুর্শিদের হাতে চাবি তালা
হযরত মনছুর বলে খলিল পাগলা
রইলিরে তুই ভুলের ঘোরে।

১২৩.

আমার নাই কোন ভরসা মুর্শিদ বিনে এই জগতে,
যেথায় মুর্শিদ সেথায় খোদা বসত করে এক সাথে।
সাধন করে তোমায় পাব এমন সাধ্য নাই আমার,
জীবন যাবে বিফলেতে, দয়া করে না দিলে দিদার।

ফেলোনা দূরে বিপদকালে হাত ধরে তুলিও ডুবে গেলে,
আমি তোমার ভবের পাগল তুমি বিনে কেউ নাই দুই কালেতে।
দোযখ বেহেস্ত চাইনা আমি শুধু চাই দয়াল তোমারে,
তোমায় পেলে সব জ্বালা জুড়াবে, আজীবন থাকব চরণ তলেতে।

অধম খলিল কেন্দে বলে মনছুরের চরণ তলে
কিয়ামতে রাখিও আমায় তোমার পদ ছায়াতে।

১২৪.

হৃৎ আকাশে চাঁদ উঠেছে, দেখবি যদি আয়,
চাঁদের শোভা মনোলোভা, যে দেখেছে তার প্রাণ জুড়ায়।
বলব কি সেই চাঁদের কিরণ আলো করে বিশ্ব ভুবন,
সেই চাঁদে নাই অমাবশ্যা চিরদিন পূর্ণিমা রয়।

ভাগ্যগুণে যে চন্দ্র দেখে ভবের বন্ধন যায় তার দূরে
সর্ব পাপ যায় সরিয়া পরম এসে হাজির হয়।
দেখবি যদি সেই চাঁদ ত্রিধারাতে পাতগে ফাঁদ,
ঝরার ঘাটে বাধলে বাধ চাঁদের কিরণ অমনি হয়।

ষোল কলায় পূর্ণ শশি, নাইকো সেথা দিবা নিশি,
অধীন খলিল যোগে বসে সে চাঁদের সাথে মিশে রয়।

১২৫.

দমে দমে হুঁস রাখ ভাই ঐ রাঙ্গা চরণ,
হুঁস করে যে দম রেখেছে নাহি তার পতন।
নেঘা বর কদম করে নেঘা রাখে কদম পরে,
ভাবলে সদা দেখতে পাবি সে রূপ রতন।

পাল উড়াইয়া ভব নদীতে ডাক তারে দিলে মুখে
ডাকার মত ডাকলে পরে পাবেই তার দর্শন।
হযরত মনছুরের চরণ ধরে, খলিল আরজ এই করে,
ডুবিয়ে দাও প্রেম নদীতে, পাই যেন তোমার দর্শন।

১২৬.

ওরে আমার মন কেন এলি নৌকা বাইতে এ ভব নদীতে
তোর নয় ছিদ্র ভাঙ্গা তরী জল উঠে ভক ভকিয়ে
ছয় গুনারী দিয়ে আড়ি, পাছে ডুবায় তোর তরী,
তরী তোর তলিয়ে যায় গলগলিয়ে জল উঠিয়ে।
স্রোতের টানে তুফান মাঝে, তরী যেন যায় না ছুটে
আসছে জোয়ার মার খুঁটা এটে নইলে যাবি তলিয়ে।

তুই বাইবি যদি নাও নদীর গতি বুঝে যাও
কাম ঢেউয়ের ত্রিধারাতে মরবি খাবি খেয়ে।
নায়ে চড়বি দিয়ে তালি, বন্ধ কর ছিদ্রগুলি
বিবেক মাঝি ধরলে দাঁড়ি তরী যাবে ঢেউ কাটিয়ে।

মনছুর বলে ঘোর তুফানে ধীরে চল উজান টেনে
ওরে খলিল করিয়া হুঁস, যাবিরে তড় তড়িয়ে।

১২৭.

ওরে মন দূরে খোদা বলো নাকো আর
এই ওজুদের মাঝে পাবি, খোদার দিদার।
শাহরগ হতে কাছে কোরানে প্রমাণ আছে
যেথায় তুমি সেথায় তিনি তোমারই অজুদ মাঝে।

তোমায় তুমি চিন না খোদাকে তাই দেখনা
বাদুড় যেমন দিন কানা তেমনি তুমি চোখে দেখনা।
নফসের সাথে আছে মিশে দেখলিনা মন চেয়ে,
বন জঙ্গল শহর বন্দর খুঁজে ফের মহাভ্রমে পড়ে।

যেমন কোন পাগল কাঁধে রেখে লাঙল
সারা মাঠ ঘুরে কেবল করে কত সোরগোল।
হযরত মনছুর বলে ওরে শুনরে খলিল বলি তোরে,
সারা ভুবন ভ্রমণ করে তুই পাবিনা তারে।

নহে সে দূরে অতি নিকটে রইলি কেন মহাভুলে,
কি হবে তোর পরকালে ভাবলিনা একবার।

১২৮.

আমি বুঝেছি খোদা মক্কর তোমার
নিজরূপ প্রকাশিতে কর আদম তৈয়ার।
আপন সুরাত পরে বানায়ে আদম তরে,
নিজ রুহু তার উপরে করিল ফুৎকার
আমার আসনে তুমি, তোমারে চিনেছি আমি,
যেজনা অদেখা ভ্রমি তোমায় খুঁজে দূরান্তর।

সাতপাঁচ খাড়া করে, চেহেল তনখিমা করে,
হরেক আকারে ফিরো, হরেক ভঙ্গিমায়।
পুরুষ প্রকৃতি ক্রমে, তুমি মজ তোমার প্রেমে,
তুমি স্রষ্টা-সৃষ্টি ক্রমে কত খেলছো মনোহর।

বুঝিয়াছি চাতুরী তোমার, অধীন খলিল বলে,
ওয়াদাহু লাশরিক রূপে ফিরিতেছ এই ভবে,
যদি খুলে বলি কথা নাদানেতে চায় যে মাথা,
আমার মুখে তোমার কথা শুনি চমৎকার।

১২৯.

মুর্শিদ বিনে এই জগতে নাইরে কোন ধন
মুর্শিদ রূপে নিষ্ঠা নাই যার
এবাদত তার অকারণ।

যে যেমন জেনেছে তারে
সে দেখায় তেমন তাহারে
মওলা রূপে আমার ঘরে
আমি দেখি খাস নিরঞ্জন।
জাতকুল মান তাঁর অকারণে
সব সঁপেছি তাঁর চরণে
সব দিয়েছি কোরবান করে
ভরসা শুধু মুর্শিদ চরণ।

হযরত মনছুরের রূপের ছবি
যে দেখেছে সে পাগল হবি
ঐ না রূপে নিহার দিয়া
খলিলের ঝরছে নয়ন।

৯. মোঃ আজগর আলী ভাণ্ডারীর গান

১৩০.

কাম পাহাড়ে ধাক্কা লেগে মণিলাল পাথর চুয়ায়
উপর তলার রত্নমণি, বিন্দু রূপে ভেসে যায় ॥
মণিপুরের পেলে সন্ধান, প্রেমিকের কপালে প্রণাম
মাসে একদিন করে সে দান, শুধু সৃষ্টি রক্ষার দায় ॥
সোনাতে সোহাগা দিলে, কঠিন সোনা যেমনি গলে,
লোহাতে পরশ দিলে, সোনার বর্ণ তেমনি পায় ॥
পরশ পাথর রাখ তাজা, চাইলে তোমরা ভবের মজা,
আমানতী খোদার বস্তু হিসাব যেন দিত পারো ॥

১৩১.

প্রেম জ্বালা আছে যার গো, প্রেম জ্বলা আছে যার,
সে জানেগো বেদনা তাহার ॥
ওরে জল ফেলে জল আনতে গেলে
হঠাৎ জীবের পাও পিছলে গো,
ওরে কলসীর মুখে ডাকনা দিলে
তাতে জল পড়ে না আর
ওরে কলসীতে জল রাখতে হলে
ওরে পাত্র দেখো লক্ষ্য করে গো,
মাটির কলসী ভেঙ্গে গেলে তাতে জল থাকে না আর ॥

১৩২.

নামাজ পড়ো রোজা রাখো
সোজা রাস্তা ধরে চলো
কলবে তোমার জিকির করো
আল্লা আল্লা বোল ॥
জিকিরে হয় রুহু তাজা
দেখবি তখন নুর তাজাল্লা
ঐ আলোতে দেখতে পাবি
মাওলাজির হাল ॥
দয়াল মাওলার রূপ দেখিলে
লোকে তারে পাগল বলে
ঐ রূপ দেখে আসগর আলী
হয়েছে পাগল ॥

১৩৩.

ও দয়াল মুর্শিদচান তুমি কাঙ্গালেরে চরণ কর দান
চরণের ভিখারীগো আমি ঐ চরণ তাই কর দান ॥
পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ আরাফাতের ময়দান

হুজুরী দেলে পড়লে নামাজ, আযাব হবে না তার গোরস্থান ॥

তুমি আল্লা তুমি গো মাওলা রহিম রহমান
তুমি যারে করগো দয়া, এই ভবে তার হয় না নিদান ॥
কোন ভাবেতে পাতিয়াছো পিরিতেরই ফাঁদ
ডাকলে তোমার পাইনা জবাব, হও বুঝি আকাশের চাঁদ ॥

১৩৪.

মেয়ে রূপী কাল সাপিনী জগত খেয়ে চেয়ে রয়,
যত আছে মায়ের বংশ অন্য শক্তির অর্ধ অংশ
তার কাছে সবাই ধ্বংস, ধনী কাঙাল যত রয় ॥
ফুল ফোটে যার বার মাস, তাতে হয় শক্তির বিকাশ
তার চরণে হইয়া দাস, মধু খায় যে মৃত্যুঞ্জয় ॥
উথলিয়া লোহিত সাগর, তিন দিন ভাসে নহর,
মানুষ গড়া ছাঁচের ভিতর নতুন মানুষ জন্ম লয় ॥

১০. শাহসুফি সৈয়দ আমজাদ হোসেন হায়দারীর গান

১৩৫.

কে বুঝিবে সাঁইয়ের লীলা
নিজ থেকে আদম হয়ে
শূন্যে তা'ই করে খেলা ॥
হাহুত হতে নাছুত গিয়ে
ফানা ফিল্লার ঘর বাঁধিয়ে
মালাকুত থেকে বাহির হয়ে
জাবরুতে হয় লেনা দেনা ॥

জল তরঙ্গের তুফান তুলে
মিমের সাগর পাড়ি দিয়ে
এক হতে তিন বানায়ে
গলে পড়ে রঙ্গ মালা ॥
পাগল আমজাদ ভেবে বসে
জ্ঞান সাগরের পাড়ে গিয়ে
কোন দেশে তার বসতবাড়ি
ঘোমটা পরে রয় একা ॥

১৩৬.

ফানা ফিল্লার দেশে যে দিন যাবিরে
সেথা কেবা আল্লা কেইবা আদম
নিজ নয়নে দেখবি রে
সেই দেশেতে যাবি যখন
নিরাকারে সাঁই নিরঞ্জন
আপনা হতে হইয়া আদম
রূপ দিয়া রূপ দেখবিরে ॥

ফানা ফিল্লার দেশে যাওয়া
মুখের কথাই নয়ত সোজা
জীবের করণ ছাইড়া দিয়া
আপন ঘরে বসবিরে ॥
হায়দারী কয় আমজাদ পাগল
ছাড়বি যেই দিন জীবের বসন
নিরিখ বেঁধে দেখবি সাঁই নিরঞ্জন ॥

১৩৭.

ভবে আল্লা খেলছে খেলা
আদি আদমের মাঝে
আদমের কলবে খোদ খোদা বিরাজে ॥
জাল্লে সাইয়িন নামটি ধরে
আসন নিলো হাওয়ার পরে
জীবে তারে চিনতো নারে
ভুল করে ভবো ঘুরে ॥

লাহুত নাছুত মালকুত জাবরুত
হাহুতে এসে করিয়া যোগ
ভাবের ভাবুক হইয়া সে যে
আহম্মদ নাম প্রকাশে ॥

হায়দারী কয় শুনরে আমজাদ
জ্ঞান না পেয়ে হইয়া বেবুঝ
সময় থাকতে করলে না হুঁশ
সত্যটা যাচাই করে ॥

১৩৮.

বাবা আমার খেলছে খেলা রূপ লীলা
স্বরূপ রূপে রূপ ধরেছে
কৃষ্ণ করিম কালা
হরিত দ্বারে রূপ ধরিলো
জীবের মাঝে প্রকাশিলো
রূপ ভারায়ে দেশ বেড়ায়ে
করছে খেলা নিরঞ্জন।
কখনো হয় গজমতি
কখনো হয় স্বরস্বতী
চলে সে যে উর্দ্ধগতি
যেখানে পায় প্রেম লীলা ॥
হায়দারী কয় অবোধ ছেলে
নিশ্বাসেতে প্রেম করিলে
আমজাদ তুই দেখতে পাবি সেই দিনেতে
ঘর হবে তোর উজালা ॥

১৩৯.

জেনে শুনে পথ চলিয়ো
হুছোট খেয়ে পড়ো না
অন্তর চক্ষু কানা হলে
প্রাণেতে আর বাঁচবে না ॥

চাতক সভাব নিয়ে মনে
নিহার করো গুরুর সনে
জ্ঞান চক্ষুতে খুললে তালা
অন্ধকার আর থাকবে না
তালা লাগাও কামের ঘরে
চন্দ্র উদয় হবে দেহের মাঝে
কুপথ তোমার যাবে সরে
দেখবে সাঁইয়ের বারাম খানা ॥
সত্য পথের সাধু যারা
অন্তর চক্ষু খুলে তাঁরা
পাগল আমজাদ হইলো জন্ম কানা
জ্ঞান চক্ষু আর খুললো না ॥

১৪০.

শরার নামাজ পড়তে গিয়ে
নিজের নামাজ কই হলো
নিয়ত বেধে দাড়ায় নামাজে
মন থাকে না সেইখানেতে
সুরা কেরাত সব পড়িলে
অজায়গায় সেজদা দিলে ॥
না জেনে ভাই নামাজ পড়া
ভিজা ঢিলে ঘুঘু মারা
সঠিক মানুষ জেনে শুনে
জেনে নাও আইন কানুন ॥
জুব্বা পরে মাথায় টুপি
নাম রেখেছ মোল্লা কাজী
হাদিস কোরান কিছু পড়ে
বেহেস্ত দিলে পার করিয়ে
হায়দারী কয় পাগল ছেলে
নামাজ পড় রবজখ ধ্যানে
আমজাদ পলো হাহুতাসে
নামাজ পড়ার সময় গেলো ॥

১৪১.

কোন নামাজে প্রাণ হয় শীতল
না জানিলে বৃথা যাবে এ জনম
তরিক ধরো নামাজ পড়ো

স্বরূপ দ্বারে সেজদা করো
তারের উদয় যে দিন হবে
শীতল হবে দেহমন ॥
আলীর পায়ে তীর বিধিল
কোন নামাজে মশগুল ছিলো
টান দিয়া তীর বের করিলো
আলী না চেতনা পেলো ॥
আসল তত্ত্বের আশেক যারা
নামাজে দেল করে ফানা
পেয়ে তারা অচিন ঠিকানা
হাওয়ার পরে পাতে আসন
পাগল আমজাদ দিশেহারা
স্বরূপ রূপটি না চিনিলে
নাহি পাবে সিজদার আসন ॥

১৪২.

জানলিনা খোদ খোদারি আসন
বরজখ ভেদ নাহি জেনে
হারাইলেরে মন মহাজন ॥
ভরসা করে সাঁই নিরঞ্জন
নিরিখ বাধলে দেয় দর্শন
কলবেতে নিয়া আসন
আপন হতে হয়রে আপন ॥
জনম ভরে খুজলি খোদা
আপন ঘরটি করে জুদা
আকার ছাড়া নিরাকারে
থাকে কি আর সাঁই নিরঞ্জন ॥
হায়দারী কয় আমজাদ পাগল
করলিরে তুই জীবের করণ
হারাইলিরে মানব জনম
বৃথাই গেলো সব সাধন ॥

১৪৩.

খোদার নুরে নবীর সৃষ্টি
তার নুরে সৃষ্টি মাঝার
আসল কথার ভেদ না জানলে
হবে সেতো গুনাগার ॥
আকার নাই যার এই জগতে
নুর বলে তার কি ধন আছে
জীবে জীবে গোল বেধেছে
আসল আল্লা নিরাকার ॥
খোদার নুরে নুর নবী
তাঁর নুরে ফাতেমা বিবি

হযরত আলী তারই স্বামী
হাসান হোসেন সৃষ্টির আকার
আগে করে নিজের বিচার
খোজ করে নাও নুরের খবর
আমজাদ পাগল খাইলো ঘোল
কইরা বেড়ায় ভূতের কারবার ॥

১৪৪.

পিরিতের জাতের চাবি
তুলে নে হাতে
খুললে তালা দেখবি মেলা
প্রেমের জগতে ॥
আল্লা হতে এলো যে প্রেম
সে প্রেম পেলো নুর মোহম্মদ
এস্‌কের বসে একোন রূপে
খেল্‌লেন খেলা প্রেম জগতে ॥
আল্লা নবীর হলরে মিলন
মেরাজে তাই হয় আলাপন
আশেক মাশুক হইল মিলন
ওসে প্রেম হইলো প্রকাশ ॥
নিরাকারে সাঁই নিরঞ্জন
কোন প্রেমেতে হইলো মিলন
পাগল আমজাদ হইলো অধম
অন্ধ পথিক সেজে ॥

১৪৫.

গুরুরূপে নুরের ঝলক দিচ্ছে রে যার অন্তরে
শমন বলে তার কিরে ভয়, থাকে কি আর সামনে ॥
যেই করেছে প্রেম উদ্দীপন রূপের মাঝে দিয়া নয়ন
নুরে নীরে খেলা করে নামাইয়া জমিনে ॥
যেই দেখিবে নুরের ছবি আত্মা রূপে কর্তাহরি
জীরের খেলায় না মাতিয়া, খেলবে খেলা পরমে ॥
যখন দুই আঁড়া এক হবে সমান, নিজ থেকে তাই হবে প্রমাণ
হায়দারী কয় শুনরে আমজাদ সাঁই পাবি তুই নিদানে ॥

১৪৬.

গুরুর ছবি নুরের রবি উদয় হয়েছে যার অন্তরে
ধ্যানে জ্ঞানে মহা ধনী অজীবকে সজীব করে
গুরুই মাতা গুরুই পিতা, গুরু হয় যে সর্বদাতা
চেতন গুরুর সঙ্গ নিয়ে ওসেই অধরারে ধরোরে
পঞ্চ রং এই দেহ খানা, পাঞ্জাতন হয় একজনা
পঞ্চ রং এ রং মিশাইয়া প্রেম করতে হয় যুগল ধ্যানে
আমজাদ হইলো অন্তর কানা, সময় থাকতে গুরু চিনলো না।
হায়দারী এসে ঘাড় মুচরায়ে নিয়ে যাও সেই খানে ॥

১১. আবুল ক্বাছিম কেশরীর গান

১৪৭.

মদীনা মোহন হৃদয় রতন
কোথায় লুকিয়ে তুমি
তোমার বিরহে আভাগার সাথে
কাঁদিছে জগতে ভূমি
দিওনা দিওনা দিয়োনা আর ব্যথা প্রাণে
তুমি ফিরে এসো
তাপিত প্রাণ শীতলিতে ফিরে এসো
সহিতে পারিবনা
তোমার বিরহ আর সহিতে পারিনা
ধ্যানের পীতম এস গো হৃদয় রাজে
হৃদয় হোক লীন তোমার কদম মাঝে
পিয়াস মিটাও
দুরন্ত পিয়াসা আমি পিয়াস মিটাও
একান্ত বাসনা মিটাব পিয়াস
হবে কি তব পাক রওজা চুমি।
আমার বাসনা হবে কি সফল
পাকে রওজার ধুলি সযতনে তুলি
মাখিব অঞ্জন করি
খুলিবে এবার মনের দুয়ার
হেরিব যে দিবাকর।

১৪৮.

নজরুল নজরুল
কবি কাননের তুমি বুলবুল
তোমা বিনা এই কবি রাগে
ফোটে নাকো ফুল নব রাগে
দোয়েল কোয়েল দেয় নাকো শিস
থেমে গেছে বিলকুল।
জাগে নাকো আর নব ছন্দ
তোমা ছাড়া আজ কত দ্বন্দ্ব
তোমার সুরের ঝংকারে আজি ও
গাহে পাখি বুলবুল।

প্রিয় ছিলে তুমি কবি কাননের
আজো আছ মণি কোটায় মনের
তোমার অতীতে স্মরিয়া জাগিবে
কাব্য বাগিচার ফুল ॥

১৪৯.

মন ছুটে যায় হেরার পানে।
যথা পিয়ারা রাসুল মাতিয়া রহিত
সদাই খোদার গানে।
যার পথে বাজে আজো
পিয়ারা নবীর পাক রওজা
ভরিয়া অঞ্জলী সেই পদধুলি
সযতনে তুলি নিব বুকে মোর
জুড়াতে যে যাতনা ঘোর
সুরমা করিয়া মাখিব নয়নে
যেন ও রূপ মোহন হেরিবার পারি
জীবনে মরণে স্বপনে শয়নে
যে রূপের তরে হাহাকার করে
জ্বিন ইনছান আরো সব হুরী
যে রূপ হেরিতে নাচিছে হৃদয়
কোন সে অজানা টানে
দুনিয়া উজালা সে রূপের ডালা
লুকালো কোথায়
হেরা গুহা মাঝে প্রেম নদী বাজে
ডুবিল কি তাতে হায়
আমিও ডুবিব হায়
তোমার প্রেমের ঘায় প্রাণ বুঝি যায়
আমি ডুবিবো যে প্রেম দরিয়ায়
আমি ভেসে যে যাবো
আমি ভেসে যাব নিজেরে হারাবো
পিয়ারা নবীর প্রেম বাগানে।

১৫০.

যায় যায় নদী বয়ে যায়
আমি বসে বসে ভাবিসদা
নদীর কিনারায় ॥
জীবন নদী পাড়ি দিতে
বল্ নাই কো আমার চিতে
ভাব্‌তে ভাব্‌তে গেল দিন
সন্ধ্যা যে ঘনায়।
কোথা পাব এমন মুর্শিদ
যার আছে মজবুত নাও খানি
চহড়ে যার পাইবে তুমি
নদীর অগাধ পানি
ঝড় তুফানে পার করিতে
ভয় নাই যার শক্ত চিতে
বসে বসে দিন গুনি ভাই
সে মুর্শিদের আশায় ॥

১৫১.

পাঁচ বছরের খুকিটি আমার দিল্‌আরা তারনাম,
খেলা ঘরে তার পুতুল লইয়া খেলা চলে অবিরাম।
দেড় বছরের মেয়ে ছিল খুশ্‌ তাহার বুবুর মনে,
সাথীদের নিয়া পুতুল খেলায় মেতে রয় খুশী মনে।

আজিকে হইবে পুতুলের বিয়ে তাই ধুম ধাম বড়,
জামাল, রোকেয়া, রাবিয়া মনোয়ারা অনেকে হয়েছে জড়।
কুটুম না হলে বিবাহ বাস হয়নাকো ভরপুর,
ধুলা মাটি তৈরী খাবার যোগাড়, সেও হয়েছে প্রচুর।

ভাতডাল মাছ পায়েশ ফিরনী মণ্ডা মিঠাই কত,
বাটিয়া চলিছে সুগৃহিনী প্রায় দিল আরা অবিরত।
টেবিলে বসিয়া প্রবন্ধ লিখিতে আছি হয়ে অতিব্যস্ত,
"পুতুল বিয়ের জিয়াফত আব্বা" দিলারা কহিল ত্রস্ত।

কলম রাখিয়া হাসিয়া কহিনু "খাবার জোগাড় কই,
চাহিয় দেখিনু চারিদিকে শুধু হাসির হর্‌রা হৈ রৈ।
ক্ষণ পরে দেখি টেবিলের পরে কচুর পাতায় করি,
সকল খাবার সাজায়ে এনেছে থরে থরে পাত ভরি।

মুখের নিকটে সে পাতারে ধরি খাইবার মত করে,
'কচর মচর' শব্দ প্রকাশিয়া রাখিনু টেবিল পরে।

১৫২.

ও পাড়ার কালো ছেলে লবা ছিল নাম তার,
লিকলিকে দেহ ছিলো, ছিলো শুধু পেট সার।
কষে দিলে গালেচড়, করিত না রা-টী কভু,
দুঃখে দিন গুজরায় অভিযোগ নাই তবু।

সেই ছেলে অবহেলে জয়করি দুঃখ রাজি,
বসিয়াছে সমাজেতে ইয়া মাতবর সাজি।
লবা নাম ভাল নহে নওয়াব আলী নাম তাই,
রাখিয়াছে দেখে শুনে এ নামের তুল্‌ নাই।

হোক সে কালো লোক না জানুক পড়া লেখা,
অশনে বসনে বাক্যে ভদ্রচাল দেখে শেখা।
কে ঠেকায় পাড়া গাঁ সে যে এক সেরা জন,
নাহি গনে দীন জনে বহুতার মান ধন।
আগে হয় উল্লা তুল্লা পরে হয় উদ্‌দীন,
তলের মামুদ উপর যায় টাকা থাকে যদ্দিন।
'প্রবাদ সকল কবি' বোকা সে যে লবা চাঁদ,
অহরহ পাতিতেছে দুষ্টামির বাঁকা ফাঁদ।
নওয়ার আলী নাম লবা ধরিয়াছে তবু,
খাঁটি নওয়াবে প্রমোশন পায়নিকো কভু।
গাঁয়ে টেকা দায় হলো উৎপাত ঝামেলায়,
এরে ওরে তোড় ধরে পেঁচে মারে মামলায়।

ভাল নাহি লাগে যারে মত নাহি মিলে যার,
যে তাহারে ব্যথা হানে সে যে লাগে পিছে তার।
ছিপ্ ছিপে কালো ছেলে পেট্মোটা লবা নাম,
ধনে জনে মানে শানে দিন যাপে অবিরাম।

ভীরু যারা ভয় পায় দেখে তার তানশান,
দূরে দূরে থাকে সরে মন করে আন্চান্।
সাহসীর বুকে দাগ কাটেনি এ ধাপ্পার,
হোকধনী হোক্মানি সইবেনা অত্যাচার।
লবা জপে মত গর্বে ধনে জনে বাহু বলে,
দেখা যাক এইরূপে আর কত দিন চলে।

১২. মোঃ আবদুর রহিম সরদারের গান

ভূমিহীনের করুণ কাহিনীর কবিতা

১৫৩.

১. রাজশাহী জেলাতে হইল আজব এক ঘটনা
গ্রামের নামটি দ্বিপনগর বাগমারা হয় থানা
ভূমিহীনের দুঃখের কথা করে যাই রচনা।

২. দ্বিপনগরে বসতবাড়ি দিলাম পরিচয়
আমার মত ভূমিহীন কে আছে বাংলায়।
আবদুর রহিম নামটি আমার সবারে জানাই

৩. অফিসের লোকজন জিজ্ঞাসা করিল
দ্বিপনগরের ভূমিহীন কেবা আছে বল
আবদুর রহিম ভূমিহীন বলিল সবাই।

৪. আর কি বলিব দুঃখের কথা বুক ভাসিয়া যায়
আসমানের নিচে জমি আমার বলতে নাই

৫. বিনয় বচনে বলি চেয়ারম্যানের তরে
কোথায় মোরে জমি দিলা বলনা আমারে
জমির ঠিকানার কথা না বলে আমারে।

৬. আর দুঃখে কষ্টে কয়েক বৎসর গত হইয়া যায়
এক দিবসে মাথা ভাঙ্গার হাটে গেলাম ভাই
নন্দনপুরের ইছার সঙ্গে দেখা হইয়া যায়।

৭. আছ ছালামু আলায়কুম দিয়া আমারে বলিল
কাচারির লায়েব তুমায় যাইতে বলিল
তুমার নামে খাস জমির কাগজ আসিল।

১৫৪.

৮. তাই শুনিয়া মনে মনে খুশি হইয়া যাই
২২ টাকা লইয়া আমি হাটে চলে যাই
হাট বাজার বন্ধ দিয়া বাড়ি গেলাম ভাই।

৯. বাড়ি গেলে ছেলের মায়ে জিজ্ঞাসা করিল
হাট বাজার কোথায় তোমার আমারে যে বল।
খালি হাতে ফিরে এলে কি হইল তোমার।

১০. শোন শোন প্রাণ প্রেয়সী বলি যে তোমারে
কাল মোরে যেতে হবে কাচারির তরে
আধাসের চাল ছিল আমার ঘরেতে।
১১. অতি কষ্টে রাত্রি কাল যাপন করিলাম
পরদিন ধীরে ধীরে কাচারিতে গেলাম
লায়েবের তরে আমি ছালাম জানাই।
১২. কাচারির লায়েব বলে আমার তরেতে
কোথায় তোমার বসত বাড়ি বলনা আমারে
কি নাম তোমার মাতাপিতা কি নাম তোমার।
১৩. দ্বিপনগরে বাড়ি আমার দিলাম পরিচয়
কাচারিতে কি কারণে ডাকিলেন আমায়
নামটি আমার আবদুর রহিম তুমারে জানাই।
১৪. পরিচয় পেয়ে লায়েব উঠিল ঝাপিয়া
অফিস হইতে কাগজ পাতি দিল দেখাইয়া
স্বামী-স্ত্রীর ফটো আছে দেখিলাম চাহিয়া।

১৫৫.

১৫. লায়েবের আসা ছিল চেক দিবার তরে
দিয়ানত পিওন আসে আমার হুজুরে
চেক দিতে মানা করে লায়েবের তরে।
১৬. নক্সা দেখে দাগ নম্বর পেয়ে গেলাম ভাই
বেসরকারী হাটের পাশে খাস জমি দেয়
হাট কমিটি কানাকানি করিল সবাই।
১৭. চোখ রাঙ্গিয়ে কমিটিগণ আমারে যে কয়
হাটের পাশে খাশ জমি দিবনা তোমায়
হাট করাত দুরের কথা প্রাণ বাঁচান দায়।
১৮. বিবাদির দাপট দেখে প্রাণে লাগে ভয়
জমি পাওয়া দুরের কথা প্রাণ বাঁচান দায়।
আল্লা জানে কি মুশকিলে আমারে ফেলায়।
১৯. ভূমি অফিস হেটে আমার মন হইল ভারী
কোথায় যাব কি করিব খিদার জ্বালায় মরি
ভূমি অফিস ঘুরায় আমায় সইতে নাহি পারি
২০. তাড়াতাড়ি করে আমি কেস দিলাম ভাই
বাবুল হাসান চৌধুরী টি.এন.ও সেথায়
তার হাতে কেস দিয়া বিবরণ জানাই।
২১. কেস পেয়ে অফিসার উঠিল তখন
লোক জন সাথে লইয়া করেন আগমন
ভূমি অফিস গিয়া এইবার সালাম জানাই।
২২. চেক দিবার অর্ডার দিয়া সাহেব চলে যায়
ভূমি অফিস হতে এবার পিওন পাঠায়
লায়েবের তরে আমি ছালাম জানাই।

১৫৬.

২৩. পিওন বলে জলদি করে চেক দিব তাই
তানা হলে মান সম্মান কারো রবে নাই
সরকারের আইন মত লায়েব চেক দেয়।
২৪. তারপরেতে এইবার আমি বাড়ি চলে যাই
গ্রামের লোকে চেক দিবার খবর পেয়ে যায়
সরকার তারে জমি দিলে আমরা দিব নাই
২৫. সন্ত্রাসীগণ কোন মতে দখল দিবে নাই
বাগমারা থানার ভিতরে সব জাগাতেই যাই
সবাই বলে দিতে হবে কেউত আসে নাই।
২৬. একা পথে সব জাগাতে ঘুরিয়া বেড়াই
গরিব বলে কেউত আমায় ফেবার করে নাই
বাড়ি হইতে হেটে আমি রাজশাহীতে যাই।
২৭. রাত্রিকালে স্টেশনে যাপন করিলাম
পরদিন ঘোড়ামারা আমি চলে গেলাম
কবির সাহেবের বাড়ি লোকজন দেখিলাম।
২৮. চেক দিয়া লোকের কাছে বিবরণ জানাই
পিটিশন লেখিয়া এইবার আমার হাতে দেয়
সাহেবের আফিসেতে আমি চলে যাই।
২৯. পিটিশন দিয়া আমি ছালাম জানাই
পিটিশন দেখিয়া সাহেব সিল্ সই মারে তাই
টি.এন.ও অফিসে গিয়া তুমি ছালাম জানাও।
৩০. আস্তে ধীরে এইবার আমি বাড়ি চলে যাই
সবার তরে মন্ত্রীর সালাম জানাই
২২ শতক জমির পরে ঘর বাড়ি বানাই

১৫৭.

৩১. আল্লা বিনে এই জগতে আমার কেহ নাই
ঘর বাড়ি ভেঙ্গে তারা পিকনিক করে খায়
চেয়ারম্যান বিবাদীগণের ফেবার করে যায়।
৩২. ভূমি অফিস বিবাদির ফেবার কইরা যায়।
আসামিগণ এইখানেতে মগের মুল্লুক পায়
ভূমি অফিস সুবিচার করেনা আমার।
৩৩. সুবিচারের জন্যে আমি ছুটাছুটি করি
দফাদার আমার কাছে আসে তাড়াতাড়ি
মারিবার চেষ্টা করে সাবধানে থাকিবে।
৩৪. ছুরা হাতে বিবাদীগণ ঘুরিয়া বেড়ায়
আল্লাবিনে এই জগতে আমার কেহ নাই
সাবধানে থাকিয়া আমি জীবন বাঁচাই।
৩৫. বাবুল হাসান টি.এন.ও টেনেসফার হয়
তানা হলে বিচার আমি পাইতাম নিশ্চয়
এইখানেতে বিবাদিগণ মগের মুল্লুক পায়।

৩৬. টাকা পয়সা যত লাগে বিবাদী ফুরায়
বাগমারা থানার ভিতরে সব জাগাই বেড়াই
সুষ্ঠু বিচার না পাইয়া এসপি অফিস যাই।
৩৭. এসপির অর্ডার হইল বাগমারা থানাতে
থানার পুলিশ এলো এইবার তদন্ত করিতে
ভাই দারোগা সাক্ষী নিল গ্রামের লোকের কাছে।

১৫৮.

৩৮. পুলিশবাদী কেস এইবার কোর্টে চলে যায়
চেয়ারম্যান কোর্টে গিয়া ফেবার করে তাই
সাক্ষী আদায় না করিয়া কেস ভ্যানেশ হয়।
৩৯. দুইবার ঘর বাড়ি আমি করিলাম
দশ হাজার টাকার দাবী কেস করিলাম
ঘর বাড়ি ভাঙ্গার বিচার আমি পেলাম নাই।
৪০. উপর আলা সুপারিশ করিল আমায়
স্থানীয় প্রশাসন আমার বিচার করে নাই
বাংলাদেশের সব জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াই।
৪১. ঘর বাড়ি ভাঙ্গার তদন্ত চার বার হইল
মাহফুজার টি.এন.ও এবার তদন্তে আসিল
গ্রামের লোকের কাছে এবার সাক্ষী যে চাহিল।
৪২. অফিসারের কাছে সাক্ষী গ্রামের লোকে দিল
উসমান আসামী সাক্ষীকে মারিতে লাগিল
অফিসের লোকজন পালাইয়া যায়।
৪৩. মনের দঃখে কবিতা খান প্রচার করে যাই
মাহফুজার টি.এন.ও আমার কবিতা পুড়ায়
সুবিচারের লাইগা আমি ঘুরিয়া বেড়াই।
৪৪. মরণ কথা স্মারণ এবার কর সবে ভাই
হিসাবের কালে তোমার কেউত রবে নাই
প্রশাসনের বাহাদুরী থাকবেনা সেথায়
৪৫. কবিতা খান ইতি দিয়া সালাম দিয়া যাই
ভুল ত্রুটি মার্জনীয় লেখাপড়া নাই
এই কবিতা কিনবেন একটা মূল্য তিন টাকায়।

১৩. মোঃ শমসের আলীর গান

১৫৯.

আমার পাপ দেহ ছাপ হবে কিসে বল
ভেবে আমি পাইনা দিশে ॥
আছে দেহে উলিহিয়াত সাগর
বুধবুধ করে সদায় ঢেউয়ের লহর
সুমতিভাব ছেড়ে সেজন চলে সদায় কুমতির দেশে ॥
মনেরে বুঝাইলাম এতো
করো মন সুমতি বচন
মানে না সে কোন বাক্য চলে সদায় উলটা পথে ॥

পাগল শমসের কান্দে মনে
এতিবর কয় পাক জবানে
ইঙ্গলা পিঙ্গলা চিনে কর পিরিতি সুষুম্নার দেশে।

১৬০.

আমি আর কি ফিরে পাব তারে
না চিনে হারাইয়াছি যারে ॥
পদ্মা আর যমুনার ধারে এক অন্ধনারী বসত করে
কুঠার ভরা মানিক মুক্তা আছে তাহার কাছে রে মন
সে যে নিজের ঘরে তালা মেরে ফাঁদ পাতিয়ে রাখে
যেমন জাতি কলে ইদুর ধরে খাদ্যের আশায় যাইয়া মরে
পড়ে এক মায়ার বসে, কাল নাগিনির কঠিন বিষে
ধরেছে যারে এই ভব সংসারে মন
আবার অন্ধ নারী যুদ্ধ করে কাম সাগরের তীরে
মণিরাজা হার মানিলে অমনি ধইরা গিলে তারে ॥
তাই এতিবরের চরণ ধরে কলা কৌশল শিক্ষা করে
যারে শমসের কাম সাগরের কূলে
আবার ঝরা ঘাটে বাঁধন দিয়ে ভক্তির রসি ধরে
ও তোর মুর্শিদ বরজক সাথে নিলে মানিক মুক্তা মিলতে পারে।

১৬১.

পাকা ডুবরী না হইলে কি আর মুক্তা মিলে
ঝিনুকেতে মুক্তা মিলে সেতো থাকে গভীর জলে ॥
সাধন ভজন নাই আমার না আছে দমের শুমার
কেমন করে ডুবদিই জলে
ডুবার ভয় যে লাগে দেলে ॥
মুক্তা তুলতে হয়রে আশা মন ব্যাপারী তাতে দেয় বাধা
আমার দমের ঘরে পড়ছে ফাঁকি
কেমনে যাই সাগরের কূলে ॥
জ্ঞানের সাগর কয় এতিবর শুনরে শমসের মুক্তার খবর
ও তুই দমের ঘরে ফাঁদ পাতিলে
ঐ ফাঁদে মুক্তা মিলে ॥

১৬২.

পারে কি আর যাবে তরী
অসময় ধইরাছি পাড়ি
গাবকালি নাই তরীর তলায়
কখন ঢেউয়ে মারে ॥
পাপে হইল দেহ ভারী
সামনে সময় দণ্ডচারী
শেষ বেলায় ধইরাছি পাড়ি
দয়াল নামের আশা করি ॥

না জেনে পাপ করেছি আমি
তুমি আল্লাহ দয়ার স্বামী
ক্ষমা করো এই পাপীরে
আমি অধম হই ভিখারী ॥
জ্ঞানের সাগর কয় এতিবর
শুনরে শমসের রহমানি নফছের খবর
সাবধানে সাগর দিবি পাড়ি
নইলে গাঙ্গে ডুববে তরী ॥

১৬৩.

আমার প্রাণ কান্দে যাইতে রে
খুঁটি পাড়ার গ্রামে
সেথায় জানি বসেরে আছে
আমার দয়াল মুর্শিদ চাঁদ
ওকি মন চল-রে আমার মুর্শিদের তল্লাসে ॥
এ-যে খুঁটি পাড়ার ধুলি কণারে
দুই হাতে মাখিয়া
দুই চোখে পরাবো-রে আমি
সুরমা বানাইয়া কি মন চলরে
আমার মুর্শিদের তল্লাশে ॥

১৬৪.

পড়গা নামাজ চার ছুরাতে
চার ছুরাতে পড়লে নামাজ
আদায় হয় কায়েমী ছালাত ॥
আলেপ ছুরাতে হইয়া খাড়া
কিয়াম জগতে আছে কারা
জ্ঞান নয়নে দেখরে তারে
কে কি সাজা পাইতাছে
দেখলে সাজা হবিরে সোজা
পারবি না কুপথে যেতে ॥
রুকুর দেশে যাইয়া দেখ
হে ছুরাতে আছে কারা
সেই দেশেরই কঠোর সাজা
দেখরে নয়ন খুলিয়া
দেখলে সাজা পাবি ব্যথা
ভাসবি নয়ন পানিতে ॥

১৬৫.

সেজদা দেশে গেলে পারে
মিম ছুরাতে সামনে মিলে
সেই দেশেরী এমন ধারা

দেখলে পরাণ যায় উড়ে
কোন দোজখের কেমন সাজা
দেখবিরে এই ধরাতে ॥
আত্তাহিয়াতু বৈঠকে দেখ
দাল ছুরাতে বসে কারা
যুগ যুগ ধরে আছে তারা
এক ধ্যানেতে বসিয়া
নামাজের ভেদ জানবি যদি
ধর মুর্শিদের চরণেতে ॥

১৬৬.

কোনবা ধ্যানে পাই জাতেরে বল
জাত ছেফাতের কেমন খেলা
দেখরে বুঝে এই ধরাতে ॥
জাতের ধ্যান করতে গিয়ে
ছেফাত এসে সামনে ভাসে
কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরি বল
পড়ি আমি ভীষণ ঘোরে ॥
জ্ঞানি গুণি বলে তারা
জাতের দেখা হয় নারে ধরায়
ছেফাতে ভরা সারা জাহান
যেমন দুগ্ধে মিশে ছানারে ॥
বলে জ্ঞানী মহাজনে
ছেফাতের সেবা করো একিনে
জাতে খুশি হয়রে তাতে
মুক্তি দেয় তারে পরোয়ারে ॥

১৬৭.

আমার মুর্শিদ চান
তুমি বিনে বুঝেনা মোর প্রাণ
সারা রাতি জেগে জেগে গাই যে তোমার গান ॥

তোমার কথা মনে হইলে ঘুম আসেনা চোখে
আকাশেরই তারা দেখে বুঝেনা যে প্রাণ ॥

তোমার ছুরাত দেখলো যারা দেখলো আল্লাহর মুখ
তোমার বাহু জড়িয়ে বান্দা ঠাণ্ডা করলো বুক ॥

মুর্শিদ তোমায় এই ভুবনে চিনতে যারা পারে
তোমার প্রেমে মত্ত হইয়া গায় যে বাউল গান ॥

তাই পাগল শমসের না করিল প্রেমের সন্ধান
সংসার জ্বালায় আমার জ্বলে শুধু প্রাণ ॥

১৬৮.

মুর্শিদ তোমার প্রেম অনলে দেহ পুইড়া হইল ছাই
তুষের অনল বুকে জ্বলে নিশ্বাসেতে উড়ে ছাই।

মুর্শিদ আমার আপন জনা কর্ম দোষে দেয়না ধরাগো
আমার হাই হুতাসে দিন কাটে
পারে এই দেহের ভরসা নাই ॥

অবুঝ অবলা ছিলাম প্রেমের সন্ধান না জানিতাম গো
তুমি শিখাইয়া প্রেমের খেলা
যৌবনকালে কাছেনাই ॥

তোমায় সঁপেছি ভাঙ্গাতরী, তুমি দেহের কারিগর গো
কোরআনে তাই প্রমাণ করে
পাগল শমসের মুর্শিদ চিনে নাই ॥

১৬৯.

দ্বীনের নবী আমার আশেক দেওয়ানারে নবী
তাই মা আমেনা দুগ্ধ দেয়, নবী আমার নাহি খায়।
আমেনা কান্দিয়া বলে ছেলে বাঁচবেনা
আমার নবী বলে মা গো তোমার দুগ্ধ খাইবোনা,
তোমার দুগ্ধ খাইলে মাগো উম্মত পাইবোনারে নবী ॥

তাই উম্মতেরী লাগিয়া সারা জীবন কান্দিয়া
এখনো কান্দিছেন নবী, মদিনাতে শুইয়া
সেই নবীর লাগিয়া, দেহ প্রাণ দাও সুপিয়া
হাশরে তরাইবে নবী উম্মত বলিয়ারে নবী ॥

তাই হায়াতুল মুরছালিন নবী, চার যুগে রয় বাঁচিয়া
এখনো রয়েছে নবী, মুর্শিদ রূপ ধরিয়া
সেই মুর্শিদের কাছে যাও, আল্লার সন্ধান মেনে নাও
কোন রূপেতে আছে আল্লাহ দেখ সন্ধান করিয়ারে নবী ॥

১৭০.

আমার দেহ দিলাম যারে রে
আমার পরাণ দিলাম যারে-রে
সে যে আমার সাথে করলোরে অভিমান।
সে যে শিকারী সাজিয়া তীরনধারী হইয়া
তীরের সেল মারলো বন্ধু আমার বুকে হানি ॥

প্রেম ভাবেতে মন মজায়া বন্ধু, সব নিয়াছে হরি
বিচ্ছেদ জ্বালা বুকে লইয়া এখন, দেশে দেশে ঘুরি
আমার মতো হত ভাগিনী নাই এই ভবে জানি।

বাসর রাতে ভুল করেছি বন্ধু, আগে না জানিয়া
মনও প্রাণ সব নিয়াছ তুমি, অবলারে পাইয়া
এই ছিলো তোর মনের বাসনা জানতাম না আগে আমি ॥

১৭১.

আমি আর কি পাব তারে
মনো প্রাণ দিয়াছি যারে ॥
জ্বালাইয়া সে প্রেমের বাতি
রাখে আমায় অনেক দূরে ॥

কোন দোষও পাইয়াছে বন্ধু, আমার চলার পথে,
মন খুলিয়া বলোনা সে, আড়াল দিয়া চলে,
আমি কাজল কালো কেশ বাধিয়া না পারি ভুলাতে ॥

পঞ্চ সখি সঙ্গে নিয়ে যাব বন্ধুর কাছে
বুঝাইয়া বলবে তারা, আমার পক্ষ ধরে
পঞ্চ সখী হয়না বাধ্য বলে তারা উল্টাভাবে।

এতিবর কয় পাগল শমসের, পঞ্চ সখি ধরগা আগে
তারা যদি হয়রে বাধ্য তোর বন্ধুর দেখা হবে ॥
নইলে মানব জনম বৃথা যাবে ঘুরবি চুরাশি দ্বারে ॥

১৭২.

ওরে দয়াল, তোমার লাইগা হইলাম দেশান্তরী
আমি এদিক সেদিক ঘুরিফিরি
ঐ রূপ না আর হেরি ॥

ঘুমের ঘরে দেখলাম যারে নয়ন দু'টি ভরি
বুকের মাঝে রাখবো তারে, দিবনা আর ছাড়ি
আমার ঘুম ভাঙ্গিল সব হারাইলো
এখন কোথায় তারে ধরি ॥

পাগল বেশে দেশান্তরে ঘুইরা যদি মরি
কলংক হইবে দয়াল ঐ নামে তোমারই
তাই পাগল শমসের হইলো কাঙ্গাল
দাও তোমার চরণ তরী ॥

১৭৩.

কেনো কর দেরী মন
আল্লাহ রাসুল বোল বলিলে, সব জাগাই তোর বাহাদুরী

নামাজ রোজা বন্দেগীর কথা, না করলি তুই জাতের পূজা
না দেখলি ছেফাতের দৃশ্য, রইলি সদায় ভুলেরে মন

সমন যে দিন করবে আক্রমণ, দেহ ভাণ্ডার জুড়ে রে মন
প্রাচীর ভেঙ্গে ধরবে তোরে খাটবেনা আর ছল চাতুরী ॥

সে দিন হিরা কাঞ্চন মাণিক মুক্তা সব কিছু তোর রবে পইড়া
শূন্য হাতে যেতে হবে, নতুন এক শহরে রে মন
পুজি বিহীন ধরবে সে দিন, এজলাসেতে তুলেরে মন
পড়বি সেদিন কঠিন ফ্যারে চোরাশি দ্বারের সিড়ি ধরি ॥

তাই এতিবরের শ্রেষ্ঠবাণী. শমসের তুই টানবি ঘানি
না করলি পাছআন পাছের খেলা. বোবা যদি হলিরে মন
বোল বিহীন পাখি সে দিন. পড়ে যাবে ধরা রে মন
এ জনম তোর যাবে বৃথা, কি হবে আর সেজদামারী ॥

১৭৪.

চালাও তরী মুর্শিদ নামে
আটে সাতাশের হিসাব ধরে
ছাড় তরী খোদ মুকামে ॥
আল্লার নামে বাদাম তুলে
মুর্শিদ নামে হাল ধরিয়ে
প্রেমের তরী দাওরে ছেড়ে
টলবে না তরী ঝড় তুফানে ॥
ঐ-না নদীর পাঁচটি বাঁকে
গোরা চাঁদে ফাঁদ পেতেছে
সেথায় ছেড়ে শক্তি করলে ভক্তি
ডুববেনা তরী গহীন সাগরে
নিরিখ বরজক সোজা করি
জ্ঞানের বৈঠা ধইরো কষি
ঠেক্‌বেনা তরী বালুর চরে
মুর্শিদ বরজক থাকলে সাথে ॥

১৭৫.

যারে নিয়ে যাবি পারে, খুঁজে একবার দেখ মন তারে
দ্বীনের নবী হইছে ওফাৎ আছে প্রমাণ মদিনাতে ॥
হায়াতুল মুরছালিন নবী চারযুগে জিন্দা সত্যি
দেল খুঁজিলে পাবি দেখা মুর্শিদ চরণ ভছলে পারে ॥
হায়াতুল মুরছালিন বল যারে, সেতো তোমার দেহের ঘরে
সত্তর হাজার পর্দার আড়ে খুঁজো তারে মাহমুদা মুকাম ঘিরে।
ষোল আনা দিয়ে পুঁজি পাঠায় ভবে ব্যবসার খাতির
মিছা মায়ায় পইড়া ভবে সব হারাইলি প্রেম সাগরে ॥
পার ঘাটের মাঝি যেজন ধরবে সে দিন হিসাবের কারণ
সঠিক জবাব নাহি দিলে রাখবে তোরে দোযখের ঘরে
পাগল শমসেরের মনের ক্ষুধা এতিবরের কাছে রইল সুধা
ভজলে চরণ হবি সুজন ঐ ক্ষুধা তোর যাবে দূরে ॥

১৭৬.

হায়রে দয়াল আমার কথা নাই তোমার মনে-রে
আমার কথা মনে হইলে হায়রে দয়াল, আমার
এই হাল হইতে পারে ॥

কত আশা জাগেরে দয়াল চাঁদ, হায়রে দয়াল
শুনতে তোমার মুখের রে বাণী
আমার পাপি কানে যায়নারে শুনা, হায়রে
দয়াল ক্ষমা কইরো আমারে ॥

পাখা যদি থাকতো রে দয়াল চাঁদ, হায়রে দয়াল
মদিনায় যাইতাম উড়িয়া
আমি সকল দুঃখ খুলেরে কইতাম, হায়রে দয়াল
বসিয়া তোমার রওজায় রে ॥

সকলেরই সকল আছেরে হায়রে দয়াল
আমার আছো রে তুমি
তুমি লাগাইয়া চাঁদেরও বাজার রে, হায়রে দয়াল
মদিনায় রইলা ঘুমাইয়ারে ॥

১৪. গোলাম জিয়ারত আলীর গান

১৭৭.

আদমের ভিতর আছে এক আদম রতন
তাকে চিনে করবে সাধন-ভজন ॥
সময় গেলে পড়বি রে ভীষণ ফ্যারে
আদমকে না চিনলে বৃথা যাবে
তোর সাধের মানব জীবন ॥
আদম হয়ে আদমকে চিনতে হলে
আদম ছাড়া মিলবেনা রে আদমের সন্ধান ॥
সেই আদম বিহনে সবই অন্ধকার
এক ভরসায় বরজখে রাখিও মুর্শিদের স্মরণ ॥
গোলাম জিয়ারত বিনয় করে কয়
আদম হয়ে আদমকে চিনতে যদি হয়
দিন থাকতে দ্বীনের ভাবনা ভাব মনা
দিন ফুরাইলে পাবেনারে হায়দারী চরণ ॥

১৭৮.

আঠার চিজের মৈথুনে আল্লাহর হুকুমে
আদম দেহ হল তৈরি যাঁর সুরতে
সেই সুরতের মন্ত্রণা জপ মনে এলাহি নামেতে
হৃদয়কাবায় উঠবে ভাসি আদম সুরত দেখবে তাতে ॥
হও যদি কামেল মুর্শিদের দাসানুদাস

মানস চক্ষু যাবে খুলে দেখবি তারে নিজ সুরতে ॥
গোলাম জিয়ারত বলে, আঠার চিজের খবর পেতে হলে
নিজকে চিনে চলে যারে হায়দারী মনেতে ॥

১৭৯.

মনের মানুষ মন ময়না
কেন কথা কয়না ॥
দমের ঘরে মেরে তালা
হায়দারী আর্শিতে তাঁরে দেখে নেনা ॥
মনের মানুষ মন ময়না
সে যে আপন পর চিনেনা ॥
ঠিক রাখিও ভরসা, বরজখ ধন সার কর
প্রেম ছাড়া তার নাই কোন নিশানা ॥
গোলাম জিয়ারত কয়, দেখতে যদি হয় বাসনা
মীম আর্শিতে পারদ লাগাইয়া, বরজখে তাঁরে দেখে নেনা ॥

১৮০.

মাটির পিঞ্জরে আছে নুরীর নুরীতন
ভেদ পরিচয় জানলামনা তার কোন দিন ॥
মুর্শিদ বিহনে জ্বলবে নারে
নুরের বাতি মাটির পিঞ্জরে
ঐ না পিঞ্জরে আছে মিশে সে
সেথায় জ্বলছে চেরাগ মাণিক রতন ॥
সেই খানে বসত করে হায়দারী মন ময়না
এক দিনও দেখলাম না তারে এ নজরে
সে যে আছে আঠার চিজে মিশে
মীম মোকামে ঢাকা আহাদ নুরীতন ॥
গোলাম জিয়ারত বলে—
মীম আর্শিতে পারত লাগাইয়া
দেখে নেরে তাঁর সুরত খান ॥

১৮১.

চার পেয়ালার মৈথুনে
আল্লাহর হুকুমে,
আদম দেহ যার সুরতে
সেই সুরতে ফুকারিলেন তার দমে ॥
গোপন তত্ত্ব দিল বলে
আদমের তরেতে
ডাকিল ফেরেস্তাকুলে
সেজদা দিতে আদমে ॥
ভেবে দেখ মনা
আদমেতে কার ঠিকানা

গোলাম জিয়ারত বলে, বাধ বাসা হাওয়ার ঘরে শক্ত করি
ভুল হয় না যেন তাওয়াক্কাল বরজখে হায়দারী ॥

১৮৬.

আমার নয়ন মণি, ধ্যানের ছবি এ ভব সংসারে
বাগের বাজারে ঝাণ্ডা তারই উড়ে ॥
মুর্শিদ বিহনে সবই অন্ধকারে
মায়াময় এ ভব মাঝারে ॥
আর কান্দাইওনা এ দাসেরে
দেখা দাও এ গোলামের অন্তরে ॥
গোলাম জিয়ারত কাইন্দা কয়রে
তোমার পদ ধুলি না পেলে মানব জীবন বৃথা যাবে রে ॥

১৮৭.

মোমেনের দেলে আসন যার
হাদিছে লেখা আছে প্রমাণ তার ॥
আস্‌সালাতু মেরাজুল মোমেনিন জবান যার
সালাতে দরশন হবেরে তার ॥
তিন টক্করে পড়লে নামাজ পাবেনা তাঁর দিদার
খুশু ও খুজু চিনে পড় নামাজ পাবে দেখা মাওলার ॥
গোলাম জিয়ারত বলে হায়দারী বিহনে সবই অন্ধকার
নামাজ কবুল হয় না তার অছিলা ছাড়া হৃদয় যার ॥

১৮৮.

মাটির পুতুল বানাইয়া
সুঁইচ দিলা টিপিয়া
কোন স্প্রিংয়ের ভিতর
তুমি লুকাইলা ॥
সেই পুতুলের অন্তরে
কি খেলা খেলছ তুমি গোপনে ?
আট কোঠরী নয় দরজা বানাইয়া ॥
পর্দার উপর পর্দা ফেইলা
পুতুলকে দিলা অন্ধ কইরা
যেমনি নাচাও তেমনি নাচে নয়ন মুদিয়া ॥
গোলাম জিয়ারত বলে
তোমার মহিমায় অন্ধ পুতুল দেখতে পাইয়া
হায়দার বাবার পাগলা ছেলে
হাসে গগন ভেদিয়া ॥

১৮৯.

কেউ ফিরে না খালি হাতে
হোসেন বাবার দরবার হতে ॥

তাঁর গুণের নাইকো সীমা দিন রাতে
চল গাই তাঁর গান হরদমেতে ॥
দেওয়ানা হয়ে তাঁর প্রেমেতে
ধরলাম পাড়ি প্রেম নদীতে ॥
ভব নদী হব পার তাঁর প্রেমের তাজাল্লিতে
চল যাই দয়াল বাবার দরবার জিয়ারতে ॥
গোলাম জিয়ারত বলে মুক্তি যদি চাও পেতে
চল যাই দয়াল বাবার রওজাতে ॥

১৯০.

আদম ছাড়া আল্লাহর কোন প্রমাণ নাই
আয়াত কোরআন পড়ে নামটি জানা যাবে ভাই
কাদা মাটির মাঝে মিশে আছে তাঁর ঠিকানাই
আয়াত কোরানে প্রমাণ মিলবে তাই ॥
মানুষ ছাড়া আল্লাহ কোথাও নাই
তাঁর সিংহাসন আছে মানুষের কলবে ভাই ॥
গোলাম জিয়ারত ভেবে বলে হায়দারী জাল্লে জালালিয়াই
তার সাক্ষ্য আছে রাসুলুল্লাহ খোদাইয়াই ॥

১৯১.

কাদা মাটি দিয়া আদম বানাইয়া
কি খেলা খেলিলা কে কার ভিতর লুকাইয়া
প্রমাণ আছে সুরা ছুয়াদে দেখ কোরআন খুলিয়া
তার সাক্ষ্য আছে রাসুলুল্লা খোদ খোদাইয়া
খালাকাল আদামা আলা সুরাতেহি বলিয়া
লাকাদ কাররামনা বলি আমানতের ভার দিল তুলিয়া ॥
প্রমাণ মিলবে ভাই হাদিস খুলিয়া
তারও সাক্ষ্য আছে হায়দারী জাল্লেজালালিয়া
গোলাম জিয়ারত বলে ভাবিয়া
আল্লাহ আদম মুহাম্মদ যায়রে ভাই এক হইয়া ॥

১৯২.

কে কে তোরা যাবি পারেতে
আয় মোর সাথে, রাসুল নামের তরীতে
রূপসও হায়দারী কর্ণধার হয় তাতে
মূল সাধনে ভুল হলে কেমনে যাবি পারেতে ॥
যিনি মুর্শিদ তিনি রাসুল নেই কোন ভুল এতে
মুর্শিদ ছবি না থাকিলে নিবে না ঐ তরীতে
গোলাম জিয়ারত বলে আছে পরস্পর
মুর্শিদ ছবি স্মরণ করে পার হবিরে বিদ্যুতে ॥

১৯৩.

মনো পবনে আসে যায়
চারি সেকেণ্ডে একবার
কেবা আসে কেবা যায়
জেনে নাও ভেদ পরিচয় তার ॥
মুর্শিদ ছাড়া মিলবে নারে
ভেদ পরিচয় যার ॥
তারে কর অতি যতন
হয়ে একাকার ॥
মীম আর্শিতে
দেখে নাও হীরকের ধার ॥
কোথা থেকে আসে যায়
নিরাকারে আকার ॥
গোলাম জিয়ারত বলে
দয়াল হায়দারীর দয়া হলে পাবি সাকার ॥
খুশু ও খুজু চিনে
কর সিজদা হয়ে দীপাধার ॥

১৯৪.

নাসা রন্ধ্রে নাভী মূলে
আসে প্রভু নিরাকারে ॥
হাওয়ায় আসে হাওয়ায় যায়
হাওয়ার ঘরে ভাসে নীরে ॥
বশে আনলে হাওয়ারে
নুরের জ্যোতি জ্বলবে হৃৎ মন্দিরে ॥
পাস আনফাস ডাক তারে
নফী খফি হাওয়ার ঘরে ॥
গোলাম জিয়ারত বলে
দয়াল হায়দারীর কুদরতে
হাজের নাজের স্বপ্ন নয়রে
নুরের নুরীতন ভাসে নীলাম্বরে ॥

১৯৫.

খাকির পিঞ্জরের মাঝে হায়
মন ময়না কেমনে আসে যায় ॥
ময়নারে ধরতে পারলে
প্রেমের মালা দিতাম তার গলায় ॥
সেই না পিঞ্জরের মাঝে হায়
আট কুঠুরী নয় দরজায়
সদাই ময়না ঘুরে বেড়ায়
মধ্যে মধ্যে পর্দা আটা তায় ॥
কোর্ট-কাছারি আছে যেথায়

নুরের মহল তায় ॥
গোলাম জিয়ারত ভেবে কয়
দমে দমে ডাক তায়
সাধন-ভজন কর
হায়দারী ঠায় ॥

১৯৬.

মাটির এক পিঞ্জরা
আছে তার তিন তলা ॥
উপর তলায় বিবেক বেল
মধ্য তলায় থাকে সে।
মাল খানা আছে নীচ তলা ॥
বিবেক বেল আছে সেথা
কোর্ট-কাছারি মধ্য তলা
আছে সেথা হায়দারী প্রেম জ্বালা ॥
ছয় চোরায় চুরি করে
মাল খানায় দিল তালা মেরে
সেই না তালা খুলতে হলে
মুর্শিদ নামে বরজখ ধরে গাঁথ প্রেমমালা ॥
গোলাম জিয়ারত বলে
ছয় চোরারে ধরতে হলে
হাতে লয়ে নুরের আলা
যারে মনা মধ্য তলা ॥

১৯৭.

মনের মাঝে বাজায় বাঁশী
আমার হৃদয় কাবায় বসি ॥
সে যে প্রেম ধনে ধনপতি
আমার প্রেমের রাজা পূর্ণ শশি ॥
জনম ভরে ঘুরে মরি হয়ে পরদেশী
জানলিনারে মন, আপন ঘরে আরশ কুরছি ॥
গোলাম জিয়ারত বলে, দয়া কর দয়াল হায়দারী
আর কত কাল নয়ন জলে ভাসি ॥

১৯৮.

হৃদয় কাবায় বসত যার
সে যে আমার প্রেমের রাজা দয়াল হায়দারী ॥
আল্লাহ রসুল দয়াল বাবা হায়দারী
আমি অধম ভিখারী তার করুণারই ॥
আমার আওয়াল আখের জাহের বাতেন
সবই বাঁধা চরণে তারই ॥
গোলাম জিয়ারত বলে প্রেমে বাধা যার
সে যে সকল কুলের কাণ্ডারী ॥

১৯৯.

মুর্শিদ আমার জানের জান পতিত পবন
কেনরে মন ঘুরে মর চুরাশি ভুবন ॥
আপন ঘরে আছে বোঝাই মণিমুক্তা মাণিক রতন
নিজকে চিনে কর তার সন্ধান ঠিক রাখিও বরজখ ধন ॥
হাওয়ায় আসে হাওয়ায় যায় কর তাঁর স্মরণ
হাওয়ার ঘরে বন্দি হবে হায়দারী মন পবন ॥
গোলাম জিয়ারত বলে পরকে কর আপন
দয়াল বাবার দয়ার গুণে দূর হবে সকল জ্বালাতন ॥

২০০.

দমে আসে দমে যায় রে
দম ফুরালে পাবি কি আর মন ময়নারে ॥
দম থাকতে বাঁধ তারে, প্রেমের বাসরে
মুর্শিদ স্মরণে নাও চিনে দমের ঘর খানারে ॥
মুর্শিদ বিহনে মন ময়না ধরা দেয় নারে
দয়াল হায়দারীর দয়া হলে, বন্দী হবে দম পিঞ্জরে ॥
গোলাম জিয়ারত বিনয় করে বলেরে
মুর্শিদ প্রেমে নিজ দমে দর্শন মিলে তারে ॥

খ. তথ্য দাতাদের নাম তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পিতা/স্বামী	বয়স	পেশা	ঠিকানা (সবার জেলা রাজশাহী)
১.	কবি মোঃ মকসেদ আলী	তছিমুদ্দিন সরকার	৭১	ফকিরী	বলিয়া ডাইং, গোগ্রাম, গোদাগাড়ি, রাজশাহী
২.	মোসাঃ নুরবানু	স্বামী-মকসেদ আলী	৫৩	গৃহিনী	"
৩.	শফিউল্লাহ সরকার	ফসিউল্লাহ	৮৩	কৃষি	ব্রাহ্মন পুস্করিণী ইদলপুর, প্রেমতলী, গোদাগাড়ি
৪.	মোজাহার আলী	আলী মোহাম্মদ সরকার	৮২	শিক্ষকতা	ঈশ্বরীপুর, প্রেমতলী গোদাগাড়ি
৫.	আবদুস সামাদ	খোদাবক্‌শ মণ্ডল	৭৮	কৃষি	"
৬.	হাসান আলী সরকার	মোসলেম উদ্দিন সরকার	৮২	চাকুরী	বলিয়া ডাইং, প্রেমতলী, গোদাগাড়ি
৭.	মনসুর সরকার	ঈমানী সরকার	৭০	কৃষি	ঈমানীগঞ্জ, দামকুড়া, গোদাগাড়ি
৮.	ধুলু মৃধা		৭০	চাকুরী	পবা পুর্ব নতুন পাড়া, শাহমখদুম, রাজশাহী
৯.	আবদুস সালাম ফকির		৬০	ফকিরী	পূর্ব ছোট বনগ্রাম, সপুরা, রাজশাহী
১০.	হাদিসা খাতুন লাভলী	স্বামী : মোঃ আবদুল ওহাব	৩০	চাকুরী	চকছাতারী, বাঘা, রাজশাহী
১১.	শইদা খাতুন	ইনসার আলী প্রামাণিক	৪০	গৃহিনী	মোক্তার পুর, সারদা, চারঘাট
১২.	হযরত এতিবুর রহমান		১২৭	পীরগিরী	খুঁটিপাড়া, বানেশ্বর, পুঠিয়া
১৩.	কবি মোঃ আবদুল খালেক	মোঃ আয়েজ উদ্দীন সরদার	৬৩	পীরগিরী	চকদুর্লভপুর, নন্দনপুর, পুঠিয়া
১৪.	মরিয়ম ও গুলনাহার	স্বামী মোঃ আবদুল খালেক		গৃহিনী	"
১৫.	আবদুস সাত্তার	এলাহী বক্স	৫৬	কৃষি	"
১৬.	ফরিদ আহমদ মংলা ফকির		৯০	ফকিরী	কৃষ্ণপুর, পুঠিয়া
১৭.	বাদশা ফকির	মনির হোসেন	৫৫	কৃষি	শাদীপুর, সারদা, চারঘাট
১৮.	হামিদ আকবর	ময়েন মণ্ডল	৬০	চাকুরী	নন্দনপুর, ভালুকগাছি, পুঠিয়া
১৯.	মজির উদ্দীন সা	ময়েজ উদ্দীন সা	৮৬	কৃষি	উত্তর মিলিক বাঘা, বাঘা
২০.	ফুলজান বিবি	ময়েজ উদ্দীন সা	৭৬	গৃহিনী	"
২১.	সিদ্দিক সা	মজির উদ্দীন সা	৪৪	ব্যবসা	"
২২.	ওহিদুর রহমান	হাবিবুর রহমান	৫৫	শিক্ষকতা	সহকারী শিক্ষক বাঘা উচ্চ বিদ্যালয়, বাঘা
২৩.	জিল্লুর রহমান সা	মজির উদ্দনি সা	২৬	চাকুরী	উত্তর মিলিক বাঘা, বাঘা
২৪.	শ্যামল কুমার দাস	কৃষ্টপদ দাস	৩৮	গান গাওয়া	খায়েরহাট, ব্যাংগাড়ী, বাঘা
২৫.	আবদুস সাত্তার	হাজী আবেদ প্রামানিক	৫৫	কৃষি	ছকছাতারী, বাঘা
২৬.	আলী মুহাঃ হাশেম	কফির উদ্দিন	৫২	চাকুরী	সহকারী অধ্যাপক, শাহাদৌলা ডিগ্রী কলেজ, বাঘা
২৭.	প্রভাষ চন্দ্রদাস	কৃষ্টপদ দাস	৫০	গান গাওয়া	খায়েরহাট, ব্যাংগাড়ী, বাঘা
২৮.	আবদুল ওয়াদুদ মাস্টার	মোঃ ময়েজ উদ্দীন	৫০	চাকুরী	কালিদাস খালী, বাঘা
২৯.	মফিজ পাগলা	ইমান আলী ফকির	৫৫	গানগাওয়া	নিশ্চিন্তপুর, বাঘা
৩০.	খাজা মহসিন আলী	ইসমাইল প্রামাণিক	৪৮	ব্যবসা	বলিহার, মনিগ্রাম, বাঘা
৩১.	মোসাঃ হাজেরা	স্বামী-খাজা মহসিন আলী	৩৮	গৃহিনী	মনিগ্রাম, বাঘা
৩২.	গোলাম মোস্তফা	ইমাজ উদ্দিন মোল্লা	৫৫	কৃষি	মনিগ্রাম দক্ষিণ পাড়া, বাঘা
৩৩.	এজমা খাতুন	ইমাজ উদ্দিন প্রাং	৪৫	গৃহিনী	মনিগ্রাম, বাঘা
৩৪.	হযরত আলী চিশতি	মজের উদ্দিন	৬০	চাকুরী	টিকিট মাস্টার-বাঘা বাসস্ট্যাণ্ড, বাঘা
৩৫.	আবদুল আউয়াল	আতাহার আলী সরকার	৩৮	চাকুরী	আটঘরি, মনিগ্রাম, বাঘা
৩৬.	সুশীল কুমার সরকার	সুধীর কুমার সরকার	৪৫	চাকুরী	আটঘরি, মনিগ্রাম, বাঘা

ক্রমিক নং	নাম	পিতা/স্বামী	বয়স	পেশা	ঠিকানা (সবার জেলা রাজশাহী)
৩৭.	জহুরুল ইসলাম	জোনাব আলী প্রাং	৩৫	চাকুরী	দেবত্তর বিনোদপুর, মনিগ্রাম, বাঘা
৩৮.	মোকবুল হোসেন চিশতি	খোরশেদ আলী চিশতি	৬৯	ব্যবসা	চকছাতারী, বাঘা
৩৯.	নূরুল হুদা চিশতি	খোরশেদ আলী চিশতি	৬১	চাকুরী (অবসর)	অধ্যক্ষ (অবসর) শাহদৌলা ডিগ্রী কলেজ, বাঘা
৪০.	গোলাম রব্বনী চিশতি	মোকবুল হোসেন	৩২	ব্যবসা	চকছাতারী, বাঘা
৪১.	জহুরা বেগম	খোরশেদ আলী চিশতি	৬৫	গৃহিনী	চকছাতারী, বাঘা
৪২.	আবদুল লতিফ	হাজী মোঃ আবেদ আলী প্রামাণিক	৪২	ব্যবসা	চকছাতারী, বাঘা
৪৩.	ওহিদুর রহমান	ওসমান খলিফা	৫০	ব্যবসা	চকছাতারী, বাঘা
৪৪.	কবি আবদুল আলিম ফকির	কসিমুদ্দিন ফকির	৬১	গান গাওয়া	জুড়ানপুর, বাগধানী, তানোর
৪৫.	হাবিবা	স্বামী: আবদুল আলিম	৪০	গৃহিনী	জুড়ানপুর, বাগধানী, তানোর
৪৬.	মোঃ কাইমুদ্দিন	মোহসিন আলী	৫০	ব্যবসা	জুড়ানপুর, বাগধানী, তানোর
৪৭.	খাজা আহমদ সরদার	নজর আলী সরদার	৬০	কৃষি	জুড়ানপুর, বাগধানী, তানোর
৪৮.	আসান আলী সরদার	হোসেন আলী সরদার	৬১	কৃষি	জুড়ানপুর, বাগধানী, তানোর
৪৯.	তুজির উদ্দিন খান	জাহাঙ্গীর খান	৬৯	কৃষি	বাগধানী, পবা
৫০.	খাজা খলিলুর রহমান চিশতি	সিরাজ উদ্দিন শাহ	৬৫	চাকুরী (অবসর)	মানছুরিয়া খানকা শরীফ, স্যার আঃ রহিম রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী
৫১.	আতাউর ভাণ্ডারী	মসলেম মণ্ডল	৪৫	কৃষি	বড় বনগ্রাম, পাঁচ আনীপাড়া, সপুরা, শাহমখদুম, রাজশাহী
৫২.	মোঃ কেতাব আলী	জব্বার মণ্ডল	৫৬	কৃষি	বড় বনগ্রাম, পাঁচ আনীপাড়া, সপুরা, শাহ মখদুম, রাজশাহী
৫৩.	আলিম উদ্দীন ভাণ্ডারী		৫৫	কৃষি	উজিরপুকুর, খড়খড়ি, বোয়ালিয়া, রাজশাহী
৫৪.	ফরিদা খাতুন বেলী	খলিলুর রহমান চিশতি	৩৮	গৃহিনী	মানছুরিয়া খানকা শরীফ, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী
৫৫.	আজগর আলী ভাণ্ডারী	জাফর আলী	৪৭	চাকুরী	বড় বনগ্রাম, পাঁচ আনীপাড়া, শাহমখদুম, রাজশাহী
৫৬.	কাতিমুন খাতুন	স্বামী-আজগর ভাণ্ডারী	৩৮	গৃহিনী	বড় বনগ্রাম, পাঁচ আনীপাড়া, শাহমখদুম, রাজশাহী
৫৭.	আমজাদ হোসেন হায়দারী	ঘেতন শেখ	৬১	ব্যবসা	শাদীপুর, সারদা, চারঘাট
৫৮.	আবু তাহের	আজের প্রামাণিক	৫০	ব্যবসা	জাফরপুর, শলুয়া, চারঘাট
৫৯.	মোনায়েম আলী	হারেজ আলী	৪০	চাকুরী	মোক্তারপুর, সারদা, চারঘাট
৬০.	শরীফুল ইসলাম	আবুল কাশেম সরদার	৪০	ব্যবসা	মোক্তারপুর, সারদা, চারঘাট
৬১.	মামুনুর রশিদ	আমজাদ হোসেন	৩২	ব্যবসা	শাদীপুর, সারদা, চারঘাট
৬২.	আইয়ুব আলী	আজের প্রামাণিক	৪০	ব্যবসা	বথুয়া, শলুয়া, চারঘাট
৬৩.	কোবাদ আলী		৫০	কৃষি	খুঁটিপাড়া, বানেশ্বর, পুঠিয়া
৬৪.	আবদুল ওহাব	আবদুল জব্বার	৪২	ব্যবসা	মোক্তারপুর, সারদা, চারঘাট
৬৫.	মুকুল কেশরী	আবুল ক্বাছিম কেশরী	৫৫	চাকুরী	কেশরহাট, মোহনপুর
৬৬.	দিল খুশ	আবুল ক্বাছিম কেশরী	৪০	গৃহিনী	কেশরহাট, মোহনপুর
৬৭.	খালিদ সাইফুল্লাহ	আবুল ক্বাছিম কেশরী	৬০	ব্যবসা	কেশরহাট, মোহনপুর

ক্রমিক নং	নাম	পিতা/স্বামী	বয়স	পেশা	ঠিকানা (সবার জেলা রাজশাহী)
৬৮.	দিলআরা	আবুল ক্বাছিম কেশরী	৫৬	গৃহিনী	কেশরহাট, মোহনপুর
৬৯.	খালিকুজ্জামান শওকত	আবুল ক্বাছিম কেশরী	৫৮	ব্যবসা	কেশরহাট, মোহনপুর
৭০.	দিলরুবা	আবুল ক্বাছিম কেশরী	৫২	গৃহিনী	কেশরহাট, মোহনপুর
৭১.	আবদুর রহিম সরদার	দুলব সরকার	৫৭	গানগাওয়া	দ্বীপনগর, বাসুপাড়া, বাগমারা
৭২.	সখিনা খাতুন	স্বামী- আবদুর রহিম সরদার	৪৫	গৃহিনী	দ্বীপনগর, বাসুপাড়া, বাগমারা
৭৩.	মোঃ শমসের আলী	লেদু মণ্ডল	৫৭	কৃষি	সূর্যপুর, বড়গাছি, পবা
৭৪.	সলেমান	আছিরুদ্দিন	৫০	কৃষি	সূর্যপুর, বড়গাছি, পবা
৭৫.	শরীফ মণ্ডল	বাজু মণ্ডল	৭৫	কৃষি	সবসার, বড়গাছি, পবা
৭৬.	অড়ঙ্গ জেব	সলেমান সরকার	৩৪	কৃষি	সবসার, বড়গাছি, পবা
৭৭.	মনসুর আলী	শমসের আলী	৩৬	কৃষি	সূর্যপুর, বড়গাছি, পবা
৭৮.	আবদুস সালাম	ময়েজ উদ্দিন	৩৫	কৃষি	সূর্যপুর, বড়গাছি, পবা
৭৯.	সরেজান বিবি	স্বামী- মোঃ শমসের আলী	৪৫	গৃহিনী	সূর্যপুর, বড়গাছি, পবা
৮০.	গোলাম জিয়ারত আলী	ইয়াকুব আলী সিকদার	৬১	শিক্ষকতা (অবসর)	উজাল খলসী, দুর্গাপুর
৮১.	সুফিয়া বেগম	স্বামী- গোলাম জিয়ারত আলী	৫০	গৃহিনী	উজাল খলসী, দুর্গাপুর
৮২.	শাহ নদের আলী	হুরুশাহ	৬৫	ফকিরী	বেলঘড়িয়া, পানানগর, দুর্গাপুর
৮৩.	ডাঃ মাহবুবুর রহমান	আবদুস সামাদ সরকার	৩৬	পল্লী চিকিৎসা	লক্ষ্মীপুর, কিসমত গণকৈড়, দুর্গাপুর
৮৪.	আতাউর রহমান	আরাজুল্লাহ	৫০	ব্যবসা	উজাল খলসী, দুর্গাপুর
৮৫.	সিদ্দিকুর রহমান	সিরাজ শেখ	৫০	কৃষি	উজাল খলসী, দুর্গাপুর
৮৬.	আবদুস সাত্তার	কিতাবুদ্দিন শেখ	৫৫	ব্যবসা	উজাল খলসী, দুর্গাপুর
৮৭.	আলহেলাল		৫০	ব্যবসা	ঘোড়ামারা, রাজশাহী
৮৮.	খয়ের উদ্দিন		৫৫	কৃষি	নারায়ণপুর, পানানগর, দুর্গাপুর
৮৯.	লাল মোহাম্মদ		৫৬	দলিল লেখক	নারায়ণপুর, পানানগর, দুর্গাপুর
৯০.	হাতেম আলী	মোঃ মল্লিকা	৩৫	কৃষি	উজাল খলসী, দুর্গাপুর
৯১.	আবুদল মান্নান		৪৫	ব্যবসা	দীঘলকান্দি, বানেশ্বর, পুঠিয়া।

গ. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. দুলাল চৌধুরী, *লোক সংস্কৃতির বিশ্বকোষ* (কলকাতা : আকাদেমি অব ফোকলোর, ২০০৪)।

২. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩)।

৩. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) (কলকাতাঃ প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১৯৯১)।

৪. W. W. Hunter, *Statistical Account of Bengal*, Vol. 2 (Delhi : D.K. Publishing House, 1974), pp. 54-55.

৫. GOB, *Bangladesh Population Census 1991* (Rajshahi : Bangladesh Bureau of Statistics, 1993), p. 1.

৬. কাজী মোহাম্মদ মিছের, *রাজশাহীর ইতিহাস ১ম খণ্ড*, (রাজশাহীঃ প্রকাশিকা সৈয়দা হোসনে আরা বেগম ১৯৬৫)।

৭. এবনে গোলাম সামাদ, *রাজশাহীর ইতিবৃত্ত* (রাজশাহীঃ প্রীতি প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯)।

৮. মুহম্মদ আবদুস সামাদ, *সুবর্ণ দিনের বিবর্ণ স্মৃতি* (রাজশাহীঃ উত্তরা সাহিত্য মজলিশ ১৯৮৭)।

৯. অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, (কলকাতাঃ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, সি-২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, ১৩৭৮)।

১০. আশরাফ সিদ্দিকী, *লোকসাহিত্য*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৭৭)।

১১. সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত *বাংলা দেহতত্ত্বের গান* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন ১৯৯০)।

১২. ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক, *মরমী কবি পাঞ্জু শাহঃ জীবন ও কাব্য* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর ১৯৯০)।

১৩. গোপিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, *ভবাপাগলার জীবন ও গান* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৫)।

১৪. ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক, *মরমী কবি খোদা বক্শ শাহঃ জীবন ও সঙ্গীত* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৭)।

১৫. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *বাউল কবি ফুলবাসউদ্দীন ও নসরুদ্দীনের পদাবলী* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ১৯৮৮)।

১৬. মযহারুল ইসলাম, *কবি পাগলা কানাই* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭)।

১৭. মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন কাসিমপুরী, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ১৯৭৩)।

১৮. ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক, *মরমি কবি রকীব শাহঃ জীবন ও সঙ্গীত* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০১)।

১৯. মাযহারুল ইসলাম তরু, *বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকসঙ্গীত* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০২)।

২০. ফকীর আবদুর রশীদ, *সূফী দর্শন* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৮০)।

২১. বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, *বাউল গান ও দুদ্দু শাহ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৩৭১)।

২২. মতিয়ার রহমান সরকার, *বাংলাদেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার*, নাটোর, ১৯৮৫।

২৩. মুহম্মদ আবু তালিব, *উত্তর বঙ্গে সাহিত্য সাধনা* (রাজশাহী : গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত জুলাই–১৯৭৫)।

২৪. ড. কাজী আবদুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ ১৯৬১।

২৫. ফকির আনোয়ার হোসেন (মন্টু শাহ), *লালন সঙ্গীত* (প্রথম খণ্ড), (ছেঁউড়িয়া, কুষ্টিয়া: লালন মাজার শরীফ ও সেবা সদন কমিটি ১৯৯৩)

২৬. মোঃ আবুদল খালেক, *তৌহিদ সাগর*, (রাজশাহী: প্রকাশক: গ্রন্থকার চৈত্র ১৩৮২)।

২৭. মুহম্মদ আবু তালিব, *লালন শাহ্ ও লালন-গীতিকা* (প্রথম খণ্ড), (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৬৮)।

২৮. মোঃ কলিম উদ্দীন মিঞা, *গীতি বিচিত্রা*, (রাজশাহী: বাঘা কবি কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৮৬)।

২৯. মোঃ আলিম উদ্দিন ফকির, *আলিম গীতি* (রাজশাহী: জুন, ২০০৪)

৩০. খাজা শাহ মোঃ শামসুল হক চিশতি, *মরমি সংগীত দর্শন* (দুর্গাপুর, রাজশাহী, ১৯৯৪)।

৩১. মোহিতলাল মজুমদার, *সাহিত্য বিচার*, (কলিকাতা: পরিবর্ধিত প্রথম বিদ্যোদয় সংস্করণ, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী)।

৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্য পথে* (কলিকাতা: পরিবর্ধিত সংস্করণ, বিশ্বভারতী ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ)।

৩৩. মনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্য দর্শনের ভূমিকা* (কলিকাতা : প্রথম সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সি ১৯৬৪)।

৩৪. ক্ষুদিরাম দাস, *বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি* (কলিকাতা: প্রথম সংস্করণ ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ)।

৩৫. শুদ্ধসত্ত বসু, *অলংকার জিজ্ঞাসা* (কলিকাতা : পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬২)।

৩৬. শশি ভূষণ দাশগুপ্ত, *সাহিত্য জগত*, উপমা কালিদাসস্য নবসংস্করণ, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

৩৭. বিনায়ক সন্ন্যাস, *রবিতীর্থে* (কলিকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ)।

৩৮. খোন্দকার রফিউদ্দনি, *ভাব সঙ্গীত* (হরিশপুর, ঝিনাইদহ। প্রকাশক : গ্রন্থকার, ১৯৬৮।

৩৯. সুকুমার সেন, *ভাষার ইতিবৃত্ত* (কলিকাতা : একাদশ সংস্করণ ইস্টার্ণ পাবলিশার্স)।

৪০. মুহম্মদ আবদুল হাই, *ভাষা ও সাহিত্য* (ঢাকা : ইস্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।

৪১. শ্রীশচন্দ্র দাস, *সাহিত্য সন্দর্শন*, মুহম্মদ মফিজুল ইসলাম (সম্পাদিত) বাংলাদেশ সংস্করণ, এম. এ চৌধুরী প্রকাশিত, মনীর হোসেন লেন, ঢাকা ১৯৫৪)।

৪২. আনিসুজ্জামান সম্পাদিত *শহীদুল্লাহ রচনাবলী* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৯৫)।

৪৩. শাহ আবদুর রহমান, *শরফুল ইনসান*, হামিদুর রহমান (সম্পাদিত), পুনর্মুদ্রণ, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ।

৪৪. ড. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, *মহিন শাহের পদাবলী* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৯৩)।

ঘ. সহায়ক প্রবন্ধ ও পত্রিকা

১. শামসুজ্জামান খান, 'এ্যালান ডাণ্ডেস : ফোকলোর ও নৃতত্ত্ববিদ্যার এক অসামান্য প্রতিভার প্রতিকৃতি,' আবুল হাসনাত সম্পাদিত 'কালি ও কলম' (ঢাকা: জুলাই ২০০৫)।

২. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, 'বরেন্দ্র অঞ্চল বা রাজশাহী বিভাগের ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক পরিচিতি' ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস* (রাজশাহী : বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতহাস প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৮)।

৩. মুহম্মদ আবু তালিব, 'রাজশাহী জেলার ভাষা প্রসঙ্গ' শামসুদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *রাজশাহী পরিচিতি* (রাজশাহী : বরেন্দ্র একাডেমী, ১৯৮০)।

৪. অধ্যক্ষ মুহম্মদ এলতাস উদ্দিন, 'রাজশাহী জেলার প্রাকৃতিক পরিচয় ও ইতিহাস' শামসুদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য সম্পাদিত *রাজশাহী পরিচিতি*, (রাজশাহী : বরেন্দ্র একাডেমী, ১৯৮০)।

৫. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, 'ইংরেজ শাসনামলে রাজশাহী' ড. তসিকুল ইসলাম সম্পাদিত *রাজশাহী এসোসিয়েশন সাহিত্য পত্রিকা* (রাজশাহী : রাজশাহী এসোসিয়েশন ১৯৮৭)।

৬. ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী, 'প্রাচীন বরেন্দ্র ভূমির পরিচয়' ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস* (রাজশাহী : বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতহাস প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৮)।

৭. রফিকুল ইসলাম, 'বরেন্দ্রভূমিতে মুক্তিযুদ্ধ', ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস* (রাজশাহী : বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতহাস প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৮)।

৮. ড. মুহম্মদ আবদুল খালেক, 'বরেন্দ্র ভূমির লোকসংস্কৃতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ', *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস* (রাজশাহী : বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতহাস প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৮)।

৯. ড. মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, 'রাজশাহীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক', শামসুদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য সম্পাদিত *রাজশাহী পরিচিতি*, (রাজশাহী : বরেন্দ্র একাডেমী, ১৯৮০)।

১০. অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, 'লোক সাহিত্যে লালন গীতি', খোন্দকার রিয়াজুল হক সম্পাদিত, *লালন সাহিত্য ও দর্শন* (ঢাকা : মুক্তধারা ১৯৭৬)।

১১. ড. তসিকুল ইসলাম, 'বরেন্দ্র অঞ্চলে ভাষা আন্দোলন', ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস* (রাজশাহী : বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতহাস প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৮)।

১২. ড. মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, 'বরেন্দ্র অঞ্চলের সাহিত্য: আধুনিক যুগ', *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, (রাজশাহী : বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতহাস প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৮)।

১৩. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, 'বরেন্দ্র অঞ্চলের সাহিত্য : মধ্যযুগ', ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস* (রাজশাহী : বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতহাস প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৮)।

১৪. মুহম্মদ আবু তালিব, 'শাহ্ মখদুমের জীবনী তোয়ারিখ', সাহিত্যিকী, (বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) ৩-খ, ১৩৭২ শরৎ।

১৫. অধ্যাপক মোহাম্মদ গোলাম রসুল, 'সুফীবাদ ও লালনগীতি', খোন্দকার রিয়াজুল হক সম্পাদিত *লালন সাহিত্য ও দর্শন*, ঢাকা, ১৯৭৬।

১৬. মতিউর রহমান সম্পাদিত, 'প্রথম আলো', কবিতা লিখে ও হাট বাজারে শুনিয়ে চলে যার জীবন, বাগমারা (রাজশাহী) প্রতিনিধি, (ঢাকা : প্রকাশকাল ১১.০৩.২০০৩)।

Rajshahi University Library
Documentation Section
Document No D-2601
Date 15.2.07